সেরা কল্পবিজ্ঞান অমনিবাস

অদ্রীশ বর্ধন

গল্প + বিজ্ঞান = কল্পবিজ্ঞান

এই আশ্চর্য সমীকরণ দিয়ে তৈরি

৩০টি কল্পবিজ্ঞানের গল্প

পাঠকদের উপহার দিয়েছেন

অদ্রীশ বর্ধন

মহাকাশ থেকে রোবট, রোবট থেকে ভিনগ্রহের প্রাণী, স্বর্গ থেকে মর্ত্য, মর্ত্য থেকে পাতাল—কী নেই এই

সেরা কল্পবিজ্ঞান অমনিবাস-এ

জন্ম : ১ ডিসেম্বর ১৯৩২। কলকাতায়। একটি প্রাচীন শিক্ষাব্রতী পরিবারে। ছোট থেকেই অজানাকে জানার দুর্নিবার আকর্ষণ। অ্যাডভেঞ্চারের টান জীবনে, চাকরিতে, ব্যবসায়, সাহিত্যে। নামী একটি প্রতিষ্ঠানের পারচেজ ম্যানেজার পদে ইস্তফা দিয়ে পুরোপুরি চলে আসেন লেখার জগতে। গোয়েন্দা-সাহিত্যে একনিষ্ঠ থেকে বাংলায় সায়েন্স-ফিকশনকে ত্রিমুখী পথে জনপ্রিয় করতে শুরু করেন ১৯৬৩ সাল থেকে। ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান-পত্রিকা 'আশ্চর্য!'-র ছদ্মনামী সম্পাদক। এখন সম্পাদনা করেন 'ফ্যান্টাস্টিক'। ইন্দ্রনাথ রুদ্র, ফাদার ঘনশ্যাম, প্রফেসর নাট বল্টু চক্র প্রভৃতি চরিত্রের স্রষ্টা। পেয়েছেন একাধিক পুরস্কার। দীনেশচন্দ্র স্মৃতি, মৌমাছি স্মৃতি, রণজিৎ স্মৃতি ও পরপর দু-বছর সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ গল্প পুরস্কার। অনুবাদের ক্ষেত্রে 'সুধীন্দ্রনাথ রাহা' পুরস্কার। ভালোবাসেন : লিখতে, পড়তে, বেড়াতে।

অদ্রীশ বর্ধন

সেরা কল্পবিজ্ঞান অমনিবাস

পত্র ভারতী

৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

ফোন ২২৪১ ১১৭৫ ফ্যাক্স ২৩৫৪ ০৪৬২

ই-মেল : patrabha@vsnl.net

প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি ২০০৪

SERA KALPOBIGYAN OMNIBUS
by
Adrish Bardwan

প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
সৈকতশোভন পাল

মূল্য
১০০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phone 2241 1175 Fax 2354 0462
e-mail : patrabha@vsnl.net
Price Rs. 100.00

পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

সূ চি প ত্র

বাড়ির নাম ব্যাবিলন

বিনায়গড় বৈষ্ণব হিন্দু কবরখানা থেকে কঙ্কাল চুরি যাচ্ছে, খবরটা শুনে গুম হয়ে গেলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। আমিও মুখ বুজে বসে রইলাম। প্রফেসরের মুখের চেহারা আমার ভালো লাগছিল না।

হঠাৎ বললেন,—টেলিফোনটা কই?

আপনার ডানদিকে,—বললাম আমি।

অন্যমনস্কভাবে হাত বাড়িয়ে উনি রিসিভার তুললেন, কথা বললেন নিয়ামৎপুর পুলিশ স্টেশনের অফিসার ইন চার্জের সঙ্গে।

জানতে চাইলেন, শুধু করোটি চুরি যাচ্ছে, না, গোটা কঙ্কাল চুরি যাচ্ছে?

অফিসার খুব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন,—দেখুন মশাই, আমি পুলিশের লোক, আর আপনি একটা উদ্ভট লোক, আপনার নাম আমি ঢের শুনেছি। কিন্তু এই ব্যাপারে আপনার কিছু করার নেই। যে সিদ্ধি লোকটা কঙ্কাল চালান দিচ্ছে নেপাল আর বাংলাদেশের বর্ডার দিয়ে, তাকে আগে ধরি, তারপর আপনার সঙ্গে কথা বলব।

প্রফেসর একটুকুও রেগে না গিয়ে তোয়াজের গলায় বললেন,—সে তো ঠিক, সে তো ঠিক। মানুষ পাচারের ঠেলাতেই চোখে অন্ধকার দেখছে দেশের লোক—তার ওপর শুরু হল কঙ্কাল পাচার। আমি খালি জানতে চাইছিলাম, শুধু করোটি চুরি হয়েছে—ধড়ের কঙ্কালটা কারখানায় পড়ে আছে, এমন কোনও কেস কি রিপোর্টেড হয়েছে?

—জ্বালালেন! হ্যাঁ, হয়েছে। তাড়াহুড়োয় বাকি কঙ্কাল নিয়ে যাওয়ার সময় পায়নি—শুধু করোটি নিয়ে পালিয়েছে।

—যার কঙ্কাল, তার নাম কি ঘটকর্পর ঘটক?

এইবার চমকে উঠলেন পুলিশ অফিসার,—আপনি জানলেন কী করে?

রিসিভার নামিয়ে রাখলেন প্রফেসর।

আমাকে বললেন,—বাজে লোকদের সঙ্গে কথা বলা মানেই সময় নষ্ট করা। দীননাথ, ঘটকর্পর ঘটকের করোটি নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাবিলনে পৌঁছে গেছে।

আমি জানি, প্রফেসরের মাথা খারাপ নয়। তাই আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কথাটা বলতে গিয়েও সামলে নিলাম। বললাম,—চার-পাঁচ হাজার বছর আগেকার ব্যাবিলনে?

—না, না, ব্যাবিলন নামে যে বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেই বাড়িতে।

—বাড়ির নাম ব্যাবিলন?

—আরে হ্যাঁ। কিউনিইফর্ম, সুমেরিয়ান, ব্যাবিলনিয়ান আর অসিরিয়ানদের নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট হয়েছেন—বাড়ির নাম ব্যাবিলন রাখবেন না?

—কী...কী...

—কিউনিইফর্ম। সুমেরিয়ানদের পিকটোগ্রাফ। —যাচ্চলে! পিকটোগ্রাফি কাকে বলে, তাও জানো না? ছবি দিয়ে লেখার পদ্ধতি। পাঁচ হাজার বছর আগে সুমেরিয়ানরা নলখাগড়া কেটে চোখা করে নিয়ে কলম বানাত; কলম, মানে গোঁজ—যার একদিক সরু, আর ধারালো, আর-একদিক মোটা। নরম কাদামাটির ওপর এই গোঁজ চেপে ধরে ছবি ফুটিয়ে তুলত। কয়েকশো প্রতীক চিহ্ন ওরা মাথা খাটিয়ে বের করেছিল, কিন্তু গোঁজের মতন খাড়া-খাড়া ছবি দেখেও চেনা যেত না। কষ্ট করে বুঝতে হতো কীসের ছবি—কী তার মানে। সাঙ্কেতিক ওই পিকটোগ্রাফি সুমেরিয়ানদের বিখ্যাত কিউনিইফর্ম কোড ল্যাংগুয়েজ—যা নিয়ে রীতিমতো রিসার্চ করে পৃথিবী-বিখ্যাত হয়ে গেছে তমোঘ্ন তোপদার।

—এ আবার কী নাম?

—বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের এক রত্ন ছিল নিশ্চয় পূর্বজন্মে। এজন্মেও সত্যিই সে রত্ন হয়েছে। সাড়ে চার হাজার বছর আগে কিউনিইফর্ম হস্তলিপির ১৫,০০০ ফলক-এর অভিধান দেখে এসেছে এবলা শহরে। সুমেরিয়ানরা অতিমানবিক শক্তিতে বিশ্বাস করত। তারা জানত না পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে—অথচ নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারত সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ কবে, কখন হবে। এই জগৎ সম্বন্ধে তারা অনেক কিছু জেনেছিল: দেবতা রাজা গিলগামেস-এর কাব্যকাহিনি উদ্ধার করা হয়েছে ভাঙাচোরা অনেক ফলক থেকে—সে কাহিনিতে পৃথিবী প্লাবনের কাহিনি আছে—নোয়ার কাহিনির সঙ্গে মিলে যায়। তমোঘ্ন তোপদার ইরাক আর ইরানে টহল দিতে-দিতে খুঁজে পায় একটা জিগুরাট।

—জিগুরাট কী জিনিস?

—ধাপে-ধাপে তৈরি পিরামিড। এখন যেখানে ইরাক আর ইরান, আগে সেখানে ছিল পরিসিয়া আর মেসোপটেমিয়া—যেখানে পাথর পাওয়া দুষ্কর কিন্তু

কাদামাটি অঞ্চেল। বাড়ি আর পিরামিড তৈরি হতো এই কাদামাটি দিয়ে—লেখার ফলকও। তমোঘ্ন তোপদার একটা জিগুরাট আবিষ্কার করেছিল—তার মধ্যে পেয়েছিল কিউনিইফর্মে লেখা অনেকগুলো ফলক। কিন্তু যে ফলকে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল, এই জগতের বিবর্তন শেষপর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—সেটাই শুধু পায়নি।

—বিবর্তনের শেষ কোথায়, হাজার-হাজার বছর আগে জেনেছিল? অসম্ভব।

—আমারও তাই মনে হয়েছিল। তমোঘ্ন কিন্তু আর কিছু ভাঙেনি। খুঁজেছিল ঘটকর্পর ঘটককে।

—সে কে, প্রফেসর?

প্রফেসর যা বললেন, তা যেন একটা চলমান ছবি।

ঘন্টাকর্ণ ঘটক তাঁর স্ত্রী-কে বললেন,—হ্যাঁগো, কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখার মতন ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল যে।

ঘন্টাকর্ণের স্ত্রী বললেন,—যে ছেলেরা দেরিতে কথা বলে, সে ছেলেরা বড় হয়ে অনেক বুদ্ধি ধরে। দশজনের একজন হয়।

—কী জানি বাবা। আমার তো লক্ষণ সুবিধের মনে হচ্ছে না। কত সাধ করে নাম রাখলাম ঘটকর্পর। বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার এক রত্ন হবে। এ তো দেখছি পাথর হবে।

—যত সব অলুক্ষুণে কথা। থামো।

ঘটকর্পর বড় হয়েছে। বেশ বড়। পঁয়তাল্লিশ পেরিয়ে গেছে। বাবা আর মা দুজনেই দেহ রেখেছেন। ঘটকর্পর তাঁদের সাধ পূর্ণ করেনি। উলটে একটা অদ্ভুত মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে রত্নের মতন রোশনাই ছড়ায় না, মানে মেধার বিকিরণ ঘটায় না। কিন্তু নিজেকে রত্ন বলে মনে করে। জগতের সেরা রত্ন। তাই সে কারও হুকুম শোনে না। স্কুলে গেলে হুকুম শুনতে হবে বলে স্কুলে যায়নি। সুতরাং কলেজের দরজাও মাড়ায়নি। বাবা হুকুম চালাতে গিয়ে দেখেছেন বেগতিক—ছেলে মুখে চাবি এঁটে, চোখ বুজে, চুপ করে বসে থাকে। সে তখন বেঁচে আছে কী মরে গেছে, বোঝা যায় না। এই দেখে তিনি ছেলেকে বকাঝকা ছেড়ে দিলেন। হুকুম দেওয়াও ছেড়ে দিলেন। ছেলের হুকুম শুধু শুনেই গেলেন। হুকুম না শুনলেই তো বিপদ। ঘটকর্পর বিশ্বাস করে, সে হুকুম দিতেই জন্মেছে—হুকুম শুনতে নয়। হুকুম সে দেয়—হুকুম না শুনলে চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তোলে না, চেঁচামেচি করা তার ধাতে নেই। শুধু চোখ বুজে, ঠোঁট টিপে চুপ করে বসে থাকে। তখন তার নাড়ি চলছে, কী চলছে না—তা বোঝা যায় না। নাকের কাছে আয়না ধরলে তাতে নিশ্বেসের বাষ্প দেখা যায় না। এই সব দেখেশুনে ঘটকর্পরের মা খুব ভয় পেলেন। ঘটকর্পরের বাবাকে একহাত নিলেন। বললেন,—আয়েলে-পয়েলে একটাই তো ছেলে, সে যা চায়, তাই এনে দাও না। দুদিন পরে সবই তো তার হবে।

ঘটকর্পরের বাবা প্রথম-প্রথম বেঁকে বসেছেন,—এ তো চাওয়া নয়—হুকুম।

আমি কি আমার ছেলের পাইক-বরকন্দাজ? আমি গরিবের ছেলে—কিন্তু বড়লোকের বাবা। আমি পয়সা জমিয়েছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে—আর এ হয়েছে গোঁফ-খেজুরে। উড়নচণ্ডি নাম্বার ওয়ান।

ঘটকর্পরের মা বুঝিয়ে বলতেন,—আহা, ওতো তোমার কাছে দামি-দামি জিনিস চাইছে না। বই চাইছে। বই সবচেয়ে বড় বন্ধু। বেচারার একটাও বন্ধু নেই। বই পর্যন্ত কিনে দেবে না? কীরকম বাবা, তুমি?

ঘন্টাকর্ণ ঘটকের সঙ্গে বই-টইয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। ছেলেপুলেদের স্কুল-কলেজে পড়াতে হয়, প্রাইভেট টিউটর রাখতে হয়—এই পর্যন্তই জানেন। লেখাপড়া শেখানোর কারখানা ছাড়াও যে লেখাপড়া শেখা যায় বাড়িতে বসে—এ তত্ত্ব তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু গিন্নির কাছে দুবেলা দাবড়ানি খেয়ে শেষকালে বই কিনে এনে দেওয়া শুরু করলেন। কী বই কিনতে হবে, তা তিনি জানতেন না। খনার বচন আর পাঁজি ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোনও বইয়ের সঙ্গে তিনি সম্পর্ক রাখতেন না। ঘটকর্পর নিঃশব্দে একটা-দুটো বইয়ের প্রতিটি লাইন মুখস্থ করে ফেলেছিল। পাঁজিতে যেসব বইয়ের বিজ্ঞাপন থাকে, সেই সব বইয়ের অর্ডার দিত বাবাকে। সেই বই নিমেষে পড়ে নিয়ে আর মুখস্থ করে সেই সব বই থেকেই অন্য বইয়ের সন্ধান পেত। বাবাকে দিয়ে আনাত সেই সব বই। স্রেফ বই পড়ে কারও সাহায্য না নিয়ে, শিখে গেল সংস্কৃত আর ইংরেজি। তারপর ফরাসি আর ল্যাটিন। হিব্রু আর উর্দু। সেমিটিকদের আক্কাডিয়ান আর ব্যাবিলোনিয়ানদের কিউনিফর্ম। আরও অনেক জিনিস। বাড়ি ভরে উঠল বই আর ফলকে। একা এই মিউজিয়াম আর লাইব্রেরির মধ্যে হয় বসে থাকত, নয় ঘুরে বেড়াত ঘটকর্পর। তাকে খাইয়ে দিতে হতো, নাইয়ে দিতে হতো, শুইয়ে দিতে হতো।

ঘটকর্পরের কথা ফুটেছিল একটু দেরিতে। তার মা তাকে অনেক কথাই শিখিয়েছিলেন। কথাও বলত, হাসত, খেলত। আর পাঁচটা ছেলের মতন। তার পরেই একদিন সে চারতলার বাড়ির ছাদ থেকে নিচের বাগানে পড়ে গেল ঘুড়ি ধরতে গিয়ে। তখন তার বয়স মোটে ছবছর।

আশ্চর্য এই যে, অত উঁচু থেকে পড়ে গিয়ে তার তেমন কিছুই হয়নি। শুধু মুখের ভেতরটা একটু কেটে-ছড়ে গেছিল। মাথায় নিশ্চয় চোট লেগেছিল,—এই ভয়ে ঘন্টাকর্ণ ঘটক ব্রেন স্ক্যানিং করালেন, এনকেফালোগ্রাফ করালেন,—কিন্তু দেখা গেল সবই স্বাভাবিক। একবিন্দু রক্তক্ষরণও হয়নি ব্রেনের মধ্যে।

তবে ওই ঝাঁকুনিটা তার মধ্যে যে পরিবর্তন এনে দিয়েছিল, সেই কথাই বলা হল এতক্ষণ ধরে। হুকুম দেবে—হুকুম শুনবে না। চুপ করে বসে থাকবে—কারও সঙ্গে কথা বলবে না। খেতে দিলে খাবে, নইলে খাবে না। শুধু বই পড়বে।

আর সেকী পড়া! ব্রেনের মধ্যে যেন হাজারখানা ক্যামেরা ফোটো তুলে নিত বইয়ের প্রত্যেকটা পাতার। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি—যার নজির নেই পৃথিবীর ইতিহাসে। যা একবার দেখবে, তা ছবির মতন মনে গেঁথে নেবে।

পঞ্জিকা ছিল তার জীবনের প্রথম পুস্তক। তারপর এল গাদা-গাদা জ্যোতিষচর্চার বই। এই সব বই-টই গিলে হজম করে নেওয়ার পর সে তার অসাধারণ ক্ষমতার আর-একটা নিদর্শন দিল একদিন। বইপাগল আর একেবারে নিঃসঙ্গ এই ছেলের মনের ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য বাবা আর মা একদিন ঠিক করলেন, তিনজনে মিলে গ্যাংটক যাবেন।

ঘটকর্পরকে সে কথা বলা হল। সে চুপ করে রইল। না বা হ্যাঁ, কিছু বলল না। নীরব, নিশ্চুপ ছেলেকে ভয় করতে শুরু করেছিলেন ঘন্টাকর্ণ। তাই তিনি যাওয়ার দিনক্ষণ নিজে একাই ঠিক করে ফেললেন। বাড়িতে ফিরে ঘটকর্পরের মাকে সেকথা বলতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে বেড়ালের মতন নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল ঘটকর্পর।

চমকে উঠলেন দুজনেই। কেন না, ঘটকর্পর তো কখনও বাবা-মায়ের ঘরে আসে না।

দেওয়ালের দিকে চেয়ে যেন নিজেকে বলছে এমনিভাবে বলে গেল ঘটকর্পর,—গ্যাংটকে যেদিন যাওয়া হবে, সেইদিন মারাত্মক ধস নামবে। ঘুমন্ত অবস্থাতেই অনেকে মারা যাবে। চাঁদমারি অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে। তারচেন, তাডং-এর সব বাড়ি পড়ে যাবে। চাঁদমারির যে হোটেলে ওঠা হচ্ছে, সেই হোটেলের প্রত্যেকের জীবন্ত সমাধি হবে।

বলে, বেড়ালের মতন নিঃশব্দেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ঘটকর্পর। থ হয়ে বসে রইলেন তার বাবা আর মা। বিশেষ করে বাবা। কেন না, তিনিই শুধু জানতেন চাঁদমারির হোটেলে দুটো ঘর নেওয়া হয়েছে। বলতে যাচ্ছিলেন গিন্নিকে, এমন সময়ে ছেলে এসে সব ওবলেট করে দিয়ে গেল।

এর কয়েকদিন পরেই কাগজে বেরল খবর :

গ্যাংটকে ধসে মৃত ৫০, জখম ৬০, জীবন্ত সমাধি ৪০০।

জীবন্ত সমাধির লিস্টে ঘন্টাকর্ণরা কেউ ছিলেন না। তাঁরা গ্যাংটকে যাওয়া বাতিল করে দিয়েছিলেন।

ঘটকর্পর আর একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। নিঃশব্দে মায়ের সামনে এসে বলেছিল,—হঠাৎ ব্রেক বসে যাবে, তোমরা দুজনেই মারা যাবে।

ভয়ে সিঁটিয়ে গেছিলেন ঘটকর্পরের মা। অদ্ভুত ছেলেকে তিনিও ভয় পেতে শুরু করেছিলেন। গোটা বাড়ির মধ্যে যেন একটা ভূত ঘুরে বেড়ায়। ভয়ে-ভয়ে জিগ্যেস করেছিলেন,—কবে?

অনেক...অনেক বছর, এই প্রথম মায়ের চোখে চোখ রেখে বলেছিল ঘটকর্পর,—সেটা বলা যাবে না। বারণ আছে।

মাস কয়েক গাড়িতেই চাপলেন না কর্তা-গিন্নি। তারপর একদিন একটা নতুন গাড়ি কিনলেন। শোরুম থেকে গাড়ি এসে পৌঁছল বাড়িতে। দুজনে গাড়িতে উঠলেন। আগেই জিগ্যেস করে নিলেন—ব্রেক ঠিক আছে কিনা। একগাল হেসে ড্রাইভার বললে,—মারকাটারি ব্রেক।

রেডরোডে ঘণ্টায় একশো কিলোমিটার স্পিডে যাওয়ার সময়ে আচমকা ব্রেক মারবার দরকার হল। ব্রেক বসে গেল। ড্রাইভারের বডি কেটেকুটে বের করতে হয়েছিল থেঁতলানো গাড়ির ভেতর থেকে। ঘণ্টাকর্ণ আর তাঁর স্ত্রী স্বর্গে বসে তখন ভাবছিলেন, —এ ছেলে মানুষ, না, কী?

ঠিক এই প্রশ্নটাই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েসে ঘটকর্পর জিগ্যেস করেছিল নিজেকেই,—আমি মানুষ, না, কী?

কারণ, আয়নার সামনে সে দাঁড়িয়েছে ছ'বছর বয়েসে ব্রেনে চোট লাগবার পর এই প্রথম। বেশ দামি আয়না। একটা সামনে, দুপাশে দুখানা। বাঁ আর ডানদিকের চেহারা দেখা যায়।

ঘটকর্পর দেখল তিনরকম চেহারা। সামনে থেকে দেখা যাচ্ছে, তার চোখের পাতা অনেকখানি নেমে রয়েছে—মাত্র কয়েক মিলিমিটার ফাঁক দিয়ে হয় সে পৃথিবীটাকে দেখছে, অথবা, দেখছে না—চেয়ে রয়েছে নিজের ভেতরের দিকে। নিচের ঠোঁট বদখতভাবে ঝুলছে। দাঁত হলদে—সেই ছ'বছর বয়সে বাবা-মায়ের হুকুম মতন দাঁত সে মাজেনি। চিবুকের নিচে থলথলে চর্বি পাটেপাটে হয়ে রয়েছে।

বাঁদিক থেকে দেখা যাচ্ছে, তার নাকখানা কাকাতুয়ার চঞ্চুর মতন বেঁকে প্রায় ঠোঁটের ওপর নেমে এসেছে। মাথার লম্বা চুল মেয়েদের লম্বা চুলের মতন পিঠে এলিয়ে রয়েছে—কারণ, সে পরামানিককে পাত্তা দেয়নি তার হুকুম মতন ঘাড় ঘোরাতে হবে বলে। দাড়ি-গোঁফ মুখের অর্ধেক ঢেকে রেখে দিয়েছে।

ডানদিক থেকে মনে হচ্ছে যেন একটা গর্দানমোটা শুয়োর মাথা ঝুঁকিয়ে রয়েছে। শিরদাঁড়া ঘাড়ের কাছ থেকে গোল হয়ে রয়েছে—ছবছর বয়স থেকে ঝুঁকে বই পড়ার ফল।

প্রফেসরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ঘটকর্পর। প্রফেসরও তাকে ঘুরে-ঘুরে দেখছেন। তারপর বসলেন। ঘটকর্পরকে সামনের চেয়ারে বসালেন। বললেন,—শুধু তিনদিক নয়, পেছন দিক থেকে তোমাকে দেখতে আরেক রকম। গরিলার মতন।

ঘটকর্পর কথা বলল না। চোখের দু'মিলিমিটার ফাঁক দিয়ে শুধু চেয়ে রইল। কথা সে বলে না—খুব দরকার না পড়লে। প্রফেসরের কাছে এসে যা বলার দরকার তা বলেছে। এখন শুনছে।

প্রফেসরই বলে গেলেন,—বাইরের ভাষা তোমার প্রায় লোপ পেতে বসেছে। বাইরের চেহারাটাও নানান চেহারা নিয়েছে, তুমি বলছ, এর ফলে তোমার ভেতরের ভাষা একমুখী হয়েছে—বিবর্তনের পথ বেয়ে সব ভাষা শেষ যে ভাষাই গিয়ে দাঁড়াবে, তোমার মধ্যে সেই ভাষা জেগেছে।

ঘটকর্পরের মুখে কোনও ভাষা নেই।

—শুধু তাই নয়। তুমি জেনে গেছ, স্মৃতি কোথায় যাচ্ছে, কোথায় জমা থাকছে। মেমারি আজও মিস্ট্রি। গবেষণাই চলছে—ঠিক স্মৃতির আধার কোথায় জানা যায়নি। কেউ বলছেন, ব্রেনের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে হিপোক্যামপাস। মেমারির মানচিত্র

বানিয়ে মেমারিকে সংগঠিত করছে এই হিপোক্যামপাস। কিন্তু মেমারি কী দিয়ে তৈরি আজও তা রহস্য। থিওরি অগুন্তি। কেউ বলছেন, মেমারি সঞ্চিত হচ্ছে ইলেকট্রিকাল চার্জ হিসেবে। কেউ বলছেন, মেমারি হচ্ছে এক ধরনের স্পেশাল মলিকিউল। কেউ বলছেন, ব্রেনের সমস্ত কোষ ধরে রাখছে মেমারিকে। কেউ বলছেন, কিছু মনে রাখতে গেলেই কিছু কোষের কেমিক্যালের গঠন পালটে যায়। এক গবেষক বলেছেন, মেমারির বেসিক ইউনিটের নাম দেওয়া যায় এমনেমন—যার যত এমনেমন আছে, সে তত বেশি মেমারির অধিকারী। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি আর নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ছিল এই ক্ষমতা।

ঘটকর্পর শুধু শ্রোতা।

—ছাদ থেকে পড়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি এমনেমোনিস্ট হয়ে গেছ। ফোটোগ্রাফিক মেমারির অধিকারী হয়েছ। কিউনিইফর্ম-এর দুষ্প্রাপ্য ফলকটা তোমার হাতে আসবার পর তুমি জেনে গেছ—মেমারি কোথায় জমা হচ্ছে আর থেকে যাচ্ছে। করোটিতে।

ঘটকর্পর এখন চেয়ে আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। প্রশান্ত।

—অবিশ্বাস্য, যদিও চার-পাঁচ হাজার বছর আগের এই কিউনিইফর্ম যার হাতে লেখা, তিনি করোটির এই ক্ষমতার কথা জানতে পেরেছিলেন। সেইসঙ্গে ভবিষ্যত দেখতে পেতেন। পৃথিবীর শেষ ভাষা কী হবে, তা জেনে গেছিলেন। দিব্যদৃষ্টি বলে উড়িয়ে দেননি—ব্রেন আর করোটি মিলেমিশে যখন কাজ করে, তখন মুখের ভাষা থাকে না—ভেতরের ভাষা জাগে—সেই ভাষাই শেষ ভাষা। কিউনিইফর্ম-এর মতন অনেক ভাষা আসবে আর যাবে—কিন্তু এই ভাষা চিরকাল ছিল, আছে, থাকবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদি থেকে অন্ত লেখা রয়েছে এই ভাষায়। তিনি সেই ভাষা জেনেছিলেন যেভাবেই হোক—জেনেছ তুমিও, ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে। পরাবিজ্ঞানীরা তোমাকে বলবেন ত্রিকালদর্শী। তুমি বলছ, এটা অপবিজ্ঞান নয়—খাঁটি বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিকরা এখনও ধরতে পারেননি। করোটি নিয়ে তাঁদের রিসার্চ করা দরকার।

ঘটকর্পর এবার একটু চোখ মেলল। বলল,—আমার করোটি নিয়ে রিসার্চ করা হবে।

চমকে উঠলেন প্রফেসর,—কেন্দী!

—আমি দেখতে পাচ্ছি কে করবে, কীভাবে করবে। সে খুঁজছে কিউনিইফর্ম-এর সেই ফলক। সে ফলক আমি নষ্ট করে ফেলেছি। আমার মেমারি সব ধরে রেখে দিয়েছে। এই করোটি থেকে সেই মেমারি যে উদ্ধার করবে, সে জানতে পারবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে—এই পৃথিবীর মানুষের আর দেশগুলোর কী অবস্থা দাঁড়াবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। চললাম।

—কোথায়?

—কবরে।

ঘটকর্পর যে বিষ্ণুর উপাসক হয়ে গেছে, বিনয়গড়ের বৈষ্ণব আদিবাসীদের

মধ্যে গিয়ে আত্মগোপন করেছে—প্রফেসরের তা জানা ছিল না। মরে গেলে এই সম্প্রদায়ের লোকেরা শবদাহ করে না—কবর দেয়। ঘটকর্পরের নিশ্চয় মায়া জন্মেছিল নিজের করোটির ওপর। তাই মরেছে বিদায়গড়ে। কবরস্থ হয়েছে সবার অজান্তে।

—দীননাথ, তমোঘ্ন তোপদার মরিয়া হয়ে গেছে। কঙ্কালের চোরাকারবারি সিদ্ধি লোকটাকে দিয়ে ঘটকর্পরের করোটিটা শুধু নিয়ে গেছে। চলো তার বাড়ি যাই।

'ব্যাবিলন' বাড়িটা খুব উঁচু পাঁচিল আর পাঁচিলের গা বরাবর বড়-বড় গাছগাছালি দিয়ে ঢাকা। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, ভেতরে রয়েছে জিগুরাট স্থাপত্য অনুকরণে তৈরি বাড়িটা, ধাপে-ধাপে তৈরি যেন একটা পিরামিড। সুমেরিয়ানদের তৈরি জিগুরাট-এর একদম ওপরে থাকত দেবতার মন্দির। তমোঘ্ন তোপদারের মন্দির আর ল্যাবরেটরি। ঢোকবার পথ আছে, বেরোবার পথ নেই। জানলা নেই। এয়ারকন্ডিশনার ঠান্ডা কনকনে রেখে দিয়েছে ঘর। সিলিং থেকে আলোর ধারা নামছে ঘরের ঠিক মাঝখানে কাচের বাক্সেতে রাখা সেই করোটির ওপর। ঘটকর্পর ঘটকের করোটি শূন্যগর্ভে। চোখ রেখেছি প্রফেসর আর তমোঘ্ন তোপদারের দিকে। আমি রয়েছি ঘরের কোণে। বসে রয়েছি চোরের মতন—প্রফেসরের বডিগার্ড হিসেবে। তমোঘ্নও তাঁর বডিগার্ড রেখেছেন ঘরের আর এককোণে। আগে ছিল ব্ল্যাক কমান্ডো। গায়ের রঙ যেমন কালো, জামাকাপড়ও তেমনি কালো। কটকট করে সে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। হাতের রিভলভারটাও ফেরানো আমার দিকে। তমোঘ্ন তোপদার লোকটা নেহাতই গোবেচারা। কাটিখাওয়া সাদা পাজামার তলায় পায়ের ময়লা গোড়ালি দেখা যাচ্ছে। হাতকাটা পাঞ্জাবির হাতা দিয়ে সিকসিকে হাত দুটো দুপাশে ঝুলছে। একমুখ সাদা দাড়ি আর মাথাজোড়া টাক। মুখখানা সরু। এ লোক বড় বৈজ্ঞানিক হলেন কী করে বুঝলাম না।

করোটির নানা জায়গায় লাগানো আটটা ইলেকট্রোড। পেছনে দেওয়াল জোড়া টিভি স্ক্রিনের মতন স্ক্রিন। তাতে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছে সিগন্যাল—বিচিত্র সঙ্কেত।

করোটির হাড় শব্দ-সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। কিউনিফর্ম। তমোঘ্ন বললেন,—১৫,০০০ ফলকের অভিধান লেখছি সব মুখস্থ। কিন্তু এই ফলকের মানেই তো বুঝতে পারছি না। একদম অজানা কিউনিফর্ম।

প্রফেসর বললেন,—ঘটকর্পর কিন্তু বুঝেছিল। করোটির স্টোরে ধরে রেখেছিল। এমন কিছু জেনেছিল—যা না জানাই ভালো।

ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই সময়ে। বোধহয় ইলেকট্রিক চার্জ বেশি হয়ে গেছিল। অথবা, কিউনিফর্ম-এর জমাটশক্তি বিবর্তন-এর শেষ ধাপকে রহস্যে ঢেকে রাখতে চেয়েছিল। আচমকা প্রদীপ্ত হয়ে উঠল করোটি। ধোঁয়া বেরোতে লাগল করোটি থেকে। সুইচের দিকে ছুটে গেলেন তমোঘ্ন।

তার আগেই ছোট একটা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে একদম পাউডার হয়ে গেল ঘটকর্পর ঘটকের করোটি।

ভুতুড়ে কুকুর

প্রথম ঘটনাটা ঘটে মাঝরাতে।

চন্দ্রপুর গ্রামের মাথার ওপর ঝকঝাক করছিল পূর্ণচন্দ্র। আশ্চর্য স্নিগ্ধ কিরণ ঝরে পড়ছিল মাঠ, ঘাট, কুঁড়ের ওপর।

নাতনিকে নিয়ে দাওয়ায় বেরিয়েছিল বুড়ি সৌদামিনী। আর বক-বক করছিল সমানে।

—মরণ আর কী। দু-চোখের পাতা এক করতে-না-করতেই ঠাম্মা, ঠাম্মা; কেন, তোর মা কি ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেল?

নাতনি টেঁপির সেদিকে কান ছিল না। ঘুমজড়িত চোখে শিশুসুলভ কৌতূহল নিয়ে তাকিয়েছিল বিচিত্র সুন্দর চাঁদের দিকে।

এমন সময়ে দেখা গেল সেই ছায়াটা।

—ঠাম্মা, ঠাম্মা, দেখো, দেখো কীরকম পাখি!

চোখ তুলে তাকিয়েছিল সৌদামিনী। প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেনি। খড়ো-বাড়িখানের ঠিক মাথার ওপর দিয়ে ভাসতে-ভাসতে ওদিকে চলে যাচ্ছে—একটা অদ্ভুত ছায়া। পেছনে মস্ত থালার ওপর চাঁদের বুকে দুষ্ট প্রেতাত্মার মতই মনে হল সে ছায়া। কেননা, তা নিশাচর পাখি নয়। পৃথিবীর কোনও পাখিকেই ওরকম দেখতে হয় না। চাঁদ পেছনে থাকায় স্পষ্ট দেখা গেলেও সৌদামিনীর মনে হল একটা কুকুর বা শিয়ালের মতো

জানোয়ার শূন্য পথে নিরাবলম্বন ভাবে ভাসতে-ভাসতে নেমে গেল কাঁঠাল গাছের ওপাশে।

দেখেই চোখ কপালে উঠল সৌদামিনীর। বিকট বেসুরো গলায় একবার মাত্র চিৎকার করে উঠেই টেঁপিকে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ল ঘরের মধ্যে।

দিনকয়েক পরের ঘটনা।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল গৌরহরিবাবুর। দাবার নেশা এমন নেশা যে খেলা জমে গেলে কোনও জ্ঞান আর থাকে না। তখন যদি বিমানহানার সাইরেন বাজলেও খেয়াল থাকে না। তবে মনটা আজকে প্রসন্ন আছে গৌরহরিবাবুর। বহুদিন বাদে আজ মিত্তিরমশাইকে ঘোড়ের টিপুনি দিয়ে জব্দ করা গেছে। এটা কম সাকসেস নয়। ঝানুসম্রাট মিত্তিরমশাইকে ঘোড়ের টিপুনি কেন, রাজামন্ত্রী দিয়েও কিস্তিমাত করা যায় না। কাজেই—

হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন গৌরহরিবাবু।

বাঁশঝাড় সামনেই। দুপাশের বাঁশগুলো দুদিক থেকে এমনভাবে নুয়ে পড়েছে পথের ওপর যে মাথার ওপর আকাশ দেখা যায় না। ঘুপসি অন্ধকারে পথ দেখা না গেলেও গাঁয়ের লোকদের কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু সেদিন একটা বেয়াড়া দৃশ্য চোখে পড়ল গৌরহরিবাবুর।

ঘুপসি অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছিল একজোড়া নীলাভ আগুন। ঠিক যেন দু-টুকরো স্ফুলিঙ্গ।

বুকটা দুর-দুর করে ওঠে গৌরহরিবাবুর। মনকে সাহস দিলেন। ভাবলেন, নিশ্চয় কোনও শিয়াল-টিয়াল হবে। এগুতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে একটা সিটির শব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে আঁতকে উঠলেন গৌরহরিবাবু।

কেননা, জ্বলন্ত আগুন দুটো আচমকা ধাবিত হল শূন্য পথে। হাউইয়ের মতো ঘুপসি অন্ধকার ছেড়ে বেরিয়ে এল নীলাভ স্ফুলিঙ্গদুটো। আকাশের নিচে আসতেই শিহরিত চোখে গৌরহরিবাবু দেখলেন এক অসম্ভব দৃশ্য।

মাথার অন্তত দশহাত ওপর দিয়ে ধীর গতিতে শূন্যে ভর দিয়ে হেঁটে গেল একটা চারপেয়ে জানোয়ার।

চোখ কচলে নিয়ে আবার তাকালেন গৌরহরিবাবু।

না, ভুল হয়নি। চতুষ্পদই বটে। একটা পোষায় কুকুর।

এরপর যে কোনও ভদ্রসন্তানেরই মূর্ছা যাওয়া উচিত অথবা ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তর্ধান করা উচিত। সাহসী পুরুষ গৌরহরিবাবু শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করলেন।

পরদিন সকালে প্রফেসর কৌতুকনাথ গুঁড়িকুণ্ডির বাড়িতে হাজির হলেন গৌরহরিবাবু।

প্রফেসর তক্তপোষে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। গৌরহরিবাবুর পদশব্দে চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়েই লাফিয়ে উঠলেন,—কী সৌভাগ্য! কী সৌভাগ্য! ভোর না হতেই ব্রাহ্মণ দর্শন!

গৌরহরিবাবু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন,—প্রফেসর! তোমার কুকুরটা কোথায়?

চমকে গিয়ে কেষ্টকানাই বললেন,—কুকুর! সে আছে। কিন্তু তোমার খবর কী?

—আছে মানে? বেঁচে আছে তো?

বেঁচে থাকবে না তো কি মরে থাকবে? —কেষ্টকানাই এবার একটু বিরক্ত।

গৌরহরিবাবু বললেন,—প্রফেসর! কাল রাতে কি তাহলে তোমার কুকুরের ভূত দেখলাম?

কথাটা শুনে চমকে উঠলেন প্রফেসর, অন্তত গৌরহরিবাবুর মনে হল তাই।

তাড়াতাড়ি বললেন কেষ্টকানাই,—ভূত দেখেছ মানেটা কী? জলজ্যান্ত কুকুর কি ভূত হতে পারে?

উঁহু, আমার ভুল হয়নি। কই তোমার কুকুর? —গৌরহরিবাবু নাছোড়বান্দা।

মুখ দেখে মনে হল এবার একটু ফাঁপরেই পড়লেন প্রফেসর। আমতা-আমতা করে বললেন,—কুকুর দেখবে? না দেখলে বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ এসো।

ভেতরের দরজা দিয়ে গৌরহরিবাবুকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে এলেন প্রফেসর। বিস্তর যন্ত্রপাতি সাজানো ঘরের এককোণে বাঁধা ছিল কুকুরটা। পিঠের উপর দড়ি দিয়ে বাঁধা রয়েছে একটা পাট করা কম্বল।

জ্যান্ত কুকুরই বটে। গৌরহরিবাবু তার অপরিচিত নয়। তাই ল্যাজ নাড়তে নাড়তে জুল-জুল করে তাকিয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে।

চাহনি দেখে যেমন মায়া হল গৌরহরিবাবুর, তেমনি অবাক হলেন তিনি। চাঁদের আলোয় গতরাতে তিনি ঠিকই দেখেছিলেন। একরকম বিশেষ জাতের বড় আকারের কুকুর এ তল্লাটে আর দ্বিতীয় নেই। অথচ কাল রাতেই যে অশরীরী প্রেতের মতো শূন্যে হেঁটেছিল, আজ দিনের আলোয় সে নিরেট কায়া নিয়েই দাঁড়িয়ে সামনে।

ভাবতে-ভাবতে কখন যেন হেঁট হয়ে চতুষ্পদের মাথায় হাত বোলাতে শুরু করেছিলেন গৌরহরিবাবু। হাত বোলাতে-বোলাতে এই গরমে পিঠে কম্বল চাপানো দেখে দড়ির গিঁট খুলতে শুরু করেছিলেন। এমন সময়ে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এলেন প্রফেসর।

—ওকী করছ! ওকী করছ! খুলো না। খুলো না। কিন্তু তার আগেই ঝপ করে খুলে গেছিল গিঁটটা, কম্বলও খসে পড়েছিল পিঠ থেকে।

প্রফেসরের আকস্মিক চেঁচামেচিতে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন গৌরহরিবাবু। কুকুরটাও লাফিয়ে সামনের দু'পা তুলে দিয়েছিল তাঁর কোমরের ওপর।

আর তখন আবার ঘটল সেই ভয়ানক কাণ্ড!

সাঁ করে মাটি ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়ল কুকুরটা। আশ্চর্য ধীর গতিতে গিয়ে ঠেকল কড়িকাঠে। সেখান থেকেই গৌরহরিবাবুর স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনেই ভাসতে-ভাসতে আবার নেমে এল ঘরের মেঝেতে।

পিলে চমকে উঠেছিল গৌরহরিবাবুর। নেহাত শক্ত হার্ট। নইলে হার্ট ফেল করতেন। কুকুরটা ভূমিস্পর্শ করতেই চট করে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পিঠের ওপর কম্বল চাপিয়ে আবার দড়ি বেঁধে দিলেন প্রফেসর।

আর, সত্যি-সত্যি ভূত দেখার মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপতে লাগলেন গৌরহরিবাবু। দেখতে-দেখতে বিন্দু-বিন্দু ঘাম জমে গেল তাঁর কপালে ও মুখে।

কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন প্রফেসর কেষ্টকানাই,—ভেবেছিলুম কাউকে জানাব না। কিন্তু তোমার গোয়েন্দাগিরির জ্বালায় সব ফাঁস হয়ে গেল। গৌরহরি, আমি এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি, যা পৃথিবীর তাবত বিজ্ঞানীদের মাথা ঘুরিয়ে দেবে।

গৌরহরিবাবুর শুকনো গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরুল না।

প্রফেসর বলে চললেন,—পূর্ণিমার রাতে আর কাল রাতে সৌদামিনী আর তুমি এই কুকুরটাকে আকাশে হাঁটতে দেখেছ। কেন জানো? কারণ, কুকুরের ওজন কমে গেছে। আজকাল চর্বি কমিয়ে ওজন কমাবার অনেক ওষুধ বেরোচ্ছে। হার্টের ওপর অযথা চাপ কমাবার জন্যে, হার্টের ব্যারাম যাতে না হয়, তার জন্যে কত দামি-দামি দাওয়াই না বেরোচ্ছে। কিন্তু আমি এমন একটা পাচন আবিষ্কার করেছি, যার এক দাগ খেলেই যে কেউ পালকের মতো হালকা হয়ে যাবে। এত হালকা হয়ে যাবে যে পোল-ভল্টিয়ারের মতো লম্বা লাফ তার কাছে ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়াবে।

অনেক কষ্টে ঢোক গিলে গৌরহরিবাবু বললেন,—এইচ. জি. ওয়েলস এরকম একটা গল্প লিখেছিলেন বটে—

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন প্রফেসর,—হ্যাঁ, লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর গল্পে একটা মারাত্মক ভুল ছিল।

—কীরকম?

—তোমার মনে আছে তো, ওয়েলসের গল্পের নায়ক পাইক্রাফট নিজের তৈরি ওষুধটা খেতেই এমন হাল্কা হয়ে গেছিল যে গ্যাসভরা বেলুনের মতো কড়িকাঠে গিয়ে উলটো হয়ে আটকে ছিল। শেষকালে পকেটে আর জুতোর মধ্যে সিসের ওজন চাপিয়ে তাকে মাটিতে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। কিন্তু ওয়েলসের হিসেব যদি ঠিক হতো, তাহলে পাইক্রাফটকে সিসের ওজন নেওয়ার দরকারই হতো না। তার জামাকাপড়ের ওজনই তাকে মাটিতে ধরে রাখত। [illegible] দিগম্বর না হলে কড়িকাঠে গিয়ে পৌঁছনো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর্কিমিডিসের সূত্র মনে করে দেখো। পাইক্রাফটের স্থূল বপু যতখানি বাতাসের জায়গা দখল করে রেখেছে, ততখানি

বাতাসের ওজনের চেয়ে যদি কম ওজন হয় তার জামাকাপড় আর পকেটস্থ সবকিছুর, তবেই সে ভাসতে-ভাসতে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকবে।

এখন এসো হিসেব করা যাক। আমাদের ওজন আমাদের সমান ভল্যুমের জলের ওজনের প্রায় সমান-সমান—অর্থাৎ প্রায় ৬০ কিলোগ্রাম। স্বাভাবিক ঘনত্বের বাতাস জলের চাইতে ৭৭০ গুণ কম হাল্কা। কাজেই যতখানি বাতাস আমরা আমাদের দেহ দিয়ে দখল করে আছি, তার ওজন মাত্র ৮০ গ্রেন। পাইক্র্যাফট যত মোটাই হোক না কেন, ১৮০ কিলোগ্রামের বেশি ওজন তার নয়। কাজেই তার দেহ যে পরিমাণ বাতাসের জায়গা দখল করে রয়েছে, সেই পরিমাণ বাতাসের ওজন ১৩০ গ্রেনের বেশি নয়। এটা তো ঠিক যে, তার জামা-প্যান্ট, পকেটঘড়ি, নোটবই, মানিব্যাগ ইত্যাদি সবকিছুর ওজন ১৩০ গ্রেনের অনেক বেশি। কাজে-কাজেই মেঝেতেই দাঁড়িয়ে থাকত পাইক্র্যাফট, বেলুনের মতো শূন্যে কখনও ভাসত না। জামাকাপড় সব খুলে নিলেই সমান ভল্যুমের বাতাসের চাইতে হালকা হয়ে যেত সে, তখনি একটু লাফালেই কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকত, তারপর আবার ধীরে-ধীরে নেমে আসত নিচে।

কুকুরটাকে পাঁচন খাওয়ানোর পরে এই কাণ্ড ঘটল। হতভাগা একটু লাফালেই আকাশে উড়ে যেত। আর আকাশে হাঁটার আনন্দে ক্রমাগত লাফায়। পূর্ণিমার রাতে বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে সৌদামিনীকে ভয় দেখিয়েছে। কাল রাতে আমিই ওকে নিয়ে বেরিয়েছিলুম। তোমাকে দেখে পাছে তোমার কাছে দৌড়ে যায়, তাই সিটি দিতেই লাফিয়ে উঠে তোমার মাথার ওপর দিয়ে চলে এল।

পিঠের ওপর কম্বল চাপিয়ে হতভাগাকে আটকে রেখেছি। ওই কারণেই তুমি কম্বলটা সরিয়ে নিতেই সমান ভল্যুমের বাতাসের চাইতে হাল্কা হয়ে গেল ও—আর লাফিয়ে উঠতেই ঠেকল কড়িকাঠে। যদি মনে করো তো, তোমাকেও একডোজ পাঁচন খাইয়ে জ্যান্ত ভূত বানাতে পারি। খরচ খুব কম, কিন্তু উপকারিতার কথা বলে শেষ করা যাবে না।

শুনে, টপ করে হাঁ বন্ধ করে ফেললেন গৌরহরিবাবু।

কঙ্গোর বঙ্গোবাবা

লোকটাকে দেখে হাসব কি কাঁদব ভেবে পেলাম না। বেঁটে বন্ধু অনেক দেখেছি, কিন্তু এইরকম ঝাঁকড়াচুলো, দাড়ি-গোঁফওয়ালা মর্কট বামন জীবনে দেখিনি।

ওই তো চেহারা, হাইট বড়জোর চার ফুট, গায়ের রঙ কালো আবলুশ কাঠের মতোই বাহারে। তার ওপর ঢলঢলে লম্বা কোট-প্যান্ট-টাই না চাপালেই কি চলত না?

তাও এই কঙ্গোর জঙ্গলে? যেখানে দেড়শো ফুট উঁচু গাছপালার ঘন চাঁদোয়া ভেদ করে সূর্যের আলো পর্যন্ত মাটিতে পৌঁছয় না? বারো মাস যেখানে আলো-আঁধারির মায়াময় পরিবেশ?

আধা আলোয় চোখ সয়ে গেছিল বলেই মিশমিশে প্রেতের মতো বাঁটকুল মূর্তিটিকে দেখে চমকে উঠিনি। পরনের ছেঁড়া, ময়লা কোট-প্যান্ট-টাই স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলাম—এমনকী সেলাই আর তালিগুলোও। আরও বিদঘুটে ব্যাপারটাও চোখ এড়ায়নি। হতভাগার কপাল, কান, গলা থেকেও লম্বা লম্বা চুল ঝুলছে।

হঠাৎ ঝোপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসেছিল কদাকার বামনটা। পুব কঙ্গোর ইতুরি অঞ্চলের পঁয়ত্রিশ হাজার পিগমিদের অন্যতম নিশ্চয়। এইরকমই আচমকা ঝোপঝাড় ঠেলে বেরিয়ে আসে ব্যাটারা। প্রাণে ভয়ডর তো নেই—কুসংস্কার, ভূতপ্রেত, তুকতাক, পিশাচগুরু—এসবের ধার দিয়েও যায় না—আফ্রিকার আদিবাসিন্দা হয়েও।

কিন্তু সাহেব সাজবার শখ হল কেন হতভাগার? আর ওইরকম গা-জ্বালানো হাসি হাসবারই বা কী দরকার ছিল? আমাকে আর প্রফেসর নাটবল্টু চক্রকে দেখে যেন খুশির প্রাণ গড়ের মাঠ!

বামবুতি প্রজাতির এই পিগমিরা মারকুটে হয় না জানি। তাই ইচ্ছে হল, টেনে একটা চড় কষাই। ঝকঝকে দাঁতের খানকয়েক ঘুষি মেরে খুলে আনতেও ইচ্ছে হল।

কিন্তু প্রফেসরের প্রাণেও পুলক জেগেছে দেখে অবাক না হয়ে পারলাম না। ফোকলা দাঁতে ফিকফিক করে হাসতে-হাসতে বললেন,—বসোবাবা, নমস্কার।

নমস্কার, নমস্কার, প্রফেসর,—পরিষ্কার বাংলাতেই জবাব দিল উদ্ভট জীবটা।

তবে কি আগে থেকেই ঠিক ছিল প্রফেসরের সঙ্গে বসোবাবা নামের বিচিত্র লোকটার দেখা হবে? ঠিক এই জায়গায়? তাই তড়িঘড়ি আমাকে প্রফেসর টেনে নিয়ে এলেন আফ্রিকার এই জঙ্গলে কোনও কারণ-টারণ না দেখিয়েই? জিগ্যেস করে-করে মুখের ফেনা তুলে ফেলেছি। উৎকট গম্ভীর মুখে উনি একটাই জবাব দিয়ে গেছেন,—গেলেই বুঝবে।

যেন একটা বিরাট রহস্য লুকিয়ে রয়েছে কঙ্গোর জঙ্গলে। রহস্য জিনিসটাকে আমি বড় ভালবাসি কিনা; তাই আমাকে ল্যাজে বেঁধে না নিয়ে গেলেই যেন নয়!

এই রহস্য! একটা মর্কটাকার বেঁটে কালো ভূত কোথাকার! চুল-গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল! ঢিলে কোট-প্যান্টের মিউজিয়াম! এর সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলার জন্যে এতটা পথ ঠেঙিয়ে আসা!

রহস্য একেবারেই নেই, তাই বা বলি কি করে? কঙ্গোর এই পিগমিদের রাজত্বে বিটকেল এই পিগমিটার গলায় এরকম বাংলা বুকনি বেরোচ্ছে কীভাবে?

তাছাড়া, দুজনেই দুজনকে চেনে মনে হচ্ছে! প্রফেসর হিল্লি-দিল্লি ঘুরে বেড়ান—আমিও বলতে গেলে সব সময়েই সঙ্গে থাকি। কিন্তু এই লোকটাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না!

কাজেই চড়চাপটা ঘুষি মারার ইচ্ছেটাকে সামলে নিয়ে জুলজুল করে তাকালাম প্রফেসরের পানে। ভাবখানা, ব্যাপারটা কী?

প্রফেসরও তাকালেন আমার দিকে। বললেন,—দীননাথ, আগেভাগে তোমাকে বলিনি, তুমি 'হ্যাক থু' করবে বলে। বন্ধুকে চিনতে পারছ না?

বন্ধু! হতভম্ব না হয়ে পারলাম না—বন্ধু আবার কে? এরকম বিদিগিচ্ছিরি লোক—

জীবনে দেখোনি,—ভারি মিষ্টি গলায় বললে বন্ধু ওরফে বসোবাবা, সেই জন্যেই তো কোট-প্যান্ট পরে এলুম গো। বলে একটা উল্লাসের হাসি হাসল লোকটা, চিরকালই হ্যাক থু করেছ দেখতে খারাপ বলে। কিন্তু এখন? —বলে সদর্পে হাত বুলোল কাঁকড়া চুলে,—চিনতে খুব কষ্ট হচ্ছে, তাই না?

বঙ্ক? প্রাণপণে স্মৃতিশক্তিটা চাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বিড়বিড় করে বলেছিলাম,—বঙ্ক নামে এক ব্যক্তিকে চিনতাম বটে—কিন্তু সে তো—

—টেকো ছিল, তাই না? কিন্তু গায়ের রঙ আর হাইটটা আমার মতো ছিল না?

তীক্ষ্ন চোখে বঙ্গোবাবাকে দেখতে-দেখতে বললাম,—হ্যাঁ, তা অবশ্য ছিল। দাড়ি-গোঁফও তো ছিল না। মাকুন্দ নম্বর ওয়ান। বুকে লোম পর্যন্ত ছিল না।

তবে দেখো,—বলেই হা-হা করে হাসতে-হাসতে বঙ্গোবাবা কোট-প্যান্ট-টাই বনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু জাঙিয়া পরে ধেই-ধেই করে নাচতে লাগল আমাকে ঘিরে,—দেখেছ? দেখেছ? সারা গায়ে-মুখে-বুকে-মাথায় কীরকম চুল বেরিয়েছে দেখেছ?

থ হয়ে গেলাম নাচিয়ে বঙ্গোবাবার দেহশোভা দেখে। মাথায় যে রকম চুল, গালে আর চিবুকে যে রকম দাড়ি আর গোঁফ, সারা গায়ে তেমনি লম্বা-লম্বা কেশ!

—আমিই বঙ্ক! আমিই বঙ্ক! এখন আমি কঙ্গোদেশের বঙ্গোবাবা!

প্রফেসর ধরে না ফেললে নির্ঘাৎ মাথা ঘুরে পড়ে যেতাম প্রায়ান্ধকারে ওই মিশমিশে মূর্তির কিম্ভূত নৃত্য দেখে।

ভাইব্রেশন। ভাইব্রেশন! আর তার সঙ্গে সংখ্যাতত্ত্ব! ব্যস, দেখতেই পাচ্ছ তেলকিখানা। এর মধ্যে ম্যাজিক কিচ্ছু নেই, দীননাথ—স্রেফ বিজ্ঞান—, সযত্নে দাড়ি চুমরোতে-চুমরোতে পাতায় ছাওয়া কুঁড়েঘরে বসে বললে লোমশ বঙ্ক।

তার মানে?—বোকার মতো জিগ্যেস করেছিলাম আমি। বিস্ময়ের ঘোর তখনও তো কাটিয়ে উঠিনি। ভাইব্রেশন মানে যে কম্পন-তরঙ্গ, তা জেনেও স্টুপিডের মতো বলে ফেলেছিলাম—তার মানে?

কীরকম যেন দয়া-দয়া চোখে চেয়ে রইল বেঁটে বঙ্ক—সেই বঙ্ক—যাকে কিনা দেখলেই টিটকিরি দিতাম ছড়া কেটে :

বঙ্ক তুই কঙ্গো যা—টেকোমাথায় চুল গজা।

সত্যি-সত্যিই কঙ্গোয় চলে এসে টাকে-বুকে-মুখে-গায়ে সব জায়গায় চুল গজিয়ে ফেলেছে বঙ্ক! এর পরেও যদি অবাক না হই, তো হব কীসে?

মুখ্যু বঙ্ক দেখলাম বেশ ইংরেজিও শিখেছে! দয়া-দয়া চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে,—ফিফটি থাউজেন্ড চাইনিজ-সিম্বল দিয়ে নানা ধরনের সাউন্ড বুঝিয়েও যা হয় না—মাত্র বাইশটা হিব্রু হরফ দিয়ে তা সম্ভব। যদিও ডানদিক থেকে বাঁদিকে লেখা হতো এই ভাষা, ব্যঞ্জনবর্ণেরও বালাই নেই—কিন্তু ঠিকমতো গুনে-গুনে উচ্চারণ করতে পারলে ম্যাজিক ঘটে...ম্যাজিক!

হাঁ করে চেয়ে রইলাম আমি। বলে কী ব্যাটা বঙ্ক?

—চলে এলুম কঙ্গোয়, মনের দুঃখে। ছড়া কাটতে মনে নেই? ভূগোল-টুগোল

তো পড়িনি—ওই একটা দেশেরই নাম জানতুম। বিবাগী হয়ে এনুম সেখানেই। তারপর দেখা হল লোমশবাবার সঙ্গে—

—লোমশবাবা।

—হ্যাগো। পিগমিরা তাকে ওই নামেই ডাকত। সারা গায়ে ইয়া বড়-বড় চুল। ঠিক আমার মতো। রঙটা খালি সাদা। সাহেব তো। হিব্রু বর্ণমালা নিয়ে রিসার্চ করতে-করতে দেখেছিল, প্রত্যেকটা হরফ যেন শক্তিতে ঠাসা। ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারলে ভাইব্রেশনের ভেলকি দেখাতে পারে। গাছপালার বাড় বাড়িয়ে দিতে পারে—আরও অনেক ব্যাপার। সে পরে শুনবে' খন। একদিন হয়েছে কী, বলে হা-হা করে হেসে গড়িয়ে পড়ল বঙ্কু—কোত্থেকে একটা হিব্রু মন্ত্র পেয়ে ১০৮ বার জপ করে দেখছিল সত্যি-সত্যিই ভাইব্রেশনের এফেক্ট হয় কিনা।

—কীসের মন্ত্র?

—চুল গজানোর। প্রথম-প্রথম উচ্চারণ ঠিক হয়নি। তারপর কখন যে ঠিক হয়ে গেছে, নিজেরই খেয়াল নেই। এদিকে ১০৮ বার বলাও হয়ে গেছে মন্ত্রটা—মানে—একটাই শব্দ। ব্যস, আর যায় কোথা! —বলেই আবার হা-হা করে হেসে উঠল বঙ্কু।

কী হল বলবে তো?—বিষম রাগ হয়ে গেল আমার।

—কী আবার হবে? চুল গজিয়ে গেল, চুল! ভাইব্রেশনের ধাক্কায় চুলের ফলিকল বা খুদে থলির মতো কারখানাগুলোয় হড়-হড় করে উৎপাদন শুরু হয়ে গেল। ডারমিস থেকে এপিডারমিস খুঁড়ে চামড়ার ওপর দিয়ে বেরিয়ে এল লম্বা-লম্বা চুল। বছরে মাথার এক লাখ চুল বাড়ে পাঁচ ইঞ্চির মতো, গালের তিরিশ হাজার চুল বাড়ে সাড়ে পাঁচ ইঞ্চির মতো। কিন্তু ১০৮ বারেরও বেশি মন্ত্রটা ঠিকঠাক উচ্চারণ করে যাওয়ার ফলে এক বছরের কাজ হয়ে গেল একমাসেই। লম্বা চুল শুধু মাথা আর গাল নয়—গা থেকেও এল বেরিয়ে। হা-হা-হা! লোমশ মুনিও নিশ্চয় জানতেন ভাইব্রেশনের এই বৈজ্ঞানিক মন্ত্র, সংস্কৃত ভাষায় অবশ্য, তাই না প্রফেসর?

শুধু একটু মুচকি হাসলেন প্রফেসর।

বঙ্কু আর একটু হেসে নিয়ে বললে,—লোকের টিটকিরির জ্বালায় সাহেব চলে এল এইখানে। পিগমিরা তার নাম দিল লোমশবাবা। আমার সঙ্গে দেখা হতেই তার পায়ে ধরে পড়লাম। সাহেব তখন মন্ত্র বলে দিল কানে-কানে। বলেছিল, বেশিবার বলিসনি। বুঝেছিস? কিন্তু—আমার দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে বললে বঙ্কু—দীননাথকে টাারা করবার জন্যে একটু বেশিবারই বলে ফেলেছিলুম। সাহেব তো রেগে আগুন। বললে,—এক জায়গায় দুজন লোমশবাবা থাকতে পারে না। কারওরই প্রেস্টিজ থাকবে না। বলে সেই যে চলে গেল, আর এল না।

প্রফেসর তোমার ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে? —এতক্ষণে এলাম আসল কথায়।

উদাস গলায় বললে বন্ধু,—সেই সাহেবটারই কাণ্ড নিশ্চয়। তোমার টিটকিরি দেওয়ার কথা তার কাছে বলতাম কিনা, ঠিকানাটাও বলে ফেলেছিলাম নিশ্চয়।

তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলাম,—ইয়ার্কি হচ্ছে। ইচ্ছে করে সাহেবকে দিয়ে খবর পাঠিয়ে, সাহেবের পুরোনো কোট-প্যান্ট পরে আমাকে বেইজ্জত করার মতলব তোমার বার করছি—

বলেই হাত তুলেছিলাম টেনে চড় কষাব বলে।

গম্ভীর গলায় অমনি বললে বন্ধু,—খবরদার, মারধর করতে যেও না। পিগমিরা যদি খবর পায় বসোবাবা মার খেয়েছে—

না। মারিনি বন্ধুকে। উলটে পায়ে পর্যন্ত ধরেছিলাম মন্ত্রটা শিখিয়ে দেওয়ার জন্যে। শয়তানটা আমাকে কিচ্ছু বলেনি—বলেছে প্রফেসরকে।

তিনি তো মুখে চাবি এঁটে বসে আছেন। ভয়ের চোটে নিশ্চয়। লোমশবাবা হয়ে গেলে সমাজে টেকা দায় হবে যে!

রক্তবীজ

লেখো, দ্য ক্যাট স্যাট অন দ্য ম্যাট।

লাস্ট বেঞ্চ থেকে উঠে দাঁড়াল ছ'বছরের একটি ছেলে। স্মার্ট চেহারা। ফরসা। চওড়া কপাল। চোখদুটো বেশ বড়! মুখ নয়—যেন চোখের মধ্যে দিয়েই কথা বেরোচ্ছে।

মিস বললেন,—কী হল জয়? লেখো—দ্য ক্যাট স্যাট অন দ্য ম্যাট।

ছেলেটি বললে,—আমি যেখান থেকে এসেছি সেখানে বেড়ালরা কখনও মাদুরে বসে না—সাইজেও তারা অনেক বড়।

চোখ নাচিয়ে মিস বললেন,—কত বড়?

—ন'ফুট।

—সিট ডাউন। লেখো, দ্য ক্যাট স্যাট অন দ্য ম্যাট।

—না।

ঠিক সেই সময়ে ক্লাস থ্রি-বি'র ক্লাসটিচার বলছিলেন—জয়, তোমাকে তো আগে ক্লাসে দেখিনি?

আজকেই এলাম স্যার। —আট বছরের স্মার্ট ছেলেটা বলল পেছনের বেঞ্চ থেকে।

—ও। তোমাকে এ ছবি আঁকতে কে শিখিয়েছে?

—যা দেখে এসেছি, তাই এঁকেছি।

—কোথায় দেখে এসেছ?

—যেখান থেকে আমি এসেছি।

—কিন্তু পৃথিবীর কোথাও এমন দৃশ্য তো দেখা যায় না।

ক্লাস থ্রিতে তখন ক্লাসটিচার হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছেন হাতের খাতার দিকে। পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছিল কীভাবে, লিখতে দিয়েছিলেন। ভারি এক্সপার্ট একটা ছেলে পৃথিবীর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সুন্দরভাবে সংক্ষেপে লিখে গিয়েছে। অ্যাটম বোমা ফাটিয়েই নাকি একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে পৃথিবী—সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।

—তোমাকে সায়েন্স ফিকশন লিখতে কে বলেছে?

এটা ফিকশন নয়—ফ্যাক্ট। যা ঘটবে তাই লিখেছি। —দশ বছরের সপ্রতিভ ছেলেটি চোখে চোখ রেখে বলে গেল স্পষ্ট উচ্চারণে।

—ফাজলামি হচ্ছে?

—আজ্ঞে না, ওয়ার্নিং।

সপাং করে বেত আছড়ে টিচার বললেন,—কী নাম তোমার?

—জয়।

একই সময়ে ক্লাস সেভেনে বারো বছরের ছেলে জয়কে নিয়ে মহা বিড়ম্বনায় পড়েছেন ক্লাসটিচার। ছেলেটি অতিশয় চৌকস। বুদ্ধি-উজ্জ্বল মুখ আর চোখ। কপাল বেশ চওড়া। কিন্তু যেন এঁচড়ে পাকা। বলে কিনা, মহাবিশ্বে সবচেয়ে বোকা প্রাণী হল এই পৃথিবীর মানুষ। অনেক বেশি বুদ্ধিমান জীব আছে অন্যগ্রহে—অনেক বেশি ক্ষমতাবান। এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহে যাওয়ার জন্যে তারা যে স্পেসশিপ বানায়—তা কল্পনাতেও আনতে পারবে না পৃথিবীর মানুষ। দেখলে চোখ কপালে উঠে যাবে।

—তুমি দেখে এসেছ বুঝি?

—আমি তাইতেই এসেছি।

—শাট আপ। কী নাম তোমার? আগে তো এ ক্লাসে দেখিনি?

—আজকেই যে এলাম পৃথিবীতে। আমার নাম জয়।

প্রিন্সিপালের ঘরে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লেন চারজন ক্লাসটিচার। প্রত্যেকেই এক অভিযোগ এনেছেন। প্রত্যেকের ক্লাসেই একটি নতুন ছেলে এসেছে। অবাধ্য। অদ্ভুত। পাকা।

প্রিন্সিপাল সব শুনলেন।

বললেন,—ডাকুন ছেলেদের।

ঘরে ঢুকল চারটি ছেলে। একইরকম দেখতে চারজনকে। শুধু মাথায় ছোট-বড়—বয়েসে তফাৎ। একজনের বয়স ছয়, একজনের আট, একজনের দশ, আরেকজনের বারো।

প্রিন্সিপাল উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। ক্লাসটিচার চারজনেও স্তম্ভিত। প্রত্যেকের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে।

—নাম কী তোমাদের?

জয়—একসঙ্গে জবাব দিল চারজনে।

প্রিন্সিপাল ভীষণ রাশভারি পুরুষ। ক্লাসটিচারদের বললেন,—আপনারা ক্লাসে যান।

যেন একই ছাঁচে তৈরি সন্দেশের মতো চারটে হাসি-হাসি মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন হতভম্ব টিচাররা।

প্রিন্সিপাল বললেন,—তোমরা কে?

বারো বছরের জয় বললে,—অন্য গ্রহের মানুষ।

—চারজনকে একরকম দেখতে কেন?

—ক্লোনিং নিয়ে চিন্তা-ভাবনা চলছে তো আপনাদের পৃথিবীতে। জানেন না কেন?

ক্লোনিং! —ঢোক গিললেন প্রিন্সিপাল। জীবের বংশানুক্রমের মূলাধার জিন-তত্ত্ব তিনি জানেন। জীবকোষের জিনের মধ্যে থাকে ডি-এন-এ মলিকিউল —তার মধ্যে দেহ আর মনের বৈশিষ্ট্য নিহিত থাকে। কিন্তু ক্লোনিং কী?

বারো বছরের জয় উজ্জ্বল চোখে চেয়েছিল। শুধু চেয়েছিল নয়—প্রিন্সিপালের মনের ভেতর পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছিল।

বলল,—১৯৬০ সালে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর স্টুয়ার্ড গাজরের কোষ নিয়ে নারকেলের দুধ মিশানো আরকে ডুবিয়ে রেখে সেই কোষ থেকে গাজর বানিয়েছিলেন। জানেন?

—তুমি জানলে কী করে?

হাসল জয়,—আমি স-ব জানি। এই পৃথিবীর কোথায় কী হয়েছে, হচ্ছে, অথবা হবে—সব জানি। তাই আমি এসেছি। গাজরের কোষ থেকে যেমন গাজর বানানো যায় ল্যাবরেটরিতে, ঠিক তেমনি মানুষের চামড়ার কোষ থেকেও অবিকল একইরকম অসংখ্য মানুষ বানানো যায় ল্যাবরেটরিতে। এরই নাম ক্লোনিং।

—কিন্তু—

—ডি-এন-এ নিয়ে গবেষণা করে নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর জেমস ওয়াটসন অ্যাটলান্টিক মান্থলি ম্যাগাজিনে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন,—খবরদার, মানুষের ওপর ক্লোনিং করতে যেও না—সর্বনাশ হবে। কেউ বলে, শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর তৈরির মতন—মানুষ গড়তে গিয়ে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নরদানব তৈরি হয়ে যেতে পারে।

আবার ঢোক গিললেন প্রিন্সিপাল।

জয় বললে,—জেমস ওয়াটসনের ধারণা যে ভুল, আমাকে দেখেই বুঝছেন। একই চামড়ার কোষ থেকে আমরা চারজন হয়েছি—হুবহু একই রকম ক্লোনিং করলে যা হবেই।

—অ্যাঁ।

—অনেকটা রক্তবীজের কাহিনির মতো। দৈত্যরাজ শুম্ভ-নিশুম্ভর সেনাপতি রক্তবীজের প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে যেমন আর একটা রক্তবীজ জন্মাত—এও ঠিক তেমনি। প্রতিটি কোষ থেকেই হুবহু সেই রকম আর একটা মানুষ জন্মাবে।

—তা...হলে...এ সব আমাকে বলা কেন?

গভীর চোখে চেয়ে থেকে ভিনগ্রহের রক্তবীজ বললে,—পৃথিবীর ধ্বংস ঘনিয়ে এসেছে। অন্য গ্রহ থেকে আমরা তা টের পেয়েছি। আমরা ভবিষ্যৎ প্রত্যক্ষ করতে পারি। দেশে-দেশে অ্যাটম বোমা এত জমা হয়েছে যে ভাবাও যায় না। লড়াইতে পৃথিবী ধ্বংস হবে—মহাশ্মশান হবে—কেউ বাঁচবে না। তাই আমরা এসেছি অন্য গ্রহে আর-এক পৃথিবী সৃষ্টি করতে।

—মানে?

—পৃথিবীর সব রকম ভালো মানুষের চামড়া একটু করে চেঁচে নিয়ে টেস্টটিউবে ভরে আমরা ফিরে যাব আমাদের গ্রহে। সেই সব কোষ থেকে বানিয়ে নেব হুবহু সেই সব মানুষ—এক নয়—অনেক—আমাদের যেমন দেখছেন—সেই রকম। একই পণ্ডিত থেকে বানিয়ে নেব লক্ষ পণ্ডিত—এক শিল্পী থেকে লক্ষ শিল্পী। তাই শুধু সৎ মানুষের চামড়াই আমরা নিতে এসেছি। বদলোকের নয়।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন প্রিলিপাল।

পকেট থেকে ছোট টর্চের মতো একটা যন্ত্র বার করে এগিয়ে এল বড় জন,—হাতটা কাইন্ডলি বাড়িয়ে দিন স্যার!

শেষ খাওয়া

বিষ্ণুপদ সামন্ত মৃত্যু-কুঠুরিতে অকারণে আসেনি। খুনটা করেছিল ভালোই, খুঁতও রাখেনি—কিন্তু সূত্র লোপাট করতে ভুলে গেছিল রাগের মাথায়। তার কারণটা অবশ্য জলের মতো সোজা। বিষ্ণুপদকে একটা গাড়ল বললেই চলে।

নিজেকে ও মনে করে মস্ত অ্যাক্টর। এমন একটা সময় গেছে, যখন বেশ কিছু লোককে বুঝিয়ে ছেড়েছিল, সত্যিই বিধাতা ওকে নট-নক্ষত্র হওয়ার জন্যে পাঠিয়েছেন এই পৃথিবীতে। টেলিভিশনের রমরমা শুরু হতেই প্রতিসপ্তাহে ঘরে-ঘরে দেখা যেত ওর শ্রীমুখ, ছোট পর্দার বুকে। ধুরন্ধর মহাকাশ বোম্বেটে সিরিয়ালটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই অবশ্য খুবই যন্ত্রণার সঙ্গে জেনে ফেলেছেন, বিষ্ণুর মগজে অভিনয়ের উপাদান নেই বললেই চলে। অতি-বিখ্যাত এক তেজপাতা কোম্পানি বস্তা-বস্তা টাকা উড়িয়ে ছবিটা নির্মাণ করেছিল। বিষ্ণুপদ বোম্বেটে নাকি তাকে শুঁটকি মাছের কারবারে নামিয়ে দিয়েছে।

তেরোটা সপ্তাহ পরে যখন গণেশ উলটে গেল কোম্পানির (এবং বিষ্ণুপদের ভাগ্যের), তখন টেলিফোনের মধ্যে দিয়ে সমালোচকদের কানে মধু ঢালবার চেষ্টা চালিয়ে গেছিল নিছু-নিছু নায়ক।

—কে, কণ্ঠশ্রাক নাকি?

—কার কণ্ঠ?

—বিষ্ণুপদ সামন্তর কণ্ঠস্বর চিনতে এত কষ্ট হয়?

—টিভির হাওয়ায় গলা পালটে গেলে চেনা যায় না। বলো বিষ্ণু, কী করতে পারি তোমার জন্যে?

—ধুরন্ধর মহাকাশ বোম্বেটে লাগল কেমন?

—ফার্স্টক্লাশ। খেল খতম করে দিয়েছ কাল রাত্রে।

—তেরোটা এপিসোড শেষ। কাল আরও তেরোটার কথা চলছে।

—আবার তেরোটা? কার টাকায়?

—এবার এক মুড়কি কোম্পানি এগিয়ে আসবে মনে হচ্ছে।

—আমাকে কী করতে হবে?

—দু-কলম লিখে দাও আমাকে নিয়ে। জানই তো আমি যা ছোঁব, তা সোনা হয়ে যাবে। তেজপাতার চেহারা পালটে দিয়েছি, এবার যদি মুড়ি-মুড়কিদের ধরি—

—পাবলিসিটি চাই, এই তো? লেখব'খন। আর কিছু?

—ইয়ে, এইটাই দরকার। পাবলিসিটির অভাবেই তো ট্যালেন্টগুলো কল্কে পাচ্ছে না। তুমি যদি একটু...।

—বললাম তো লেখব। এখন বড্ড ব্যস্ত।

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, ছাড়লাম।

'নির্জলা সত্যি অ্যাডভেঞ্চার পত্রিকা'র কাটতি আট থেকে আশি বছরের মধ্যে। লাইনে-লাইনে থাকে গা-ছমছমে কাণ্ডকারখানা। সমালোচনা-টমালোচনাগুলোও লেখা হয় রোমহর্ষক কায়দায়। যাঁরা লেখেন, তাঁরা নাকি সবাই ভূতপেত্নী, ভ্যাম্পায়ার, অদৃশ্য অবস্থায় সর্বত্র গিয়ে হাঁড়ির খবর জেনে আসতে পারেন বলেই নির্জলা সত্যি খবর সংগ্রহ করা যায়। বিষ্ণুপদ সামন্তকে একহাত নেওয়া হল ছোট পর্দার ছোটলোকমি বিভাগে, সাত দিন যেতে না যেতেই। ভাষাটা এইরকম :

বিষ্ণুপদ সামন্ত অভিনীত ধুরন্ধর মহাকাশ বোম্বেটে প্রেত সমাজে বিপুল সাড়া ফেলিয়াছে। ভদ্রলোকের চামড়া লইয়া ডুগডুগি বাজাইবার জন্যে নন্দীভৃঙ্গীর ছানাপোনারা কোমর বাঁধিয়া বসিয়া আছে। তাঁহার প্রেতের চাইতেও জঘন্য আকৃতি এবং খোনাকণ্ঠের বিকৃতি সমগ্র প্রেতলোককে স্তম্ভিত করিয়া ছাড়িয়াছে। নরলোকে এই জীবন্ত মড়াকে এখনও কেউ চিনিতে পারে নাই দেখিয়া প্রেতসংঘটি মহাকাশে জরুরি বার্তা পাঠাইয়াছেন। অন্যান্য গ্রহের বাসিন্দারা যেন অবিলম্বে পৃথিবীগ্রহে আগমন করেন। তাঁহাদের নামে কুৎসা প্রচার করিয়াছে যে নরাকৃতি জীবটি, তাহার অভিনয়ের সাধ জন্মের মতো ঘুচাইয়া দেওয়া দরকার...ইত্যাদি।

বিষ্ণুপদ সামন্ত সমালোচনা পড়েই অশরীরী গোয়েন্দাসংস্থাকে নিয়োগ করে এবং সমালোচনাটা তারই বন্ধু করগ্রাহ্য কর লিখেছে জানতে পেরে তাকে যমালয়ে পাঠিয়ে দেয়। এত তাড়াতাড়ি খুন করলে সবাই ভুল করে। বিষ্ণুপদও নিজের ফাঁদে ধরা পড়ে যায়। মাথায় বুদ্ধি কম বলে, ভালো উকিল লাগিয়েও মৃত্যুদণ্ড মকুব করাতে

পারেনি, জজসাহেব তার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার পর জিগ্যেস করেছিলেন,—বলুন, আপনার শেষ ইচ্ছে কী?

—সসেজ।

—খাবেন?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তাই খাবেন, আশ মিটিয়ে খাবেন তারপর ফাঁসির মঞ্চে উঠবেন।

ঠিক কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল আদালতে, তা খবরের কাগজের রিপোর্টাররা গুছিয়ে লেখেননি। জজসাহেবও তাঁর লিখিত আদেশে শেষ খাওয়ার বৃত্তান্ত খুঁটিয়ে লিখলেন না কীসের প্রেরণায় এখনও তা জানা যায়নি। হয়তো প্রেতলোকের হাত আছে এ ব্যাপারে।

মৃত্যুকুঠরিতে বসে খাতা-পেন্সিল নিয়ে বিষ্ণুপদ এখন সসেজ সম্পর্কে কবিতা লিখছে। শুয়োরের সসেজ ওর প্রিয় খাদ্য। মরতে চলেছে জেনেও প্রিয় খাদ্যকে ভুলতে পারছে না।

ঠিক এই সময়ে কেঁপে উঠল নাকের সামনেকার বাতাস। আগুনের ওপর বাতাস যেমন কেঁপে কেঁপে উঠে যায়, ঠিক সেইরকম। তারপরেই নিরেট হয়ে গেল খানিকটা হাওয়া, আকার নিল একটা মানুষের। মাঝারি সাইজ, পরনে টাইট জিনস প্যান্ট আর কালো সোয়েটার। হাত-পা দুটো-দুটো করে। চোখ কিন্তু একটা—কপালের ঠিক মাঝখানে, লিকলিকে একটা অ্যান্টেনা রয়েছে ব্রহ্মতালুতে।

অ্যান্টেনার ডগাটা সাঁই করে চাবুকের মতো আছড়ে পড়ল বিষ্ণুপদর কবিতার খাতায়। খাতা আর পেন্সিল ছিটকে গেল দু দিকে।

—ইয়ার্কি হচ্ছে? বললে বিষ্ণুপদ।

—সরি। হঠাৎ তলব এলে বড় চঞ্চল হই।

বিষ্ণুপদর বুদ্ধি কম। তবুও চিনতে পারল একচক্ষু জীবটাকে।

বললে,—ভিনটো গ্রহের মানুষ মনে হচ্ছে?

—একটা চোখ দেখেই চিনে ফেললে?

—সত্যিই ভিনটো গ্রহ আছে?

—না থাকলে লেখক লিখবে কেন?

—ও তো বানানো লেখা।

—তোমার মুণ্ডু। লেখকরা সত্যি ছাড়া মিথ্যে লেখে না।

—এসেছ! কেন?

—ডেকেছ বলে।

—আমি! আমি কখন ডাকলাম?

—তোমার অভিনয় আমাদের টনক নড়িয়েছে।

—ভালো লেগেছে?

—বিলক্ষণ। বলো কী চাই।

—কী চাই মানে?

—যা চাও, তাই পাবে। ভালো অভিনয়ের পুরস্কার পাবে।

খুশি হল বিষ্ণুপদ। অনেকক্ষণ ধরে ভাবল। নাকের সামনে নড়তে লাগল একজোড়া অ্যান্টেনা।

ফন্দিটা এসে গেল মাথায়। বললে,—এখান থেকে বেরোতে চাই। কালকেই যাবে গর্দান।

—অসম্ভব। গর্দান তোমার যাবেই। ওটা রোখা যাবে না।

—তার মানে?

—নিয়তিকে পালটানোর ক্ষমতা আমার নেই।

—তবে কচুপোড়া খাও। সরে পড়ো। এখুনি আসবে গরম সন্দেশ। শেষ খাওয়ায় বাগড়া দিও না।

—মাথায় এত বুদ্ধি কম কেন?

—কী...কী বললে?

—নিয়তিকে পালটানোর ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু আটকে দেওয়ার ক্ষমতাটা আছে।

—কেটে পড়ো।

—শোনো বিষ্ণুপদ, শোনো। প্রেতলোকে তোমাকে তেলেভাজা করা হবে জেনেই দৌড়ে এসেছি।

—সে কী!

—বন্ধুলোক তুমি, কল্পবিজ্ঞান নিয়ে নাটক করো। আমি চাই না ভূতপেত্নীরা তোমাকে গরম তেলে ভাজুক।

—কী করা যায় সেইটা বলো।

—সন্দেশ খেয়ে যাও।

—অ্যাঁ!

—দেদার সন্দেশ খেয়ে যাও...শুধু সন্দেশ আর সন্দেশ, একটার পেছনে একটা...তার পেছনে আর একটা...

—তাজা সন্দেশ?

—নিশ্চয়। ফুরোবে না কিছুতেই।

—আহা! কিন্তু তাতে লাভ?

—কী বুদ্ধি! সন্দেশ যদি না ফুরোয়, তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে কী?

—কী?

—তোমার শেষ খাওয়া শেষ হচ্ছে না।

—ঠিক...ঠিক...ঠিক...শেষ খাওয়া শেষই হচ্ছে না...

—শেষ খাওয়া শেষ না হলে কী হচ্ছে?

—কাঁসিটা আর হচ্ছে না।

—এই তো বুদ্ধি খুলেছে।

—তোফা! তোফা! তোফা! শুধু সসেজ খেয়েই যাব?

—হ্যাঁ শুধু সসেজ। জজসাহেব তো তাই বলেছেন—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস...বছরের পর বছর...

—শতাব্দীর পর শতাব্দী...আহা! আহা! আহা!

—খুশি?

—বিলক্ষণ।

—এবার আমরা একটা জিনিস চাই?

—বলো-বলো, যা চাইবে দেব।

—তোমার অভিনয় প্রতিভা।

—অসম্ভব! জান যায় যাক, এ প্রতিভা দিতে পারব না।

—এই জন্যেই লোকে তোমাকে মাথামোটা বলে।

—ফের!

—জানই যদি চলে যায়, অভিনয় প্রতিভা থাকবে কোথায়!

—তোমরা রেখে দেবে?

—মাথায় তুলে রাখব। আমাদের এই ভিমটো গ্রহে সব আছে, শুধু থিয়েটার নেই! কেন না, লোকে অভিনয় করতেই জানে না। আমরা চাই তোমার অভিনয় প্রতিভা নিয়ে আমরা অভিনয় শিল্প গড়ে তুলব।

—এই জন্যেই বলে, গেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায়না। এরা আমাকে চিনতেই পারল না। যাক, কখন নেবে আমার প্রতিভা?

—এখুনি। এল বলে তোমার সসেজ। মাথা নামাও।

মাথা নামাল বিষ্ণুপদ। এককচ্ছু তার অ্যান্টেনার ডগা ঠেকাল বিষ্ণুপদর মাথায়। এক সেকেন্ডের জন্যে চোখে ধোঁয়া দেখল বিষ্ণুপদ। তারপর বেশ ঝরঝরে মনে হল মাথাটাকে। এককচ্ছুকে কিন্তু আর দেখতে পেল না।

ঠিক এই সময়ে এসে গেল থালাভর্তি গরম-গরম সসেজ। কপাকপ মুখে পুরে গেল বিষ্ণুপদ। হাওয়ার বস্তু থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নতুন-নতুন গরম সসেজ তৈরি হয়ে লেগে গেল একটার পেছনে আর একটা।

বিষ্ণুপদ এখনও খেয়ে চলেছে।

সময়ের ঘূর্ণিপাকে

বিরামহীন কালস্রোতে ভেসে চলেছি আমরা। ভাসমান অবস্থায় যদি আমাদের গতি হয় বর্ধিত, আমরা বর্তমান থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাব। আর এই পরিবর্তিত গতি হয় যদি ভাটার টান, তাহলে আমরা যাব...

গলাতকের মনে হল, বুঝি শতাব্দীকাল ধরে এই তুষার ঝটিকার বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করে চলেছে। সময়ের আর কোনও অর্থই যেন তার কাছে নেই—সব একাকার হয়ে গেছে। আর এক পা এগোলেই তার কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল নরম-শুভ্র তুষারস্তূপের মধ্যে। একবার তো সে প্রায় তুষারের ভেতর সম্পূর্ণ তলিয়ে গেছিল—কানায়-কানায় তুষার ভরা একটা গহ্বর না জেনে পেরতে গিয়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। সারাক্ষণ রেণু রেণু তুষার ঝুর-ঝুর করে ঝরে পড়ছে তার সর্বাঙ্গে। কখনও বা তুষারের প্রবল ঝাপটায় চোখ-কান প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম। কোটের কলারের ফাঁক দিয়ে পিঠের ভেতর তুষার পড়ছে ঢুকে, পকেট গেছে বোঝাই হয়ে, এমনকী জুতোর ভেতরেও তুষার পথ করে নিতে কসুর করেনি।

অবশেষে এক সময় এই প্রচণ্ড ঝড় যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিলে বিদায়—ঝকঝকে চাঁদ দেখা গেল—নীল আকাশে রুপালি চন্দ্রকিরণ রজতশুভ্র তুষারের ওপর যেন লক্ষবাতির দেওয়ালী উৎসব শুরু হয়ে গেল। কিন্তু ঝড়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরিশ্রান্ত যোদ্ধাটির কোনও দৃষ্টিই ছিল না এই অনুপম প্রাকৃতিক শোভার দিকে। শক্তির শেষ সীমায় এসে সে পৌঁছেছে, তবুও ভয়ের তাড়না তাকে কেবল এগিয়ে নিয়ে চলেছে তো চলেইছে। সহসা ঝলমলে চাঁদের জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক ভেসে গেল, আর চোখের

সামনে ভেসে উঠল যে দৃশ্য—তাতে তার হৃদয় মহা উল্লাসে নৃত্য করে উঠল: দূরে দেখা গেল একটি গৃহ—তার গন্তব্যস্থান এসে গেছে—যাত্রার হল শেষ।

ক্লান্ত দেহে সঞ্চারিত হল নতুন শক্তি—মহা উৎসাহে তাড়াতাড়ি এগোতে গিয়ে সে বার-বার হোঁচট খেয়ে পড়তে লাগল। মাঝে-মাঝে পেছনে নিক্ষেপ করতে লাগল আতঙ্ক দৃষ্টি। কিন্তু না, শঙ্কার আর কোনও কারণ নেই। ধন্যবাদ তুষার ঝটিকা! অনুসরণকারীদের চোখে অনায়াসেই ধুলো দিতে সক্ষম হয়েছে।

শ্যালকের কথা ভাবতেই বহু চিন্তা এল মনে ভিড় করে—তারই বাড়ির দিকে তো সে এখন চলেছে। অতীতে রমেন তাকে বহু প্রকারে বহু সাহায্য করেছে—একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রতিবারই সে বলেছে, আর না, এই শেষ। কিন্তু এবার কি সে কোনও সাহায্য করবে? যখন সে শুনবে, সে হত্যা করে পালিয়ে এসেছে, তখন? কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্যেই যে তাকে বাধ্য হয়ে গুলি চালাতে হয়েছে, সে কি তা বিশ্বাস করবে?

এর আগে অনেক গণ্ডগোলে জড়িয়ে পড়ার ফলে সে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করেছে একটা ছদ্মনাম। পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে একজন হরিপদ ঘোষালকে। এই অবসরে সে তার আসল নামে নিরাপদেই গ্রাম ত্যাগ করে সরে পড়তে পারবে। কিন্তু এখন তার বিশেষ প্রয়োজন টাকার। কোনও দূর দেশে পালাতে হবে—তার কোনও চিহ্নই আর পুলিশ খুঁজে পাবে না। এই রকম বেপরোয়া পরিস্থিতিতে রমেন কি তাকে ত্যাগ করতে পারবে? কখনওই না। আঃ, এই যে দেখা যাচ্ছে ফটকটা।

তুষার-শীতল আঙুলগুলো দিয়ে ফটকটা চেপে ধরে একবার সে পেছনে দেখে নিলে—না, অনুসরণের কোনও চিহ্নই নেই। খুশি মনে ফটকে দিলে ঠেলা—খুলে গেল পাল্লাদুটো। একটা রাস্তা সিধে চলে গেছে—শেষ হয়েছে বিস্তৃত জমির ওপর নির্মিত এক সুদৃশ্য ভবনের সামনে। পথের দুপাশে সুউচ্চ বৃক্ষসারি। পথের অন্ধকারে পলাতকের শ্রান্ত দেহটি ছায়ামূর্তির মতো গেল মিশে।...

মুম্বইগামী ট্রেনের একটা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় বাঙ্কের ওপর আধশোয়া অবস্থায় বসেছিলেন ডক্টর রমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। সামনের শূন্য বাঙ্কটিতে যে একটি মনুষ্য-মূর্তি এসে উপস্থিত হল—তা তিনি দেখতেই পেলেন না। আনবিক যোগ শক্তির (valence) ইলেকট্রনিক থিওরি সম্বন্ধে একটা বই তিনি পড়ছিলেন—বইটার ওপরই তাঁর সবটুকু মনোযোগ তিনি রেখে দিয়েছেন। কিন্তু বারে-বারে তিনি সচেতন হয়ে উঠতে লাগলেন—বোধ হল, কেউ তাঁকে তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ করছে। অবশেষে বইটা নামিয়ে রেখে তিনি নীরব দর্শকটির মুখোমুখি হয়ে বসলেন।

দেখলেন, বলিষ্ঠ, বিপুলাকৃতি এক পুরুষ, মধ্যবয়সি রোদে-জলে মলিন, তামাটে মুখ। সে মুখ তিনি চিনে উঠতে পারলেন না, কাজেই আবার বইটা তুলে নিতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে পুরুষটি কথা বলতে শুরু করলেন।

—মাপ করবেন, আপনি বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডক্টর চ্যাটার্জি। তাই না?

মাপ করবেন, আমার ঠিক স্মরণ হচ্ছে না—

আমার নাম সমরেশ,—আমাটে স্থূল পুরুষটি বললে, আমার নাম সমরেশ ঘোষাল।

ডক্টর চ্যাটার্জি মাথা নাড়লেন; বইটা চোখের সামনে তুলে ধরতে-ধরতে বললেন,—দুঃখিত সমরেশবাবু, ও নামে কাউকেই আমার স্মরণ হচ্ছে না। মাপ করবেন—

প্রায় বিশবছর আগে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল,—আলোচনা বন্ধ করে দেওয়ার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না সমরেশ ঘোষালের, দার্জিলিং জেলার ছোট্ট একটা গ্রামে আপনার সাথে হয়েছিল আলাপ। সে সময়ে আমি ছিলাম একজন ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর। একটু থেমে মাথা নেড়ে বললে,—তারপর আর দেখা হয়নি। প্রায় বারো বছর হল আমি অবসর নিয়েছি।

ডক্টর চ্যাটার্জির চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। নবীন আগ্রহ নিয়ে বিশালাকৃতি সমরেশ ঘোষালকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে-দেখতে তিনি বললেন,—মনে পড়েছে। কিন্তু তোমার তো দেখছি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। —চিন্তান্বিত মুখে কপালে টোকা মারতে-মারতে তিনি বলতে লাগলেন,—সবুর করো—যতদূর মনে পড়ছে, একটা লোকের পিছু নিয়ে তুমি আমার বাড়িতে এসেছিলে।

—ঠিক। আপনার মনে পড়তে পারে সে রাতে প্রবল ঝড় হয়েছিল। লোকটা এই ঝড়ের সুযোগ নিয়ে আমাদের চোখে অতি সহজেই ধুলো দেয়। কিন্তু পরে তার পদচিহ্ন আমরা খুঁজে পেলাম। আর সে চিহ্ন দিয়ে আপনার বাড়ির সদর দরজা পর্যন্ত এসে শেষ হয়ে গেল।

—চমৎকার। হ্যাঁ, এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। বিড়বিড় করে বৈজ্ঞানিক বললেন।

—আমরাও ভেবেছিলাম ব্যাপারটা বেশ চমৎকার। তার পদচিহ্ন শেষ হয়েছে আপনার সদর দরজার সামনে—কিন্তু লোকটার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না কোথাও।

—আর তখন তোমরা কী বিশ্রী হট্টগোলেরই না সৃষ্টি করলে। সমস্ত বাড়িটা ওলট-পালট করে তল্লাশ করলে। বাকি রেখেছিল শুধু বাড়িটাকে পকেটে করে নিয়ে যেতে।

—আপনার অসুবিধার কারণ হয়েছিলাম বলে সত্যিই দুঃখিত। কিন্তু অবস্থার চাপে পড়ে তা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না।

—তা তো বটেই। তোমরা কেবল তোমাদের কর্তব্যই করেছ।

—হ্যাঁ, কর্তব্যই করেছিলাম। কিন্তু সফলতা লাভ করিনি।

কঠিন দৃষ্টিতে সমরেশ তাকালে,—এখনও অবাক হয়ে যাই যে, লোকটা লুকলো কোথায়। শপথ করে বলতে পারি, লোকটা বাড়ির ভেতরেই ঢুকেছিল, কিন্তু বাড়ি

থেকে আর বাইরে বেরিয়ে আসেনি। কিন্তু কী আশ্চর্য, আমরা তার টিকির ডগাটিও দেখতে পেলাম না।

ডক্টর হাসলেন—হাসিতে প্রসন্ন ব্যঙ্গ, তোমরা তো সব জায়গাই খুঁজেছিলে—সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই?

—ছাদ থেকে শুরু করে মাটির তলায় চোর-কুঠুরি পর্যন্ত—কোথাও বাকি রাখিনি। চার দেওয়ালের মধ্যবর্তী স্থানের প্রতিটি ইঞ্চি তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করেছিলাম।

—কোনও গোপন কক্ষ খুঁজে পেলে না?

—একটাও না।

—বাস্তবিকই রহস্য। কিন্তু বলো তো সমরেশ, এত হইচই করেও লোকটাকে তুমি ধরতে পেরেছিলে কি? এই সব কথা ভেবে মাঝে-মাঝে আমিও আশ্চর্য হয়ে যাই।

উত্তর দেওয়ার আগে ক্ষণেকের জন্য প্রাক্তন গোয়েন্দাটি কী ভেবে নিলে। তারপর চাপাস্বরে বলে উঠল,—আর আমিও আশ্চর্য হয়ে যাই যখন ভাবি যে, ঠিক কোন জায়গাটিতে তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।

ডক্টরের ঘন ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে উঠল,—ধীরে, সমরেশ ধীরে। তুমি কী বলতে চাও? তার অন্তর্ধানের পেছনে আমার হাত ছিল? আর কীসের জন্যেই বা তা থাকতে যাবে?

তা আমি জানি না। সামনে ঝুঁকে পড়ে প্রায় ফিস-ফিস স্বরে সে বলে উঠল,—যদি না পরে দেখা যেত যে লোকটি আপনারই ভগ্নীপতি।

সহসা ডক্টরের কুঞ্চিত ভ্রূযুগল পুনরায় সরল হয়ে গেল। ভালো করে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি—খোলা জানালা দিয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে ধরলেন বাইরে; আগ্রহের সঙ্গে সমরেশ তাঁকে লক্ষ করতে লাগল। অবশেষে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি ম্লান হাসলেন,—আগাগোড়া তুমি একথা জান?

ঘাড় হেলিয়ে সমরেশ সম্মতি জানাল,—লোকটির আঙুলের ছাপ আমরা পরীক্ষা করেছিলাম। আমাদের কাছে সে পরিচিত ছিল হরিপদ ঘোষাল এই নামে। আসলে কিন্তু তার নাম ছিল গগনবিহারী চক্রবর্তী।

এবার ডক্টর প্রাণ খুলে হেসে উঠলেন,—কোথায় তাকে পাওয়া যাবে সে সন্ধান তুমি জানতে পারনি,—সেজন্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

আশ্চর্যের কিছু নেই? —সমরেশ নিজেই আশ্চর্য হয়ে যায়।

সে কথায় কর্ণপাত না করে ডক্টর শুধোলেন,—এই ব্যাপারটা নিয়ে তখন তুমি আমার সামনে আসোনি কেন বলো তো?

—কারণ এই সব কথা আপনাকে জানিয়ে আপনাকে অধিকতর সাবধান করে তুলতে চাইনি। পরিষ্কার দেখা গেল—শুধুচিহ্নের একটি মাত্র সারি আপনার সদর

দরজায় এসে শেষ হয়ে গেছে—অথচ আপনার কাছ থেকে আশাজনক কোনও সংবাদই পাওয়া গেল না। মনে হল, আপনিই লোকটিকে কোথাও লুকিয়ে রেখেছেন। শেষকালে মনে-মনে ভেবে দেখলাম, খানাতল্লাশির প্রথম পর্ব যখন ঝিমিয়ে আসবে, তখন আপনি আর অনর্থক দেরি না করে তৎক্ষণাৎ লোকটিকে গ্রামের বাইরে পাচার করবার ব্যবস্থা করবেন। সেইজন্যে আমি কোনও কথা আপনাকে বললাম না বটে, কিন্তু দিবারাত্র আপনার বাড়ির চতুর্দিকে কড়া প্রহরা বসালাম। কিন্তু সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে গেল—মাসের পর মাস গেল চলে—লোকটার কোনও চিহ্নই দেখা গেল না। শেষকালে আমাকে পরাজয় স্বীকার করতে হল। লোকটাকে ধরবার জন্যে যে আয়োজন আমি করেছিলাম—তার বেশি কিছু করাও আমার অতীত ছিল।

ধীরে-ধীরে বৈজ্ঞানিক বললেন,—তার অন্তর্ধানে আমি সাহায্য করেছি, এই অপরাধে তুমি আমাকে গ্রেপ্তার করতে পার।

—কিন্তু কী প্রমাণে?

—হুম। সমস্যা বটে! আর তবুও কিনা তুমি বিশ্বাস করো গগনের অন্তর্ধানে আমার বিলক্ষণ হাত আছে?

দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে বলে সমরেশ,—মাপ করবেন, স্যার। আমি তা বিশ্বাস করি।

—সেবারও আমি বলেছিলাম যে, লোকটা যে পথে এসেছে, সেই পথেই আবার বরফের ভেতর ফিরে যেতে পারে—তারপর সুযোগ মতো কোনও গাছের আড়ালে—

—না, স্যার। তা অসম্ভব। দরজার একেবারে নিকটেই পদচিহ্ন আমরা পরীক্ষা করেছি; পশ্চাদবর্তী কোনও পায়ের ছাপ আমরা পাইনি। এমনকী অন্য কোনও দিকেও বাড়ি থেকে কোনও পায়ের ছাপ বেরিয়ে যায়নি। সারাক্ষণ গগন যে বাড়ির ভেতরেই ছিল, এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

উভয়ের মধ্যে নেমে এল গভীর নৈঃশব্দ—দুজনেই ডুবে গেছে আপন-আপন চিন্তা প্রবাহে। বিশবছর আগেকার সেই পরাজয় সমরেশের স্মৃতিতে এঁকে গেছে এমন এক যন্ত্রণাদায়ক চিহ্ন—যে এই সুদীর্ঘ কালেও বহুবার বহুভাবে ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে নি। উপরন্তু এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করা তার একটা বাতিকে দাঁড়িয়ে গেছে। সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে যে, এই অদ্ভুত অন্তর্ধান-রহস্যের একটা সমাধান নিশ্চয় আছে—কিন্তু তবুও সে কোনও সমাধানেরই হদিশ পায়নি। আর ডক্টর চ্যাটার্জি ভাবছিলেন, সেই রাতের কথা—যখন গগন চক্রবর্তী তাঁর দরজায় টোকা মারলে।

চিরাচরিত ভাবেই গগন পড়েছিল বিপদে আর অন্যান্য বারের মতোই সে সাহায্যের জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। প্রথম চোটটায় ডক্টর তাকে কোনও সাহায্যই করতে রাজি হলেন না। কেননা, অতীতে বহুবার এইরকম ভাবেই সে সাহায্য প্রার্থনা করেছে আর প্রতিবারই বলেছে, আর না, এই শেষ। কিন্তু তাঁর জেদ রইল না। এমন শোচনীয় অবস্থায় গগন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইল যে, শেষকালে তিনি

তাকে শুধু রাতের মতো আশ্রয় দিতে স্বীকৃত হলেন। তারপর ক্রমে-ক্রমে গগনের মুখে তিনি শুনলেন, কেমন করে গগনের একজন অপকর্মের সহচর দুজনের মিলিত অর্থ নিয়ে সরে পড়েছিল, কেমন করে গগন তাকে পাকড়াও করে এবং নিজেকে বাঁচানোর জন্যে রিভলবার চালাতে বাধ্য হয়...

শেষ অবধি গগনের কী হল, সে কথা যদি জিগ্যেস করি তাহলে কি সেটা অযৌক্তিক হবে? —সমরেশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে।

আচমকা ডক্টর অতীত স্মৃতি থেকে গড়িয়ে পড়লেন বর্তমানে। একটু ইতস্তত করলেন—না, সমরেশ, অযৌক্তিক হবে না। কিন্তু—কতকগুলো অসুবিধা—

—অসুবিধা?

—বিশ্বাস করো সমরেশ। যথেষ্ট, যথেষ্ট অসুবিধা আছে।

—কিন্তু—

ঠিক আছে, ঠিক আছে,—রুক্ষভাবে সহসা বৈজ্ঞানিক বাধা দিলেন, তুমি জিগ্যেস করলে গগনের শেষ অবধি কী হয়েছিল? তাই না? বেশ, আমার উত্তর—আমি জানি না।

যুগপৎ সন্দিগ্ধতা আর অবিশ্বাস সমরেশের মুখের রেখায়-রেখায় ফুটে উঠল, —আপনি জানেন না? একটু থেমে আবার বলে, কিন্তু আপনি কি—

—হাঁ, হাঁ, আমিই তাকে সাহায্য করেছিলাম। সে আমার কাছে এসে টাকা চাইলে সাহায্যস্বরূপ—অনেক টাকা—আমি সোজা প্রত্যাখ্যান করলাম। কিন্তু তার কাছে আমি এক প্রস্তাব করলাম। আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম, যদি সে একটা কাজ করতে পারে, তাহলে একই সঙ্গে আমার গবেষণা কার্যেও সাহায্য করবে এবং তার দুষ্কর্মজনিত পরিণামের হাত থেকেও রেহাই পেয়ে যাবে। কিন্তু এ কাজে যে বিপদটুকু ছিল—তা আমি তাকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলাম। প্রথমটা সে আমার প্রস্তাবে রাজি হল না। কিন্তু তার পরিস্থিতি এমন শোচনীয় হয়ে উঠেছিল যে, শেষ অবধি সে এই সুযোগ গ্রহণ করাই স্থির করলে।

রীতিমতো অনুসন্ধিৎসু হয়ে সমরেশ শুধোয়,—সে এক্সপেরিমেন্টটা কী জাতীয়?

—সেটা এমন একটা কিছু যা নিয়ে আমি আলোচনা করা পছন্দ করি না।

নিরাশা আর ব্যর্থতার অভিব্যক্তিস্বরূপ প্রচণ্ড বিরক্তি সমরেশের মুখে উঠল পরিস্ফুট হয়ে। তার মুখভাব এমনই হয়ে উঠল যে, আসন্ন প্রশ্ন-বন্যা এড়াবার জন্যে ডক্টর তৎপর হয়ে উঠলেন।

—আমার গবেষণা আর আমার সম্বন্ধে বলো তো সমরেশ তুমি কী জানো?

—খুব বেশি নয়। এইটুকুই জানি যে পদার্থবিদরূপে আপনি খ্যাতিমান হয়েছেন আর বিজ্ঞানের এই অংশটিতে আপনার অকল্পনীয় নিতান্ত রুদ্ধদ্বার কী সব-এর আবিষ্কার আপনি করেছেন—সে সব না জেনে জানার ভান আমি করতে চাই না। আমায় আপনি বুঝিয়ে দিন অনুগ্রহ করে—

—বেশ, বেশ, সেটা মন্দ হবে না। কিন্তু সমরেশ তাহলে তো তোমায় একটা বড় রকমের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে। কেন জানো? আমার অধিকাংশ এক্সপেরিমেন্ট কেবলমাত্র দুরূহ গাণিতিক সূত্রের সাহায্য ছাড়া বোঝানো যায় না।

সমরেশ একটু দমে গেল। কিন্তু সে চটপট জবাব দিলে,—কিন্তু স্যার, গগনের অন্তর্ধানের সঙ্গে এসবের কী সম্পর্ক বলুন তো?

—আছে সমরেশ, আছে।

মরিয়া হয়ে নাছোড়বান্দার মতো সে বলে ওঠে,—বেশ, আপনি বলুন, আমি বুঝতে চেষ্টা করব।

ডক্টর চ্যাটার্জি আনমনা হয়ে পড়লেন। অবশেষে তিনি বললেন,—শোন সমরেশ, আমার শর্ত শোনো। আমি তোমাকে যা দেখাব, সে সম্বন্ধে একটি অক্ষরও তুমি ভবিষ্যতে কাউকে বলতে পারবে না। এই শর্তে যদি রাজি হও তাহলে বলো—আমি তোমায় হাতেনাতে দেখিয়ে দেব বেচারি গগনের অদৃষ্টে কী ঘটেছে।

—আমি কথা দিলাম, ডক্টর।

—বেশ, বেশ, তাহলে তোমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে। ধরো পরের হপ্তায় যে-কোনও একটি দিন?

—কালকে দেখাতে পারেন না স্যার?

—অসম্ভব। এখন সোজা আমি মুম্বাই যাচ্ছি; সেখানকার কাজ শেষ করে বাড়ি ফিরতে আমার দিন সাতেক লাগবে। পরের সপ্তাহে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়, কী বলো?

তারপর একদিন ডিটেকটিভ-ইনস্পেক্টর সমরেশ ঘোষালকে দেখা গেল দার্জিলিংয়ের এক পল্লী-গৃহে,—যে গৃহে বিশবছর আগে তার সমস্ত অনুসন্ধান, বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞতা ব্যর্থতার কালিমায় কলঙ্কিত হয়ে গেছিল। জায়গাটা খুব অল্পই পালটেছে। বহুদিন আগেকার বহু স্মৃতি তার মনে ভিড় করে এল। তার চোখের সামনে যেন আবার ফুটে উঠল সেই দৃশ্য—বরফের ওপর পদচিহ্নের একটি মাত্র সারি এসে শেষ হয়েছে সদর দরজার সামনে...বাস্তবিকই এখনও সে কল্পনা করে উঠতে পারে না, কোন পথে আসামীটি বাড়ির ভেতর থেকে সরে পড়ল। অথচ পলায়নের কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি। ডক্টর তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সমস্ত ব্যাপারটাই তাকে দেখাবেন। সুতরাং নিজের চক্ষু-কর্ণকে কাজে লাগিয়ে সে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবে...

এই হল আমার মূল ল্যাবরেটরি,—সমরেশের তন্ময়তা ভঙ্গ হল ডাক্তারের কণ্ঠস্বরে, সে এক্সপেরিমেন্টটা এইখানেই হয়েছিল।

চকিতে সমরেশ চতুর্দিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে নতুন কিছু দেখবার আশায়। কিন্তু বহুবছর আগে যে সব সরঞ্জাম সে দেখে গেছিল, সে সব ছাড়া নতুন কিছুই সে দেখতে পেলে না। শুধু ল্যাবরেটরি আর সংলগ্ন ছোটোখাটো কারখানাটাই বাড়ির প্রায় তিন চতুর্থাংশ জমি জুড়ে বিস্তৃত। ল্যাবরেটরির ভিতরে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি

দেখি, বহু জটিল বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামাদি আর নানারকমের অজস্র বোতল। কত হাজার বোতলের যে সমাবেশ হয়েছে ঘরটিতে, তার হিসাব নেই।

সর্বশেষে তার অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিবদ্ধ হল ঘরের শেষ-প্রান্তে দেওয়ালের গা ঘেঁসে দাঁড় করানো এক অদ্ভুত-গঠন যন্ত্রের ওপর। মনে পড়ে গেল, বিশবছর আগেও যন্ত্রটা হুবহু একই স্থানে দাঁড় করানো ছিল। যন্ত্রটাকে সে ভালোভাবে পরীক্ষা করে গেছিল, কিন্তু বোধগম্য হয়নি যন্ত্রটির ব্যবহার কী। বাইরে থেকে দেখতে, একটা চওড়া কাচের নল, ফুট-তিনেক ব্যাস, আর প্রায় ছফুট উঁচু। পাথরের একটা নিচু বেদির ওপর নলটিকে খাড়া ভাবে বসানো হয়েছে, ওপর দিকের প্রান্তটির মুখে বসানো রয়েছে একটা বিরাট তামার গোলক—চকচকে তামার গা থেকে ঠেলে-ঠেলে বেরিয়ে এসেছে পোর্সিলেন ইনসিউলেটরের অজস্র, আর অসংখ্য বৈদ্যুতিক তারের গোলকধাঁধায় সমস্ত গোলকটাই প্রায় ঢেকে গেছে। বৈজ্ঞানিকের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে ধরতেই তিনি সম্মতিসূচক ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন।

—এইটাই, সমরেশ। বেশ ভালো করে দেখে নাও—এই অবসরে আমি আমাদের শিকারটিকে খুঁজে আনি।

যন্ত্রটির কাছে সমরেশ এগিয়ে এল। কিন্তু আশার বিশেষ সঞ্চার হল না। পূর্বেও এই অদ্ভুতদর্শন যন্ত্রটা তার কাছে থেকে গিয়েছিল এক রহস্য—এখনও এটা রহস্যই রইল। একবার ভাবলে যে, এটা বোধ হয় কোনও বৈদ্যুতিক যন্ত্র হবে—কিন্তু গগনকে যে কীভাবে গোপন করা হয়েছিল...। সে মাথা তুললে। কান পেতে শুনতে লাগল। মনে হল যেন কুকুরের ডাক তার কানে ভেসে আসছে। না, এ তার ভ্রম নয়। এক মুহূর্ত পরেই শব্দটার পুনরাবৃত্তি হল—এবারে আগের চেয়েও জোরে। এর পরেই পুনরায় দেখা গেল ডক্টর চ্যাটার্জিকে—পেছনে শেকলে বেঁধে আনছেন এক অতিকায়, ভীষণ-দর্শন প্রাণীকে।

আপনি কি ওকে কষ্ট দেবেন নাকি? —উদ্বিগ্নস্বরে সমরেশ বলে ওঠে; সে কুকুর বড় ভালোবাসে।

আমার তো তা মনে হয় না।—সংক্ষেপে পদার্থবিদ উত্তর দেন।

জন্তুটাকে তিনি যন্ত্রটির পাদদেশে নিয়ে এলেন, তারপর একটা সুইচ টিপে দিলেন। নলটির স্বচ্ছ কাচের আবরণ দুভাগ হয়ে খুলে গেল—দুটো অর্ধবৃত্তাকার প্রকোষ্ঠ যন্ত্রটির দুটি প্রান্তে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন। অতি সাবধানে ডক্টর কুকুরটাকে যন্ত্রের ভেতর রাখলেন, শিকলটা খুলে নিলেন। তারপরে দ্বিতীয় একটি সুইচ স্পর্শ করামাত্র নলটির দ্বিধাবিভক্ত কাচের আবরণ পুনরায় একত্র হয়ে গেল—আর কাচের কারাগারে বন্দি হয়ে গেল কুকুরটা। কুকুরটার সে কী ভীষণ চিৎকার—উন্মাদের মতো মুক্তির জন্যে লাফাচ্ছে, আঁচড়াচ্ছে আর পড়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে কি আপনি একেবারেই নিশ্চিত যে—সংশয়ের সুরে সমরেশ বলতে-বলতে এগোল।

খুব কাছ থেকে কুকুরটাকে লক্ষ করো। —কথা বলতে-বলতে পদার্থবিদ আর একটি সুইচ টিপে দিলেন। যন্ত্রটির অভ্যন্তর থেকে ভেসে এল মৃদু গুঞ্জনধ্বনি। আর তার সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেল নলটির একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে লম্বালম্বিভাবে আবির্ভাব হয়েছে একটা উজ্জ্বল নীল আলোর। ক্রমে-ক্রমে গুঞ্জন-ধ্বনির তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে লাগল আর সর্বক্ষণ কুকুরটা চেঁচাতে লাগল, লাফাতে লাগল। ধীরে-ধীরে গুঞ্জনধ্বনি রূপান্তরিত হল তীক্ষ্ণ আর্ত-ধ্বনিতে—শেষকালে প্রায় অশ্রুত হয়ে এল। তবুও কুকুরটা আঁচড়াচ্ছে, লাফাচ্ছে আর চিৎকার করছে।

তখনও পর্যন্ত সমরেশের ছিল সন্দেহ, কিন্তু এরপর সে লক্ষ করলে এক অদ্ভুত ব্যাপার। কুকুরটার আকৃতি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে, যেন শূন্যের ভেতর প্রাণীটি গলে মিশে যাচ্ছে। চোখদুটি সে ভালো করে রগড়ে নিলে। কিন্তু না, এ তো চক্ষুর ভ্রম নয়। ধীরে-ধীরে স্থূলদেহের স্থলে অস্পষ্ট এক আকৃতি ছাড়া আর কিছুই রইল না। —ভৌতিক একটা ছায়া-আকৃতি—আগের মতোই ক্রমাগত লাফিয়ে উঠছে আর পড়ে যাচ্ছে। আবার লাফিয়ে উঠছে। আর তারপর, কুকুরটার ডাকও ক্রমশ মিলিয়ে যেতে লাগল। চক্ষুকর্ণকে সে সজাগ করে তুললে—এখন সে প্রাণীটির সামান্যতম চিহ্নও দেখতে পেলে না, কিন্তু মনে হল বহুদূর থেকে ভেসে আসছে ক্ষীণ একটা গুঞ্জনধ্বনি। তারপরে তাও মিলিয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে শূন্য নলটির পানে তাকিয়ে রইল বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে—ভেতরে নীল আলোটা তখনও লাফিয়ে উঠছে।...

মোহভঙ্গ হল একটা সুইচ টেপার শব্দে—সহসা ডক্টর বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দিলেন। তারপর আবার সুইচ টিপে ধরতেই স্বচ্ছ আবরণ দু'ভাগ হয়ে গেল।

আচম্বিতে সমরেশ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলে—লাফিয়ে পড়ল সামনে, ফাঁকটার ভেতর দিয়ে দুই হাত গলিয়ে একটা কিছু হাতড়াতে লাগল—যা দেখতে তার চক্ষু-কর্ণ অসমর্থ। কিন্তু নলটা একেবারেই শূন্য—ভেতরে কোনও জীবের অস্তিত্ব নেই। কুকুরটা বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

বিদ্যুৎবেগে সমরেশ ঘুরে দাঁড়াল। এর মানে কী? —হাঁপাতে-হাঁপাতে সে শুধোয়।

ডক্টর চ্যাটার্জির ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি ফুটে ওঠে,—সমরেশ, আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম শুধু হাতে-নাতে দেখিয়ে দেব হতভাগ্য গগনের অদৃষ্টে কী ঘটেছে—কোনওরকম ব্যাখ্যা দেবার প্রতিশ্রুতি দিইনি।

—কিন্তু আপনি আমায় এ অবস্থায় রেখে দিতে পারেন না—এ যে আমি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছি না। কী এই নারকীয় যন্ত্রটা! এর কাজই বা কী?

—দেখছি তোমার এখন কয়েক চুমুক ব্র্যান্ডির প্রয়োজন হয়েছে। চলো লাইব্রেরি ঘরে যাওয়া যাক।

লাইব্রেরি পৌঁছে সমরেশ কয়েক চুমুক ব্র্যান্ডি উদরস্থ করে প্রকৃতিস্থ হল।

—গগন ঠিক ওই কুকুরটার মতোই অদৃশ্য হয়ে গেছে এই কথাই কি আপনি আমায় বলতে চান ডক্টর চ্যাটার্জি? সেই ঘটনার পর থেকে কি আপনি আর তাকে দেখেননি বা তার সম্বন্ধে কোনও কথাই আর শুনতে পাননি?

মাথা হেলিয়ে বৈজ্ঞানিক সায় দিলেন,—ভগবান তার সহায় হোন, আর আমায় ক্ষমা করুন। বিচলিত স্বরে বিড়-বিড় করে ওঠেন।

—কিন্তু আপনি তো আবার এ সমস্ত পদ্ধতিটাই বিপরীত দিক থেকে শুরু করে তাকে আবার ফিরিয়ে আনতে পারেন।

—হা ভগবান! যে কথা তুমি এখন বললে,—গত বিশবছরে সেইটা নিয়েই আমি পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে আসছি। কিন্তু কোনও লাভই হয়নি। যতবার চেষ্টা করেছি, ততবারই বিফল হয়েছি—ক্রমাগত ব্যর্থতা ছাড়া আমার লাভের খাতায় আর কিছুই জমা পড়েনি। বিশবছর ধরে প্রতিটি দিন আমি অবিরাম এই প্রচেষ্টাই করে এসেছি। সময়...। আবেগবশে তিনি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন,—ভগবানের কাছে এই প্রার্থনাই করি যেন আর কোনওদিন সময় নিয়ে খেলা করবার সুযোগ তিনি আমায় না দেন।

সময়ের সঙ্গে খেলা? —সমরেশের বিমূঢ়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল।

—হ্যাঁ, সময়—নিছক সময়—কালস্রোত। সময় সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা সমরেশ? সময় বলতে আমার মনে হয় তুমি বোঝো নিছক শুধু মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাসের এলোমেলো অর্থহীন সমষ্টি? সময়কে তুমি নিশ্চয়ই আলোক-বর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করো না? অথবা মহাজাগতিক রশ্মির কম্পন নিয়ে সময় কথার চিন্তাও তোমার মনে নিশ্চয় কখনও উদয় হয়নি?

পূর্বতন পুলিশ কর্মচারীটির বিস্ফারিত চক্ষু দুটি গোলাকার ধারণ করল,—সময় সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। স্বীকার করে সে,—শুধু জানি যে, স্রোতের মতো সময় বয়ে চলেছে।

—প্রবাহ—সমরেশ, প্রবাহ। কল্পনার চোখে দেখো—বিপুলাকার গতি এই প্রবাহ, অসীমতার ব্যাপ্তি, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপী তার প্রসারতা—অনন্তকাল ধরে সে বয়ে চলেছে। কিন্তু কোন দিকে? তা জানি না। কিন্তু সে প্রবাহিত হয়ে চলেছে—বিরামবিহীন, মসৃণ তার গতি। আর এই প্রবাহের গতিবেগে আমরা গা ঢেলে ভেসে চলেছি—তুমি, আমি, আর আমাদের মতো লক্ষ-লক্ষ মানুষ। আমরা যখন কল্পনা করি যে আমরাই আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা—আর আমাদের চাহিদানুযায়ী ঘটনার রূপ দিই নিজেরাই—তখন পরম পরিতুষ্ট হই। কিন্তু সমরেশ, ঘটনা আমাদের জীবনস্রোতে ভেসে আসছে না—ঘটনারই স্রোতে আমাদের জীবন ভেসে চলেছে। একটি ঘটনার [illegible] সঞ্চয়ন সম্পূর্ণ হবার পর মনুষ্য সমাজ ভেসে যাচ্ছে ঠিক পরবর্তী ঘটনাটির দিকে—আপনা হতেই।

একটু দম নিলেন ডক্টর। তারপর আবার ধীরে-ধীরে বলতে লাগলেন,—তোমার

খুব আশ্চর্য লাগছে এসব কথা, তাই নয় সমরেশ। এই জিনিসটার অনেক সুনিশ্চিত গাণিতিক সমাধান আছে—কিন্তু সে সবের বিন্দুবিসর্গ তুমি বুঝবে না। আর ওই যন্ত্রটার ব্যবহার তুমি তো নিজেই দেখলে—উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ওটাকে আমি তৈরি করেছিলাম বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে—অনন্ত কাল-প্রবাহের মসৃণ সমতল পৃষ্ঠে ছোট্ট একটি আলোড়ন সৃষ্টি করবার জন্যে, ছোট্ট একটি তরঙ্গও বলতে পার। আমার সিদ্ধান্ত যদি নির্ভুল হয়, তবে এই ক্ষুদ্র আলোড়ন যন্ত্রটার অতি সন্নিকটে একটা অসমকালীন প্রভাবের সৃষ্টি করবে। অন্যভাবে বললে, বর্তমান ঘটনাবলি থেকে ওই বস্তুটা যাবে সরে, পরিণামে—যে ঘটনা অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে, সেই ঘটনারই আবর্তে আবার পড়ে যাবে, অথবা যে ঘটনা ভবিষ্যতের অন্ধকারে অপেক্ষমান—তারই সম্মুখীন হবে। যে ভাবেই হোক, বর্তমান থেকে সে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে, কোনও চিহ্নই রেখে যাবে না। আমার কথা বুঝছ তো?

—আবছাভাবে। পরিপূর্ণ আগ্রহ নিয়ে সমরেশ বলে, কিন্তু আপনি থামবেন না, বলে যান।

—এই ছিল আমার সিদ্ধান্ত। আর আমার সিদ্ধান্ত যদি নির্ভুল হয়, তবে পুনরায় সমতুল্য, কিন্তু বিপরীত একটা আলোড়নের সৃষ্টি করে আমি সমকালীনত্ব প্রভাবের সৃষ্টি করতে পারব। যখন গগনকে এই এক্সপেরিমেন্টে অংশগ্রহণ করতে প্ররোচিত করি, তখন এই সিদ্ধান্তই আমার মনে ছিল। যদিও সে সময় পর্যন্ত যত প্রাণী আমি অদৃশ্য করে দিয়েছি, তাদের কোনওটাকেই পুনরায় দৃশ্যমান করে তুলতে পারিনি—তবুও আমার বিশ্বাস ছিল যে, তাদের ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এই জন্যে কিছু গণনার দরকার, আর যন্ত্রটাকেও প্রয়োজনানুসারে কিছু অদলবদল করে নেওয়া দরকার। এ সবই আমি আমার ভগ্নীপতিকে বুঝিয়ে বললাম—অবশেষে সে এই সুযোগ গ্রহণ করতে রাজি হল।

—কিন্তু ভুলটা কোথায় হল?

—আমি একেবারে নিশ্চিত নয়, সমরেশ। তবুও আমার বিশ্বাস, কোনওরকম ভুলভ্রান্তির স্রোত সৃষ্টি করতে আমি অসমর্থ হয়েছি—সৃষ্টি যা হয়েছে তা ভাটার স্রোত। আর এই থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, গগন অতীতের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে—ভবিষ্যতে নয়। মনে হচ্ছে যন্ত্রটা বিপরীত স্রোতের সৃষ্টি করে। ছুটে চলে মূল স্রোতের উলটোদিকে—! পরিণামে কী হয় তা অনুমান করে নিতে পার। একটা চক্রাকার গতির সৃষ্টি হয় আর সৃষ্টি হয় একটি আবর্তের...

বৈজ্ঞানিকের স্বর খাদে নেমে এসে একেবারে ফিসফিসানিতে পরিণত হল,—যদিও এখন আমি বিশ্বাস করি যে যন্ত্রটার প্রভাব কাল-প্রবাহে একটা ছোট্ট ঘূর্ণিপাকের সৃষ্টি করে—তাহলে গত বিশবছর ধরে গগন চক্রাকার গতিতে—অনন্তকাল ধরে অবিরাম পুনরাবৃত্তি হয়ে চলবে একই ঘটনাবলির, আর উঁই চলছে গত বিশবছর ধরে। উঃ, কী ভয়ানক! সীমাহীন কাল ধরে তাকে এই বিভীষিকা সহ্য করে যেতে

হবে। কেননা, চলতি ঘটনাবলী থেকে সে এতদূরে চলে গেছে যে, তাকে বাঁচাবার আর কোনও ক্ষমতাই আমার নেই।

আচ্ছা, কী ধরনের ঘটনাবলির ভেতর দিয়ে সে পাক খেয়ে চলেছে বলে আপনার মনে হয়? —সমরেশের দৃষ্টিতে আতঙ্ক, তামাটে মুখ পাংশু হয়ে গেছে।

—এক্সপেরিমেন্টের ঠিক আগেই যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে, সেগুলোর ভেতর দিয়ে। হ্যাঁ, ঠিক তাই, এতে কোনও সন্দেহই নেই। তোমাদের চোখে ধুলো দিয়ে পলায়ন, তুষার-ঝটিকার সাথে সুদীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম, এই বাড়িতে তার আগমন আর এই যন্ত্রটিতে তার প্রবেশ। এই সমস্তই তাকে সহ্য করতে হবে—বারবার চিরকালের জন্য।

—কী কষ্ট! কী অদৃষ্ট!

—আর আমিই তাকে সেখানে পাঠিয়েছি। এর চাইতে তুমি যদি তাকে গ্রেপ্তার করতে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে—সেও হাজার গুণে ভালো ছিল।

—ফাঁসি দেওয়ার জন্যে? কী অপরাধে?

—কেন? তার সেই শয়তান অংশীদারটাকে হত্যা করবার অপরাধে? তুমি তাকে তো সেই জন্যেই খুঁজে বেড়াচ্ছিলে?

—কিন্তু সে লোকটা তো মারা যায়নি! গগনের রিভলবারের বুলেট শুধু তার মাথাটা আঁচড়ে দিয়ে যায়। তাইতেই ভয়ানক রক্তপাত হতে সে অর্ধ চৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। আমরা গগনকে খুঁজছিলাম কেবল জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। সেই ভয়ংকর তুষার-ঝড় যদি আরম্ভ না হতো, তাহলে তো আমরা তাকে ধরেই ফেলতাম...।

বিহঙ্গ বিভীষিকা

কী এক রহস্যময় কারণে খেপে গেছে পাখিরা। দল বেঁধে মানুষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা। পর-পর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে সুশৃঙ্খলভাবে!

রেহাই নেই শিশু, বুড়ো, মেয়েদের। নিষ্ঠুর, নির্মম, ভয়ংকর হত্যালীলায় মেতেছে নিরীহ পাখিরা। সারা পৃথিবীতে এই কাহিনি আলোড়ন তুলেছিল। দ্যাফ্নে দ্য মরিয়র-এর সেই রক্তজমানো 'দ্য বার্ডস'-এর এদেশি চেহারা।

শীত আসছে।

বিদায় নিচ্ছে হেমন্ত। শীতের শুকনো হাওয়া বিবর্ণ করে তুলছে পৃথিবীকে।

এই পাহাড়ি উপদ্বীপের ওপর পাখির ঝাঁক সব চাইতে বেশি দেখা যায় হেমন্তের মিঠে দিনগুলোয়। ঝাঁকে-ঝাঁকে নামে দ্বীপের ওপর। ঝাঁকে-ঝাঁকে ওড়ে আকাশে। কূজনে-গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে থাকে চারিদিক। নীল সমুদ্রের ওপর দিয়ে বহুদূরে ভেসে যায় খুশি-পাগল পাখিদের গানের সুর।

পাহাড়ের একপাশে চুপ করে বসে সেই গান শোনে বিকাশ। কাতারে-কাতারে পাখি দেখতে ওর বড় ভালো লাগে। পাশে একখানা খাবার।

বিকাশ দলুই একসময়ে মিলিটারিতে ছিল। এখন একটা মাসোহারা পায়। থাকে এই উপদ্বীপে। কাজ করে এখানকার খামারে। বেশি ঝক্কির কাজ নয়, কোনও-কোনওদিন একদম ছুটি। খামারের কর্তা বিকাশকে ভালোবাসেন। ইচ্ছে করেই হাল্কা

কাজ করান। গাধার খাটুনির জন্যে আছে অন্য লোক। টুকটাক কাজে বিকাশের জুড়ি নেই। ভাঙা বেড়া বাঁধতে, আল গড়তে ওর ভালো লাগে। এক মনে কাজ করে যায়। দিন গড়িয়ে গেলেও হুঁশ থাকে না। চমক ভাঙে পাখিদের কিচিরমিচিরে।

তখন ও মুখ তুলে চায়। হাতের কাজ সরিয়ে রেখে কোলে তুলে নেয় খাবারের থালা। মুখে গ্রাস তোলে আর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে-চেয়ে দেখে পাখির দলকে।

আজ যেন পাখিরা বড় অস্থির, বড় চঞ্চল। নীল আকাশের বুকে রঙিন পাখিরা যখন ডানা দুলিয়ে ভেসে যায়, তখন যে অপরূপ আলপনা ফুটে ওঠে নীলের পটভূমিকায় এবং পাল্টে যায় মুহুর্মুহু—আজ তো শান্ত সুন্দর সেই ছবি দেখা যাচ্ছে না। তবে কি ওরা রুক্ষ শীতের আভাস পেয়েছে? তাই এত উদ্বেগ? এত উৎকণ্ঠা?

খাওয়া শেষ করে মাঠের ওপর নেমে এল বিকাশ। সশব্দে ট্রাক্টর চালাচ্ছেন নন্দলাল। নন্দলাল কর্মকার। এই খামারের মালিক। উঁচুনিচু পাহাড়ি মাটিতে সোনা ফলাতে তিনি জানেন। নিজে খাটতে জানেন। পাঁচজনকে খাটাতেও জানেন।

গাছের চারা পুঁততে-পুঁততে বিকাশ দেখল, পাগলা পাখির দল গোল হয়ে ঘুরতে-ঘুরতে নিচের দিকে নামছে। একটু পরেই নেমে এলো ট্রাক্টরের ওপর। চকিতে ছেয়ে ফেলল পুরো যন্ত্রটাকে। দেখা গেল না নন্দলালকেও।

কিছুক্ষণ ডানা ঝাপটাঝাপটি আর হুটোপাটি করে আবার আকাশ অভিমুখে ধেয়ে গেল পাখিগুলো। কী যে ওদের মতিগতি, বোঝা ভার।

সন্ধে নামছে। আজকের মতো কাজ শেষ। ঘরের দিকে পা চালাল দুজনে।

যেতে-যেতে বললে বিকাশ,—পাখির সংখ্যা এবার অনেক বেশি মনে হচ্ছে।

তাই তো দেখছি,—বললেন নন্দলাল, শীত বোধহয় এবার জাঁকিয়ে পড়বে। পাখিরা তা টের পেয়েছে। তাই এত পাগলামি জুড়েছে।

অক্ষরে-অক্ষরে ফলে গেল নন্দলালের কথা। সেই রাতেই পাল্টে গেল হাওয়া।

রাত তখন একটা। ঘুম ভেঙে গেল বিকাশের। জোর হাওয়ার শব্দ ভেসে আসছে জানলা দিয়ে। শৈত্যরূপী দৈত্য যেন শেকল ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়েছে। নিচে বারান্দার জানলা দিয়ে হাওয়ার স্রোত ঢুকছে শোঁ-শোঁ শব্দে। নড়ছে ছাদের আলগা টালি। বাইরে মেতেছে সমুদ্র। ভালো করে গায়ে চাদর জড়িয়ে বউ-এর আরও কাছে সরে গেল বিকাশ।

ঠিক এই সময়ে খট্-খট্-ঠক্-ঠকাস্ আওয়াজ শোনা গেল জানলায়।

খাট থেকে নেমে এলো বিকাশ। খুলে দিল জানলা। সঙ্গে-সঙ্গে কী যেন একটা সাঁৎ করে চলে গেল হাতের ওপর দিয়ে। আঁচড়ে নিয়ে গেল আঙুল আর হাতের চামড়া। ডানা ঝাপটে উঠল একটা পাখি।

পরক্ষণেই উড়ে গেল সিঁড়ি-এর দিকে। বড় ঠান্ডাকাতুরে পাখি তো। শীতের প্রথম কামড়েই ঢুকে পড়েছে উষ্ণ ঘরে।

জানলা বন্ধ করে দিল বিকাশ। ফিরে এল খাটে। আঙুল আর হাতের চামড়া

কিন্তু জ্বলছে। মুখ নিতেই জিভে লাগল রক্তের স্বাদ। ভীতু পাখির চঞ্চুর ঠোক্কর। ধাবড়ে গিয়ে রক্ত বের করে দিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে।

কিন্তু আবার যে ঝড়মড় খটখটাস্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছে জানলায়! এবারে আরও জোরে, আরও ঘন-ঘন। শীতের রাতে এত আওয়াজে ঘুমনো যায়?

উঠে পড়ল বউ। বললে ঘুমজড়ানো গলায়,—কে ঠোকা মারছে জানলায়?

—পাখি।

—তাড়িয়ে দিয়ে এসো না। যত্তো আপদ!

উঠে গিয়ে জানলা খুলতে না খুলতেই এক দঙ্গল পাখি হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল বিকাশের মুখের ওপর। চেঁচিয়ে উঠে দু-হাত চালাতেই ঝটপট শব্দে জানলা দিয়েই উধাও হয়ে গেল নৈশ আততায়ীরা। দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিল বিকাশ। ছিটকিনি এঁটে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই...

পাশের ঘর থেকে ভেসে এল ভয়ের চিৎকার।

বিকাশের ছেলে আর মেয়ে ঘুমোয় ও ঘরে। চেঁচাচ্ছে তারাই। নিছক চেঁচানি নয়। ভয়ে ককিয়ে উঠছে।

ধড়মড় করে বউ উঠে বসেছে বিছানায়,—ওকী! ওকী! ওকী!

বিকাশ ততক্ষণে ছিটকে বেরিয়ে গেছে এ-ঘর থেকে। পাশের ঘরে ঝড়ের বেগে ঢুকতে না ঢুকতেই। চোখে-মুখে-গায়ে আছড়ে-আছড়ে পড়ল অনেকগুলো পাখার ঝাপটা। চক্ষের নিমেষে দেখে নিল বিকাশ জানলার কপাট একেবারে খোলা। ঝাঁকে-ঝাঁকে তীরবেগে পাখি ঢুকছে। দেওয়ালে, সিলিং-এ ধাক্কা খেয়েই ঠিকরে পড়ছে বিছানায়।

—কাঁদিসনি...কাঁদিসনি...এই তো আমি!

ঘরময় তখন ডানা ঝাপটানোর শোরগোল। বিকট চেঁচিয়ে চলেছে ছেলে আর মেয়ে। তাই গলার স্বর চড়িয়ে অভয় দিয়েছিল বিকাশ।

সেই আওয়াজ লক্ষ করেই খাট থেকে লাফিয়ে নেমে এল সোনা আর মণি। ছেলে আর মেয়ে। ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে দুজনেই। সবলে দুজনকে বুকে আঁকড়ে ধরল বিকাশ।

পাখিরাও নিশানা পালটে নিল তক্ষুনি। এতক্ষণ ঠিকরে-ঠিকরে পড়ছিল খাটের ওপর—এবার ঝাঁকে-ঝাঁকে তেড়ে এল বিকাশের দিকে।

এতটুকু সময়ও নষ্ট করল না বিকাশ। চোখের পলক ফেলবার আগেই সোনা আর মণিকে ঠেলে বের করে দিল ঘর থেকে। দড়াম করে টেনে বন্ধ করে দিল পাল্লা দুটো।

অন্ধকার ঘরে এখন সে একা।

না, একা নয়। ঝাপা পাখিরা ঠোকর মারছে চারদিক থেকে।

শুরু হল লড়াই। ঝট করে বিছানা থেকে চাদরটা টেনে নিয়েই ডাইনে বাঁয়ে

ওপরে নিতে ঘুরিয়ে গেল বিকাশ। বিরাম নেই পাখিদের আক্রমণের। তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে সজোরে ঠুকরে-ঠুকরে যাচ্ছে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শরীরের প্রতিটি জায়গা। চাদরের মার খেয়েও বেপরোয়া ওদের চেতনা হচ্ছে না। এবার দেখছি হাত দুটোকেই চালাতে হবে।

নিমেষে মাথায় চাদর জড়িয়ে নিলো বিকাশ। ঠিক পাগড়ির মতো। এবার চলল দুটো হাত। ঘুরিয়ে গেল বনবনিয়ে। দরজা খুলতেও সাহস হল না। তাহলেই যে পাগলা পাখির দল ওকে ছেঁকে ধরেই বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে।

কতক্ষণ যে উড়ুক্কু বিভীষিকাদের সঙ্গে এভাবে লড়ে গিয়েছিল, সে সময়জ্ঞান লোপ পেয়েছিল বিকাশের। ঠিক যেন ঘোরের মধ্যেই কেটে গিয়েছিল অনেকটা সময়। বিকাশ নিজেও বুঝি উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল বেশ কিছুক্ষণের জন্যে।

রাত যখন ফুরিয়ে আসছে, ভোরের আলো যখন একটু-একটু করে ফুটছে—তখন কমে এল পাখিদের হামলা। ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে গেল খোলা জানলা দিয়ে।

মুহ্যমান অবস্থাটা কাটিয়ে উঠল বিকাশ। বিস্ফারিত চোখ বুলিয়ে নিল ঘরময়।

না, জ্যান্ত পাখি আর নেই একটাও। ডানা ভাঙা, ঘাড় ভাঙা, প্রাণহীন আতঙ্করা স্তূপাকারে পড়ে আছে খাট আর মেঝের ওপর।

খাতস্থ হয়ে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল বিকাশ। হাওয়া এখন প্রচণ্ড ঠান্ডা। হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। হাওয়ায় দাপটে মাতলামি জুড়েছে বড়-বড় ঢেউ—ফেনা ছড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে সোনালি সৈকতের ওপর দিয়ে।

আকাশ-বাতাস নিথর নিস্তব্ধ। এবং অসীম শূন্যতা। পাখিদের চিহ্ন নেই ধারে, কাছে, দূরে। পলাতক প্রত্যেকেই!

জানলা আর দরজা বন্ধ করে দিল বিকাশ। টলতে-টলতে ফিরে এল নিজের ঘরে।

কাঠ হয়ে খাটে বসে আছে ওর বউ। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে কোটর থেকে। সারারাত ধরে অপার্থিব চিৎকার শুনেছে পাশের ঘরে। পাখিদের ডাক যে এমন রক্তজল করা হতে পারে—তা আগে জানত না। সেই সঙ্গে মিশেছিল বিকাশের অমানুষিক হুঙ্কার। এক সময়ে সৈন্যবিভাগে কাটিয়েছে সে—লড়াইও করেছে—কিন্তু না-মানুষদের সঙ্গে লড়াই এই প্রথম। তাই অজান্তেই চেঁচিয়ে গেছে অমানুষিক গলায়।

সোনা আর মণি কিন্তু ঘুমোচ্ছে অকাতরে। সোনার মুখে ব্যান্ডেজ বাঁধা। এইটুকু বাচ্চাকেও রেহাই দেয়নি শয়তান পাখি।

শরীর আর বইছে না বিকাশের। ধপ করে বসে পড়ল খাটের কিনারায়। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ। নিমির মুখেও কথা নেই। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছে বিকাশের দিকে। নিঃসীম আতঙ্কে কালো হয়ে গেছে মুখটা।

ভয় ভাঙানোর জন্যেই থেমে-থেমে বললে বিকাশ,—প্রায় পঞ্চাশটা পাখি ঢুকেছিল ঘরে। এত ঠান্ডা বাইরে—

হঠাৎ ঠান্ডা পড়ে গেল যে,—বললে স্ত্রী।

—হ্যাঁ। শীত এবার এল বড় তাড়াতাড়ি। ফের জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল বিকাশ। আকাশ সিসের মতো ধূসর। পাহাড়গুলো রহস্যময়। রাতারাতি সব কিছুর চেহারা পালটে দিয়েছে নির্মম শীত।

ঘুম ভেঙেছে সোনা আর মণির। সবাইকে নিয়ে নিচে নেমে এল বিকাশ। চা-জলখাবার তো তৈরি করতে হবে।

মেয়েকে কিন্তু আজ হাত ধরে বাসস্ট্যান্ডে নিয়ে গেল বিকাশ। অন্যদিন সোনা একলাই যায় স্কুলের বাস ধরতে। আজ আর তা হতে দিল না বিকাশ।

অথচ রাতের উপদ্রবের কথা সোনা ভুলে গেছে। বকর-বকর করছে পাখিদের নিয়ে। সবই শুনছে বিকাশ, কিন্তু হুঁশিয়ার চোখ দুটি ঘুরছে ঝোপেঝাড়ে—পাখিদের সন্ধানে। খেতের ওপারে ছোট্ট জঙ্গলটায় বিকট কোরাস জুড়েছে দাঁড়কাকের দল।

সোনাকে বাসে উঠিয়ে দিয়ে নন্দলালের বাড়ি গেল বিকাশ। আজ ওর ছুটির দিন। নন্দলালের স্ত্রীকে ও বউদি বলে ডাকে। একটু গল্প করে যাওয়া যাক।

বাড়িতেই ছিলেন ভদ্রমহিলা। বিকাশ বেড়ার ফটক খুলতেই নেমে এলেন দাওয়া থেকে। একটু ভারী চেহারা। ফর্সা। মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। চওড়া কপালে সিঁদুরের মস্ত টিপ।

—বিকাশ যে, গেছিলে কোথায়?

—মেয়েকে বাসে তুলে দিয়ে এলাম।

—হঠাৎ কী রকম ঠান্ডাটা পড়ে গেল দেখেছ? সাইবেরিয়ার হাওয়া নাকি! রেডিওতে বলছিল, ঠান্ডা নাকি আরও বাড়বে।

—তাই নাকি? রেডিও খোলবার সময় পেলাম কোথায়—যা ঝামেলা গেল কাল রাত্রে।

—কী ঝামেলা?

—পাখিদের বাঁদরামি।

—তার মানে?

খুলে বলল বিকাশ। শুনে কিন্তু বিশ্বাস হল না বউদির। বলেও ফেলল,—স্বপ্ন দেখোনি তো? পাখি কি এত বর্বর হতে পারে?

—গোটা পঞ্চাশেক পাখির সবই কি দুঃস্বপ্ন?

—সাইবেরিয়ার পাখি নয় তো?

—না...না...এ দেশের পাখি।

—যাই...কর্তা কাজে যাবে এক্ষুনি।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বিকাশের। বাড়ি এসে দেখল ছেলেকে পাশে বসিয়ে রান্নাঘরে কুটনো কুটছে বউ।

—কোথায় গিয়েছিলে?

—বউদির কাছে।

—কেন?

—কাল রাতের ব্যাপারটা বলতে।

—কী বললেন?

—বিশ্বাস করলেন বলে মনে হল না।

—না করলেন তো বয়ে গেল। তুমি মরা পাখিগুলোকে আগে সরাও। গা কীরকম করছে।

—ভয়ে?

—তা তো বটেই।

—মরা পাখিদের আবার ভয় কী?

—সে তুমি বুঝবে না।

সিঁড়ির তলায় খালি বস্তা পড়েছিল অনেকগুলো। একটা তুলে নিয়ে দোতলায় শোবার ঘরে এল বিকাশ। নানা রকমের, নানা রঙের পাখি ছড়িয়ে আছে ঘরময়। থলির মধ্যে ভরতে-ভরতে দেখে নিল বিকাশ—অন্য দেশের পাখি কেউ নয়। এতদিন দিব্যি শান্তশিষ্ট ছিল। হঠাৎ খেপে গেছে শীতের কামড় খেতেই।

থলি ঘাড়ে করে চলে এল সমুদ্রের ধারে। বালি খুঁড়ে থলি উপুড় করতেই দমকা বাতাসে মরা পাখিগুলো ছিটকে গেল সমুদ্রের জলে। ঢেউয়ের ধাক্কায় ভেসে গেল দূর হতে দূরে।

গুরুগম্ভীর গর্জন শোনা গেল দূরে। জোয়ারের আওয়াজ নাকি?

না দলে-দলে ধেয়ে আসছে সমুদ্র-শকুনের ঝাঁক।

বাড়ি ফিরে এল বিকাশ। ওর মন বলছে, কিছু একটা অঘটন ঘটতে চলেছে।

রেডিও খুলে বসেছিল বউ। মুখ বিবর্ণ।

বিকাশকে দেখেই বলে উঠল তড়বড়িয়ে,—শোনো—শোনো...কী সাংঘাতিক কাণ্ড...সারা দেশজুড়ে হামলা জুড়েছে পাখিরা...কলকাতাকেও বাদ দেয়নি।

বসে পড়ল বিকাশ।

—এ খবর শুনছেন আকাশবাণী কলকাতা থেকে। ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি নামছে সারা দেশে—কাজের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। কোথাও-কোথাও দল বেঁধে মানুষের ওপর চড়াও হচ্ছে। সবাই সাবধান। দরজা জানলা বন্ধ রাখবেন। বাচ্চাদের আগলে রাখবেন। ক্রমশ নৃশংস হয়ে উঠছে নিরীহ পাখির দল...

রেডিও বন্ধ করে দিল বিকাশ।

বলল বউকে,—এই ভয়টাই করছিলাম। এইমাত্র দেখে এলাম পালে-পালে সমুদ্র-শকুন তেড়ে আসছে।

—কোনদিকে?

জবাব না দিয়ে টেবিলের টানা খুলে হাতুড়ি, বাটালি, পেরেক বের করল বিকাশ। দোতলায় গিয়ে আগে পেরেক ঠুকে বন্ধ করল শোবার ঘরের জানলাগুলো।

পেছন থেকে বলল বউ,—তুমি কি পাগল হলে? পাখিরা কি জানলা ভেঙে ঢুকতে পারে?

জবাব দিল না বিকাশ। ওর মনের চোখে তখন ভাসছে সমুদ্র-শকুনদের চেহারা। এত সমুদ্র-শকুনকে একসঙ্গে সে কখনও দেখেনি।

দুপুরে রেডিও-খবরে শোনা গেল সেই একই ঘটনা। পাখিরা কলকাতা শহরকেও বিপর্যস্ত করে ছেড়েছে। আকাশ কালো করে ঝাঁকে-ঝাঁকে নামছে রাস্তায়। গাড়ি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার কাচের মধ্যে দিয়ে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে। ট্রাম-বাসে গাদা-গাদা পাখি ঢুকছে—ড্রাইভাররা ট্রাম-বাস ফেলে পালাচ্ছে, রিক্সার ছড়াছড়ি শহরের পথেঘাটে। বাড়িঘর কলকারখানায় শুধু পাখি আর পাখি। এমন অবাক কাণ্ড কলকাতার মানুষ কখনও দেখেনি।

রান্নাঘরে নেমে এল বিকাশ। পেরেক ঠুকে তক্তা লাগাতে লাগল জানলায়।

বউ বললে,—মিলিটারি নামানো দরকার।

বিকাশ বললে,—বাজার করতে হবে নাকি?

—না। আলু, পিঁয়াজ, শুকনো মাছ অনেক আছে। দিন কয়েক চলে যাবে। কেন?

—মোমবাতি?

—আজকের রাতটা চলে যাবে। হ্যাঁগো, কী ভাবছ?

বিকাশ যা ভাবছে, তা মুখে বলা যায় না। তাই সুট করে বেরিয়ে এল পেছনের বাগানে।

সূর্য কোথায়? অথচ ঘড়িতে এখন সবে তিনটে। আকাশ কালচে মেরে গেছে। চারদিক থমথম করছে। একটানা গজরে চলেছে সমুদ্র। জোয়ার এল বোধহয়।

মুহ্যমানের মতো বিকাশ হেঁটে গেল সমুদ্রের দিকে। দেখতে পেল সমুদ্র-শকুনদের।

কালান্তক মেঘের মতো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

দেখেই রক্ত হিম হয়ে গেল বিকাশের। দৌড়ে ফিরে এল বাড়িতে। ডাক দিল বউকে,—দরজা জানলা সব বন্ধ করে দাও। ছেলেটাকে ভেতরে রাখো—আমি যাচ্ছি মেয়েকে আনতে।

বলেই কোণ থেকে কোদালটা তুলে নিয়ে দৌড়ল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। রাস্তা থেকেই সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্র-শকুনরা আরও ছড়িয়ে পড়ছে। ঠান্ডা কনকনে হাওয়ার ঝাপটাকে ভ্রূক্ষেপ করছে না। ঠিক যেন উড়ুক্কু প্রাণীর ফৌজ।

পাহাড়ের ওদিক থেকে একটা মেঘ উঠে এল আকাশে। উপদ্বীপ ছাড়িয়ে ভেসে গেল শহরের দিকে।

এ সময়ে মেঘ! ঝড়-বৃষ্টিও হবে নাকি?

ভুলটা ভাঙল পর মুহূর্তেই। মেঘ নয়। পাখির ঝাঁক। রঙবেরঙের হরেক সাইজের পাখি কাতারে-কাতারে উড়ে যাচ্ছে মেঘপুঞ্জের আকারে।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছতেই এসে গেল স্কুলের বাস। নেবে এল সোনা। বাবার হাতে কোদাল দেখে চোখ বড়-বড় করে বললে,—এ কী! কোদাল এনেছ কেন?

জবাব না দিয়ে বিকাশ বললে,—পারবি আমার সঙ্গে দৌড়তে?

খিলখিল করে হেসে ওঠে সোনা,—দেখোই না।

দৌড়! দৌড়! দৌড়! কিছুক্ষণ পরেই অবশ্য হাঁপিয়ে গেল সোনা।

আর ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল সমুদ্র-শকুনদের...ঝাঁকে-ঝাঁকে নামছে রাস্তার ওপর। কদাকার কুটিল সেই আকৃতি দেখে কেঁদে ফেলে সোনা,—ও বাবা! ঠুকরে দেবে যে!

কাল রাতের অভিজ্ঞতা এবার মনে পড়েছে। এ রকম করাল আকৃতি রাতের অন্ধকারে দেখা যায়নি। শুধু কঠিন চঞ্চুর নির্মম ঠোকরেই হাঁউমাউ করে উঠেছিল।

এবার দেখেছে তাদের চাহিতেও কুৎসিত নির্মম পাখিদের।

ঠিক এই সময়ে নন্দলালের জিপটা পেছন থেকে এসে ব্রেক কষল পাশে।

স্টিয়ারিং ধরে আছেন নন্দলাল। নিজে। মুখে বিদ্রূপের হাসি,—মেয়ে কাঁদছে কেন?

—পাখি দেখে। বললে বিকাশ।

—ও হ্যাঁ। কাল রাতে নাকি তোমার ঘরে ঢুকেছিল?

—হ্যাঁ। সোনাকে পৌঁছে দেবেন?

—নিশ্চয়। আয়, উঠে আয়। তুমিও এসো বিকাশ।

—আমি একটু দেখে যাই।

—কী?

—পাখি।

অট্টহাসি হেসে জিপ হাঁকিয়ে চলে গেলেন নন্দলাল। ডানা ঝাপটে রাস্তা ছেড়ে উঠে পড়ল সমুদ্র-শকুনের ঝাঁক। জিপ বেরিয়ে যেতেই ফের নেমে এল রাস্তায়।

ঠিক যে ওৎ পেতে রয়েছে বিকাশের জন্যে।

বুক গুরগুর করে ওঠে বিকাশের। রাস্তা ছেড়ে নেমে যায় গাছের তলার মধ্যে দিয়ে খেতের দিকে। সেখানেও রয়েছে কাতারে-কাতারে সমুদ্রশকুন। যেন একটি মাত্র সংকেতের প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে রয়েছে সবাই।

ফাঁকা জায়গায় আর নয়। গাছের তলা দিয়ে হাঁটতে থাকে বিকাশ। একটু বেশি হাঁটতে হচ্ছে যদিও—তা হোক।

শেষ গাছটার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। বাড়িটা দেখা যাচ্ছে! মাঝের ফাঁকা পথটা দৌড়ে চলে গেলেই হল। বিকট বিহঙ্গদের দেখা যাচ্ছে না ধারেকাছে।

কোদাল কাঁধে নিয়ে দৌড়ল বিকাশ। আর ঠিক তখনি কোথ-থেকে আবির্ভূত হল একটা সমুদ্র-শকুন। মূর্তিমান শয়তান যেন। সোজা গোঁৎ খেয়ে নেমে এল বিকাশের দিকে।

কোদাল ফেলে দিল বিকাশ। উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়চ্ছে বাড়ির দরজা লক্ষ করে।

আরও পাঁচ-ছটা সমুদ্র-শকুন দেখা দিয়েছে। বুলেটের গতিবেগে ধেয়ে আসছে ওর দিকে।

এঁকেবেঁকে ঠোক্কর বাঁচিয়ে দৌড়ল বিকাশ। লক্ষ্যভ্রষ্ট সমুদ্র-শকুনরা সজোরে আছড়ে পড়ছে পাথুরে জমিতে—ঘাড় ভেঙে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তবুও তারা আসছে...আসছে...আসছে।

দরজা এসে গেছে। দমাদম লাথি ঘুষি চালিয়ে গেল বিকাশ—খোলো...খোলো...দরজা খোলো!

ঘাড় ফিরিয়েই দেখল আর-একটা উড়ন্ত বিভীষিকা। খুনে পাখি নেমে আসছে রকেট বেগে ঠিক ওর দিকেই। দুটো পাখই মুড়ে নিয়েছে।

সেই মুহূর্তে পাল্লা খুলে যেতেই হুড়মুড়িয়ে ভেতরে ছিটকে গেল। পাল্লা বন্ধ হল চক্ষের নিমেষে। বন্ধ কপাটে যেন আছড়ে পড়ল একটা পাথর।

বিকাশ ঘুরে দাঁড়াল বউ-এর দিকে। মুখ ওর নিরক্ত। সারা শরীর রক্তাক্ত। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে বউ।

প্রতিটা জানলায় পাখিদের ঝটপটানি শোনা গেল পরমুহূর্তেই। আঁচড়াচ্ছে, ঠোকরাচ্ছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে। দলে-দলে আছড়ে পড়ছে দরজায়। ভেঙেচুরে কামানের গোলার মতোই ঢুকে পড়তে চায় ঘরের মধ্যে।

এবার কেঁদে ওঠে ছেলে আর মেয়ে। বউ দৌড়ায় ওষুধপত্র আনতে। বিধ্বস্ত বিকাশকে দেখলেও কান্না পাচ্ছে।

দুমদাম ধপাস ধপ ঝটপট খড়মড় কড়মড় আওয়াজগুলো বিরামহীনভাবে হয়ে চলেছে জানলা আর দরজার ওপর। অসংখ্য সৈন্য যেন মুষল আর মুগুর নিয়ে হত্যা-লালসায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

এ কী উন্মাদনা ভর করেছে নিরীহ পাখিদের। সমস্ত শক্তি নিয়ে প্রচণ্ড গতিবেগে ধেয়ে এসে আছড়ে-আছড়ে পড়ছে জানলা দরজার কপাটে। ঘাড় মটকে থেঁৎলে ঠিকরে যাচ্ছে—পরমুহূর্তেই ধেয়ে এসে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে আর একজনের।

কাঁদছে ছেলে-মেয়ে-বউ।

ভয় কী,—বলে বিকাশ, জানলা-দরজায় পেরেক ঠুকে দিয়েছি—ভাঙতে পারবে না।

বলেই আর একবার হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে ঠকাঠক করে কপাট মজবুত করতে শুরু করে বিকাশ। জীবন্ত বোমারু বিমানগুলোকে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছে না। হাতুড়ির আওয়াজ আর পাখিদের কলরব মিলেমিশে অপার্থিব শব্দলহরীর সৃষ্টি

করে ঘরের মধ্যে। শিলাবৃষ্টির মতোই অজস্র পাখি আছড়ে পড়ছে বাড়ির ওপর... বাড়ির চারদিকে। অনর্গল পাখা ঝাপটানোর আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যেতে বসেছে।

বিকাশ নিজেও কি পাগল হতে বসেছে? চোখ দুটো গেঁড়ির চোখের মতো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে কোটরের মধ্যে থেকে। তিন লাফে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—হাতুড়ি আর পেরেক নিয়ে দৌড়ল দোতলায়...

হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে ফের দেখল শোবার ঘরের প্রত্যেকটা জানলা আর দরজা। পাগল পাখিদের ও যেন নিজেও বিশ্বাস করতে পারছে না। এইটুকু হাল্কা শরীর নিয়ে যেভাবে এক নাগাড়ে কপাট কাঁপিয়ে চলেছে—কতক্ষণ আর ঠেকিয়ে রাখবে?

সারা বাড়ি কাঁপছে থর-থর করে। দলে-দলে পাখি ধাক্কা মারছে আর মরছে...আবার ধেয়ে আসছে...আবার...

শোবার ঘরের লেপ-তোষক-বালিশ নিচের তলার রান্নাঘরে নামিয়ে আনল বিকাশ। —ও কী করছ। ব্যাকুল চোখে তাকায় বউ।

হাসবার চেষ্টা করে বিকাশ—রান্নাঘরে গ্যাসের উনুন জ্বালিয়ে ঘুমবো সারারাত। ঘরটা গরম থাকবে—ব্যাটারা আগুন দেখলেও ভয় পাবে।

—রান্নাঘরে ঘুমবে?

খাবার টেবিল আর চেয়ার সরাতে-সরাতে বিকাশ বললে—ক্ষতি কী? কাল রাতে ব্যাটারা বাল্ব জ্বালিয়েছে দোতলায়। —রেডিও খুলেছ?

—খুলছি।

নব ঘোরানোর সঙ্গে-সঙ্গে ভেসে এল ঘোষকের ভারী গলা : জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। পাখিরা হিংস্র হয়ে উঠেছে। দল বেঁধে চড়াও হচ্ছে মানুষের ওপর। বাড়ির বাইরে কেউ থাকবেন না। গুজবে কান দেবেন না। কোথাও কোনও কাজ হচ্ছে না। অতর্কিত উৎপাতে মানুষ দিশেহারা...

রেডিও বন্ধ করে দিল বিকাশ। মুখ তার ফ্যাকাশে।

আচমকা সব আওয়াজ থেমে গেছে! পাখিরা কি রণে ভঙ্গ দিয়েছে? দুর্ভেদ্য এই দুর্গে ঢোকার আশা ছেড়ে দিয়েছে?

নাকি, সাময়িক রণবিরতি?

সন্ধে হতেই খেতে বসল চারজনে। চারদিক নিস্তব্ধ। মনে হচ্ছে যেন নিশুতি রাত।

দূরায়ত যান্ত্রিক গর্জনটা তাই শোনা গেল অত স্পষ্ট। আকাশবাতাস কাঁপিয়ে অনেকগুলো উড়োজাহাজ আসছে।

স্বস্তি উপচে পড়ে বউ-এর চোখে-মুখে—মিলিটারি প্লেন নিশ্চয়। এইবার মরবে।

অদ্ভুত চোখে তাকায় বিকাশ,—কারা মরবে?

—কারা মানে? বউ অবাক—পাখিরা মরবে, আবার কারা?

—দেখো কী হয়!

বিকাশ যুদ্ধ দেখেছে। সে জানে এরোপ্লেনের কেরামতি। প্রকৃতির তৈরি ঝুলে এরোপ্লেন বিশাল জেটপ্লেনও অকেজো করে দিতে পারে...

কিন্তু এই যুদ্ধনীতি নিল কেন সামরিক কর্তারা? গ্যাস ছড়াবে নিশ্চয়...গর্জনে কান পাতা দায় হয়ে উঠছে। বেশ কয়েকটা বিমান পুরোদমে পাক দিচ্ছে উপদ্বীপের মাথায়।

আর ঠিক তারপরেই গুলিবর্ষণের শব্দে চমকে উঠল বিকাশ।

ঘন-ঘন গুলি চলছে। মেশিনগানের বুলেট বিরামহীন শব্দপরম্পরা সৃষ্টি করে চলেছে...

প্রচণ্ড গর্জনে কেঁপে উঠল মাটি। বিশাল কিছু একটা আছড়ে পড়ল মাটিতে। কাছে...দূরে...একইভাবে মেদিনীর সঙ্গে সংঘাত-শব্দ ভেসে এল মাটির ওপর দিয়ে। শব্দ যে শক্ত জিনিসের ভেতর দিয়েই বেশি জোরে ছোটে। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে দিকে দিকে।

তারপর সব নিস্তব্ধ।

গুলিবর্ষণ থেমে গেছে। বিমান আর উড়ছে না।

শ্মশান-নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে চারিদিকে।

বিবর্ণ মুখে স্ত্রী বলল,—কী হল গো?

চোয়াল শক্ত করে বলল বিকাশ,—মানুষের তৈরি পাখিরা হেরে গেল ভগবানের তৈরি পাখিদের কাছে। নাও, শুয়ে পড়।

—এত তাড়াতাড়ি?

—আবার যখন ওরা আসবে,—তখন তো জাগতেই হবে।

—আবার আসবে?

—আসবেই—জোয়ার এলেই ওরা খেপে ওঠে, ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই বলছি, একটু ঘুমিয়ে নাও।

সোনা আর মণিকে নিজেই শুইয়ে দিল বিকাশ। বাবাকে জড়িয়ে শুতে ওরা ভালবাসে। বিশেষ করে এই নতুন পরিবেশে। গোটা পৃথিবীটার হঠাৎ যেন দম আটকে গেছে। অসহ্য উৎকণ্ঠা ইথারের মধ্যে দিয়ে পরিব্যাপ্ত সর্বত্র। এরকম শব্দহীনতাও কল্পনায় আনা যায় না। মানুষের দেহে যেমন অনেক শব্দ আছে—এই পৃথিবীর দেহটাতেও আছে তেমনি অনেক আওয়াজ। আওয়াজগুলো সব গেল কোথায়? মৃত্যুপুরীও তো এত নিস্তব্ধ হয় না!

ভাবতে-ভাবতে একটু তন্দ্রা এসেছিল বিকাশের।

ভেতর থেকেই কে যেন ওকে জাগিয়ে দিল। আসন্ন আতঙ্ক রনরনিয়ে চলেছে যার শিরা-উপশিরা স্নায়ুমণ্ডলীতে—সে কি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারে?

সোনা আর মণি ঘুমোচ্ছে...ঘুমোচ্ছে বউ। ঘরের কোণে জ্বলছে একটা মোমবাতি।

আস্তে-আস্তে উঠে পড়ল বিকাশ। পা টিপে-টিপে এল দরজার কাছে। খিল খুলতেই আওয়াজ হল খট করে। ওইটুকু আওয়াজই যেন কামান গর্জন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল নিথর গৃহের আনাচে-কানাচে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছে বউ। ঠেলে বেরিয়ে এসেছে দুই চোখ।

—কোথায় যাচ্ছ?

—দেখতে।

—যেও না...না...না...যেও না।

হিস্টিরিয়া হয়ে গেল নাকি বউয়ের। নিদারুণ উৎকণ্ঠায় নার্ভের দফারফা করে বসে আছে। চাপা গলায় ধমকে ওঠে বিকাশ,—আঃ। চেঁচিও না। ঘুম ভেঙে যাবে সোনা-মণির।

—তুমি যেও না।

—জোয়ার না আসা পর্যন্ত ওরা আর আসবে না। তাই দেখে আসি বাইরেটা।

—না...না!

টুক করে বেরিয়ে এল বিকাশ। সঙ্গে-সঙ্গে ধমড়ি খেয়ে পড়ল পা, আটকে যাওয়ায়।

চৌকাঠের সামনে থেকেই শুরু হয়েছে স্তূপ। মরা পাখিদের স্তূপ। ঘাড়ভাঙা, ডানাভাঙা, রক্তমাখা এত পাখি একসঙ্গে এইভাবে পাহাড়প্রমাণ অবস্থায় কেউ দেখেছে?

ঠান্ডাও তেমনি পড়েছে। ছুরি চলছে যেন বাতাসে। লাল হয়ে গেছে দূরের পাহাড়ের পেছন দিকটা। আগুন লকলকিয়ে উঠছে।

কাঠের গুদোম আছে ওখানে। বনের কাঠ কেটে জড়ো করার গুদোম। পাখিদের আক্রমণে প্লেন ভেঙে পড়েছে নিশ্চয়। ওখানেই। তাই অত আগুন। গুদোম জ্বলছে।

উঠে দাঁড়িয়ে ঘুরে দেখল বউকে। মুখখানা ছবিয়ের মতো ফ্যাকাশে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে দূরের রক্তিম পাহাড় আর আকাশের দিকে। বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝেছে সবই। পাখিদের অনাসৃষ্টি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেছে।

মায়া হল বিকাশের। মৃত্যুকে দেখার ধাত সবার থাকে না। যুদ্ধফেরত বিকাশ রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে। আগুন নিয়ে ধ্বংসের উৎসব করেছে। কিন্তু তার স্নায়ুও যখন কেঁপে-কেঁপে উঠছে, অবলা নারী তো আধমরা হয়ে যাবেই।

ঘরে ফিরে এল বিকাশ। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললে নরম গলায়,—লক্ষ্মী মেয়ে। গরম কফি বানাও, দু-কাপ।

কফি অনেকের ঘুম ছুটিয়ে দেয়, বিকাশকে কিন্তু ঘুম পাড়িয়ে দেয়। তাই একটু পরেই বুজে এসেছিল দুচোখের পাতা।

ঠক-ঠক-ঠক...খটাং-খটাং...ঠক-ঠক-ঠক...খটাং-খটাং।

সটান উঠে বসে বিকাশ। ছেলে-মেয়ে বউয়ের ঘুমও ভেঙেছে। শুরু হয়ে গেছে বেশ উপদ্রব। নিশাচর হানাদাররা একযোগে হানা দিয়েছে দরজা-জানলায়।

আওয়াজগুলো কিন্তু আর এলোমেলো নয়—বেশ পরিকল্পনা মাফিক হয়ে চলেছে। ধারালো চঞ্চু দিয়ে ঠুকে-ঠুকে কাঠ ফুটো করবে নাকি? কাঠঠোকরাদের তলব পড়েছে? পেঁচারা পথ দেখাচ্ছে? আঁচড়ানি আর কামড়ানির আওয়াজ কি বাজপাখিদের কীর্তি? এই রণনীতি আরও কিছুক্ষণ চললে ভোরের আলো আর দেখতে হবে না—তার আগেই পঙ্গপালের মতো ঢুকবে ওরা...তারপর...

শিউরে ওঠে বিকাশ। নীরব চাহনি মেলে বউ মেয়ে ছেলেকে অভয় দিয়ে উঠে যায় সিঁড়ির দিকে। কয়েক ধাপ উঠেই নিশ্চল হয়ে যায় দুটো পা।

ওপরের শোবার ঘরে শোনা যাচ্ছে খসখস খড়মড় ঝটপট আওয়াজ।

পাখি। পাখির দল ছাতের টালি সরিয়ে, সিলিং ফুটো করে ঢুকে পড়েছে ঘরে।

পালিয়েই এল বিকাশ। রান্নাঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে খিল তুলে দিলে ভেতর থেকে।

মুখ তার ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে। বিষম আতঙ্কে অসাড় হয়ে গেছে বউ-বাচ্চাদের জিভ। ফ্যাল-ফ্যাল করে তিনজনেই চেয়ে আছে ওর দিকে। জানলা-দরজায় সেই অবর্ণনীয় ঠক্‌ঠক্ খটাং-খটাং আওয়াজ। কড়মড়-খড়মড় আঁচড়ানির শব্দ। পাশে-পাশে শকুন-শকুনি সুশৃঙ্খল জিঘাংসায়, কাঠ ফুটো করে চলেছে...সারি-সারি ফুটো রচনা করছে লোহার মতো কঠিন চঞ্চু আর ইস্পাতের মতো ধারালো নখ দিয়ে...

দরজা কেটে ফেলতে আর কতক্ষণ?

ভোর হতেই বা আর কত দেরি?

জোয়ার এসে গেছে নিশ্চয়। জল থেকে তাই উঠে এসেছে পিশাচসম সমুদ্র-শকুনিবাহিনী।

হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও তো যায় না। কাঠের আর যখন অভাব নেই—তখন যেখানে-যেখানে ওরা ফুটো করছে, সেই সেই জায়গায় লম্বা করে মেরে দেওয়া যাক কাঠের পটি।

হাতুড়ি চলল দমাদম...

চঞ্চুর ঠোক্কর চলল ঠকাঠক...

ভোর হল।

বেদম বিকাশ এখন এলিয়ে পড়েছে বিছানায়।

রক্তমাংসের শরীর। একটানা কত ধকল আর সইবে?

কিন্তু দু-চোখের পাতা খুলে গেল একটু পরেই। কোঁ-কোঁ আওয়াজ করে চলেছে রেডিওটা। —হল কী?

ভয়ার্ত চোখে তাকায় বউ,—রেডিও-স্টেশন কি বন্ধ হয়ে গেল?

—তার মানে। উঠে বসে বিকাশ।

—খবরটা শোনবার চেষ্টা করছি অনেকক্ষণ ধরে। কোঁ-কোঁ আওয়াজ ছাড়া তো কিছু শুনছি না।

কাঁটা ঘুরিয়ে নিজেই চেষ্টা করে গেল বিকাশ। কিন্তু বৃথাই। হয় রেডিও বিকল হয়েছে—নইলে বিগড়েছে রেডিও-স্টেশন।

অথবা...অথবা...

জনশূন্য হয়েছে বেতার-কেন্দ্র।

এইটাই স্বাভাবিক। সমরনীতির অঙ্গ রেডিও-স্টেশনকে আগে দখলে আনা। এখন তা পাখিদেরই দখলে। কলকব্জা চালাতে পারলে কিচিরমিচির করে জানিয়েও দিত—মনুষ্যগণ! পৃথিবী এখন আমাদের মুঠোয়। আত্মসমর্পণ করো!

আত্মসমর্পণ? বিদ্রোহী হয়ে ওঠে যুদ্ধফেরত বিকাশের অণু-পরমাণু। পলায়ন করার চরিত্র তার নয়। লড়ে যাবে শেষ পর্যন্ত।

নব ঘুরিয়ে রেডিওর গলা টিপে দিল বিকাশ। একটু জোরেই। এইভাবে যদি কোকিল-দোয়েল-কাক-ময়নাদের গলাগুলো টেপা যেত...

কী আবোলতাবোল ভাবছে বিকাশ?

তাকায় বাইরের দিকে। খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে সকালের আলো দেখা যাচ্ছে। পাখিদের করাল কূজনও স্তব্ধ হয়েছে।

চা-জলখাবার খেয়ে সদর দরজার খিল খুলল বিকাশ। পাল্লা দুটো এক ইঞ্চি ফাঁক করে দেখে নিল। শয়তান উড়ুক্কু বাহিনী ঘাপটি মেরে আছে কিনা ধারেকাছে।

কেউ নেই।

ভাঁড়ার ঘরের অবস্থা আগেই দেখে নিয়েছে বিকাশ। আরও খাবার মজুত করা দরকার। রসদ থাকলেই লড়াই চলবে—নইলে সব শেষ।

বউকেও বুঝিয়েছে। ভাটার সময়ে পাখিদের নিশ্চয় সুবুদ্ধি ফিরে আসে। তখন একবার বেরোতেই হবে খাবারের সন্ধানে। ভয়ার্ত মুখে সায় দিয়েছে বউ। উপায়ও তো নেই।

টুক করে বেরিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল বিকাশ।

চেয়ে দেখল আকাশের দিকে। এরকম মরা আকাশ জন্মাবধি সে দেখেনি। এরকম প্রাণহীন আবহাওয়াও কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না। গোটা পৃথিবীটাই আজও একটা রহস্য বিজ্ঞানীদের কাছে। কী আছে তার জঠরে, কেউ তা সঠিক জানে না। পৃথিবীর চৌম্বকশক্তির উৎপত্তি-রহস্যও মস্ত প্রহেলিকা পাকাচুলো বিরাট বৈজ্ঞানিকদের কাছে।

সেই রহস্যই বোধহয় ভেদ করেছে নিরক্ষর ইতর প্রাণীগুলো। জোয়ার-ভাটা খেলার সঙ্গে নিজেদের অমানুষিক করে তোলার শক্তি অর্জন করেছে। এক হয়ে থাকার ক্ষমতাও উপলব্ধি করেছে—যা আজও পারেনি পৃথিবীর মানুষ।

বিপুল এই পৃথিবীর এখনকার টুকরো চেহারাটা দেখেই আন্দাজ করে নেয়

বিকাশ। সারা পৃথিবীতেই নিশ্চয় বিরাজ করছে এই অপার্থিব দৃশ্য। কী এক অপ্রাকৃত শক্তিতে করাল রূপ ধারণ করে মুহুর্মুহু ধেয়ে এসে স্থল দখল করেছে অন্তরীক্ষের প্রাণীরা। নীরব হাহাকার তাই বুঝি ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে বাতাসে। প্রেতলোকেও বুঝি এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখা যায় না।

পায়ে-পায়ে এগোয় বিকাশ। রাস্তা বোধহয় হয়ে গেছে নিষ্প্রাণ পাখিদের স্তূপে। আত্মহননের সঙ্কল্প নিয়ে ওরা এসেছিল মনুষ্যহননের অভিপ্রায়ে। সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।

তবুও কিন্তু ওরা বসে আছে। গাছের ডালে। বেড়ার ওপর, খেতের মাঠে পাশে-পাশে পাখি নিথর নিশ্চল দেহে পলকহীন চোখে চেয়ে আছে বিকাশের দিকে। কী একটা নিগূঢ় অভিসন্ধি ভাসছে অসংখ্য চোখে।

গায়ের লোম খাড়া হয়ে যায় বিকাশের।

ভয়ঙ্করতম সমুদ্র-শকুনদের কিন্তু আর দেখা যাচ্ছে না। জোয়ার আসার সঙ্গে-সঙ্গে নিশ্চয় ফের চলে আসবে জল থেকে ডাঙায়। তাদের আসার প্রতীক্ষাতেই বুঝি নিয়মশৃঙ্খলানিষ্ঠ সেনাবাহিনীর মতো এত চুপচাপ পাখির দঙ্গল। পৃথিবী লুঠ করে খাবার খেয়েও বোধহয় ঝিমুনি এসে গেছে। নতুন উদ্যম সঞ্চারিত হবে সমুদ্র-শকুনদের পুঞ্জাকারে আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে...

দ্রুত পা চালায় বিকাশ। হাতে সময় খুব কম। পাখিদের রণকৌশল কেউ ওকে বলে দেয়নি। কিন্তু ওর আদিম সত্তা ওকে বলছে—তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি! তাড়াতাড়ি।

শেষের দিকে দৌড়েছিল বিকাশ। পাখিরা কিন্তু একচুলও নড়েনি। একটুও ডানা ঝাপটায়নি। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে চেয়েছিল ওর গমনপথের দিকে। ভাবখানা এইরকম—ঘুরে নাও, আর কিছুক্ষণ বই তো নয়।

নন্দলালের বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যেন তড়িতাহত হল বিকাশ। প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক খেলে স্নায়ুর প্রান্তগুলো বুঝি এমনিভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে ওঠে।

পাখি। পাখি। পাখি। মরা পাখির পাহাড় জমে গেছে বাড়ি, গাড়ি, গ্যারাজ, বাগানের ওপর। জিপটা অর্ধেক ঢোকানো হয়েছিল গ্যারাজে। পাখিদের হানা শুরু হয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে।

মরা পাখিদের স্তূপের মধ্যে থেকে উঠে রয়েছে একটা পা।

আর একটা দোনলা বন্দুকের চোঙা।

বিকাশের গল্প শুনে হেসেছিলেন নন্দলাল। বিদ্রূপের সেই হাসি এখনও ভোলেনি বিকাশ।

লাথি মেরে পাখিগুলো গতায়ু দেহের ওপর থেকে সরিয়ে দিল বিকাশ। মরা মানুষটার মুখটা দেখা গেল সবার আগে।

পাখির দুর্গন্ধময় মড়া দেখে অভ্যস্ত বিকাশকেও চোখ সরিয়ে নিতে হল বীভৎস সেই দৃশ্য দেখে।

দুচোখ খুবলে বের করে নেওয়া হয়েছে।

নাকের কাছে একটা গর্ত—চঞ্চু দিয়ে তৈরি খোঁদল। ঠোঁট আর গালে অজস্র ফুটো।

পালিয়েই এল বিকাশ। দোনলা বন্দুক নিয়েও যিনি নিজেকে বাঁচাতে পারেননি—এবার দেখা যাক ওঁর স্ত্রীর অবস্থা।

বাড়ির কাচের জানলাগুলো খান-খান হয়ে গেছে। আস্ত নেই একটা কাচও। দুইটি করে খোলা দরজা। সিঁড়িতে পড়ে মরা পাখি। মাড়িয়ে উঠে গেল বিকাশ। চাতালে দেখল বউদিকে।

হাতে একটা কাটারি। মরা বিহঙ্গরা তাঁকেও ছেয়ে রেখেছে। মুখের আভাস যেটুকু দেখা যাচ্ছে—এর বেশি আর দেখবার প্রবৃত্তি হল না বিকাশের...

সময়ও কম...

নেমে এল ভাঁড়ার ঘরে। খালি বস্তা কোথায় আছে ও জানে। একটা টেনে নিয়ে রাশি-রাশি আনাজ, চাল, ডাল, আলু, পিঁয়াজ ভরে নিল তার মধ্যে। ডিম থাকে মুরগিদের খাঁচাঘরের পাশে। রান্নাঘরের পেছন দিকে। সেদিকে ঘুরে যেতেই জালের খাঁচার মধ্যে থেকে মুরগিগুলো এমন লাল চুনির মতো শক্ত চোখে চেয়ে রইল ওর দিকে যে আর সাহস হল না ডিমে হাত দিতে।

বস্তা ঘাড়ে করে দৌড়ে বাড়ি ফিরে এল বিকাশ। দলে-দলে পাখি বন-প্রান্তরে বসে থেকে ওকে শুধু দেখেই গেল।

আশ্চর্য একতা। আশ্চর্য শৃঙ্খলা। মানুষ যদি শুধু এইটুকু অর্জন করতে পারত...

জোয়ারের সময়ে আবার তারা এল।

জানলা খুলে সমুদ্রের দিকে চেয়েছিল বিকাশ। ধোঁয়ার মতো কী যেন দেখা যাচ্ছিল দিগন্তে। একটু-একটু করে এগিয়ে আসছে কাছে।

জাহাজ নাকি? উড়োজাহাজের খেল খতম হওয়ার পর নৌবাহিনীর টনক নড়েছে?

ক্ষণিকের জন্যে উৎফুল্ল হয়েছিল বিকাশ। পরমুহূর্তেই খুশির আলো নিভে গেল চোখ মুখ থেকে।

সমুদ্র-শকুনের ঝাঁক উঠে আসছে জল ছেড়ে। নির্ভুল নিশানায় তারা আসছে, নিষ্ঠুর সঙ্কল্পের শক্তিতে শক্তিমান হয়ে...

এবার খুঁজি আর বাকি নেই। কেননা, একই সঙ্গে খেত, গাছ, প্রান্তর থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি উঠে পড়ল আকাশে।

একই সুরে গাঁথা পড়েছে অযুত-নিযুত মন।

দড়াম করে জানলা বন্ধ করে দিল বিকাশ। দুড়মুড় করে নিচে নেমে এসে দরজা-জানলা ঠিকঠাক বন্ধ আছে কিনা দেখে নিয়ে জ্বালিয়ে দিল মোমবাতি।

সোনা হাততালি দিয়ে বললে,—কী মজা! দুপুরবেলা মোমের আলো।

মুখ অন্ধকার করে বিকাশ বলল,—খেয়ে নেওয়া যাক।

কিন্তু খাওয়ার সময়ও দিল না হিংস্র পাখির দল। আকাশ কালো করে নেমে এল বাড়ির ওপর। মোমবাতির মহিমা বোঝা গেল তখনই। ঠিক যেন সুইচ টিপে নিভিয়ে নেওয়া হল দিনের আলো। লক্ষ-লক্ষ পাখির ডানা অবিশ্বাস্য চাঁদোয়া রচনা করেছে আকাশে। সূর্যের আলো আসবে কী করে?

রক্তজল করা আওয়াজগুলো আরম্ভ হয়ে গেল তারপরেই।

দক্ষ কারিগররা এবার নেমেছে যেন দরজা ফুটো করতে। গোবরাটি ঘিরে সারসার ফুটো সৃষ্টি করবে। নখরাঘাত চলছে প্রচণ্ড বিক্রমে। সৃষ্টিকর্তা ওদের যে হাতিয়ার দিয়েছেন, ছেনি-বাটালি-হাতুড়ি-করাতের চাইতে তা অনেক বেশি কাজের।

আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেল বিকাশ।

বললে বউকে,—রেডিও কী বলে?

—পৃথিবীর কোনও রেডিওই আর চলছে বলে মনে হয় না।

—জানতাম।

হ্যাঁ তুমি জানতে,—অদ্ভুত সুরে বললে বউ, অনেক খুন করেছ তো—তাই...

—তাই বলে থামলে কেন?

—তাই এবার খুন হতে চলেছ নিজে।

একটুও গলা কাঁপল না বিকাশ। কাঁপল না চোখের পাতা, খাবারদাবার যা এনেছি, তাতে অনেকদিন চলে যাবে।

—তারপর?

এবার আর জবাব দিল না বিকাশ। খট খটাং ঠক ঠকাং কড়মড় খড়মড় আওয়াজগুলো নির্ভুল ছন্দে বিচিত্র মরণসঙ্গীত রচনা করে চলেছে। তাল কাটছে না কোথাও...

আর কতক্ষণ?

চলমান গাছ

বজ্জাত কুকুরটা আবার ডাস্টবিনের জঞ্জাল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে গেছে। বাড়ি ফিরে রোজই এই দৃশ্য দেখি আর মেজাজ খিচড়ে যায়। তাড়িয়ে দিলেও যায় না, আবার আসে।

এমন সময়ে খবর পেলাম, আমার এক বুড়ো প্রতিবেশীর বাগানে আর এক কাণ্ড ঘটেছে। মাটি খুবলে একটা গর্ত বানানো হয়েছে, তার পাশে গড়া হয়েছে একটা বালির ঢিবি।

উটকো উৎপাত। ছোট্ট এই শহরে মুশকিল-আসান হিসেবে আমার কিছু নামডাক আছে। যেখানে সমস্যা, সেখানে আমি।

তাই গেলাম প্রতিবেশীর বাগানে, মস্ত গর্তটা দেখলাম। প্রায় তিরিশ ফুট ব্যাসের গর্ত। কম করে পঁয়ত্রিশ ফুট গভীর। কিনারা কাটা হয়েছে পরিষ্কারভাবে। একটা বিশাল ফানেলের আকারে।

মেশিনে কাটা গর্ত নিশ্চয়। এত নিখুঁত হয় কী করে?

একটু তফাতে একদম সাদা বালির একটা ঢিপি। পরিমাণ দেখে তো মনে হল, গর্তটাকে পুরোপুরি বুজিয়ে দেওয়া যায় ওই বালি ঢেলে।

মেশিন নিয়ে কোনও গাড়ি এসেছিল কি? কিন্তু গাড়ির চাকার দাগ কোথায় আশপাশে?

উপস্থিত বুদ্ধি খাটালাম। গর্তের মাটির আর ঢিপির বালির নমুনা নিয়ে এলাম। টেস্ট করা দরকার।

বাড়ি ফিরেই তলব পেলাম ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের। তাঁর বাগানটা এখুনি একবার দেখা দরকার।

মাটি আর বালির নমুনা পরীক্ষা করতে দিয়ে চলে গেলাম ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বাড়ি। তাঁর সাজানো বাগানের অবস্থা দেখে স্তম্ভিত হলাম। একেবারে তছনছ অবস্থা, একটা গাছও আস্ত নেই। কিন্তু গোটা বাগান জুড়ে রয়েছে অনেকগুলো ছোট-ছোট গর্ত। যেন অজস্র আগাছা উপড়ে নেওয়া হয়েছে।

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার উপড়েছেন কি?

তাঁর বক্তব্য খুব পরিষ্কার। ফুলগাছ বাঁচাতে হলে কিছু বাজে গাছ তুলে ফেলে দিতে হয়। তার ফলে গর্ত হয় বটে, তবে সেসব গর্ত এই গর্তগুলোর মতো এত বড় নয়।

গর্তের মাটির নমুনা নিয়ে বাড়ি ফেরার সময়ে দেখলাম, একটা ঝোপ ঘিরে তারস্বরে হাঁকাহাঁকি করছে রাস্তার কুকুরগুলো।

ঝোপের মধ্যে কী আছে, দেখবার জন্যে এগিয়ে গিয়ে দেখতে পেলাম আজব বস্তুটা।

খুব সম্ভব একটা আগাছা। কিন্তু এরকম কিম্ভূত গড়নের আগাছা তো কস্মিনকালেও দেখিনি। এই পৃথিবীতে এমন আগাছা জন্মায় বলেও জানা নেই। গোড়ার দিকটা ভুমো হয়ে ফুলে রয়েছে। চারটে শেকড় বেরিয়েছে সেখান থেকে—আগায় রয়েছে কয়েকটা বিচিত্র ফুল। এইরকম শেকড় আর এইরকম ফুল কখনও চোখে পড়েনি আমার।

তখন সন্ধে হয়ে এসেছে। আগাছাটাকে এনে রাখলাম বাড়ির ঘাসজমিতে, দিনের আলোয় খুঁটিয়ে দেখব বলে। আশ্চর্য কাণ্ডকারখানার শুরু তারপর থেকেই।

আমি একা মানুষ। আহারের ব্যবস্থা নিজেই করি। তারপর শোওয়া।

শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম অদ্ভুত অকেজো গাছটার কথা। ঘাসজমিতে ওই অবস্থায় ফেলে রাখা কি সমীচীন? নিয়ে আসি বরং ঘরের ভেতরে।

কেন যে হঠাৎ তা ভাবলাম, তা নিয়ে তখন অবাক হয়েছিলাম, পরে হইনি—ঘটনাগুলো ঘটে যাওয়ার পর।

প্রথম ঘটনাটা ঘটতে দেখলাম শোওয়ার ঘর থেকে বেরিয়ে। বারান্দায় আলো জ্বেলেছিলাম। সেই আলো পড়েছিল ঘাসজমিতে। অকেজো গাছটাকে যেখানে রেখে গেছিলাম, সেখানে দেখতে পেলাম না। সেটা রয়েছে পাঁচিলের গায়ে। হেলান দিয়ে ডালপালা ছড়িয়ে যেন পাঁচিল খামচে ধরে সিধে হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। মানুষ যেমন পাঁচিল টপকাবার আগে টানটান শরীরে সিধে হয়ে দাঁড়ায়, অদ্ভুত অকেজো এই গাছটাও তেমনি খাড়া হয়ে রয়েছে।

কী আশ্চর্য! ছিল তো ঘাসজমির এক কোণে, সেখান থেকে অন্য কোণে গেল কী করে? ওই কোণের পাঁচিল ডিঙোলেই যে বস্তিতে চম্পট দেওয়া যায়, তা জানল কী করে?

নিঝুম রাতে এমন সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড দেখলে মনের মধ্যে আতঙ্ক জাল পাতে। ব্যতিক্রম ঘটেনি আমার ক্ষেত্রেও। এক ঝটকায় তুলে নিয়েছিলাম ধারালো কুড়ুল। চলমান উদ্ভিদ যদি টিকটিকির মতো পাঁচিল বেয়ে উঠতে শুরু করে, তাহলে কুড়ুল চালাব। কয়েক কোপেই কুচিয়ে ফেলব।

আমার মাথায় যে খুন চেপেছে, তা কি বুঝতে পেরেছিল উদ্ভিদ মহাশয়? নইলে মিনিট কয়েক নিঃসাড়ে খাড়া থাকবার পর আচমকা আস্তে-আস্তে পিছু হাঁটতে থাকবে কেন? পাঁচিলের পা থেকে সরে আসবে কেন?

বিদ্যুৎ সঞ্চালিত হল যেন আমার মগজের মধ্যেও। নামিয়ে রাখলাম কুড়ুল। তাতেও নিশ্চিন্ত হলাম না। বেশ বুঝলাম, মন মোচড় দিচ্ছে গাছটার জন্যে। ওর জল দরকার, খাবার দরকার, আলো দরকার। তাই জল ভরলাম বালতিতে। তাতে খানিকটা মাটি ফেললাম, বালতি রাখলাম বারান্দার আলোর তলায়। গাছটাকে কোলে করে এনে শেকড়গুলো ডুবিয়ে রাখলাম মাটিগোলা বালতির জলে। রোদ যখন নেই এখন—বিদ্যুৎ বাতি থেকে সঞ্চয় করুক শক্তি।

ঘরে ফিরলাম। দরজা বন্ধ করলাম। বিছানায় লম্বা হলাম।

চোখ বোজবার আগে অদ্ভুত গাছের আশ্চর্য আচরণ নিয়ে একটু ভেবেছিলাম। শিউরে উঠেছিলাম তৎক্ষণাৎ। আমার প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে দিয়ে যেন একটা শক্তির প্রবাহ বয়ে গেছিল। কেন জানি মনে হয়েছিল, চলমান এই উদ্ভিদ পৃথিবীর বাইরে থেকে আসেনি তো? পৃথিবীর কোনও গাছ তো হাঁটতে পারে না! শুধু অপার্থিব নয়, বুদ্ধিশালীও বটে। বুদ্ধিন্দ্রিয় খাটিয়ে বেশ তো বুঝতে পারল, আমার মাথায় খুন চেপেছে, এখন আত্মসমর্পণ করাই কর্তব্য!

কিন্তু এই পৃথিবীতে মহাকাশের আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটল কী করে?

বুড়ো প্রতিবেশীর বাগানে একটা যানের মতো মস্ত গর্ত দেখেছিলাম। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বাগানে দেখেছিলাম অজস্র ছোট-ছোট গর্ত। সব গর্তগুলোই অস্বাভাবিক। অস্বাভাবিক এই অকেজো গাছটার সঙ্গে গর্তগুলোর কোনও সম্পর্ক নেই তো?

তদন্ত করা দরকার এক্ষুনি। সেই রাতেই চলে গেলাম ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের বাগানে—হাতে টর্চ নিয়ে। গর্তগুলো দেখলাম। নিয়মবদ্ধতা দেখে টনক নড়ল।

সার বেঁধে রয়েছে গর্তগুলো। চারটে করে গর্ত রয়েছে এক-এক জায়গায় খুব কাছাকাছি—এক-একবারে চার কোণে চারটে গর্ত। এইরকম গর্তগুচ্ছ রয়েছে আট জায়গায়।

চোখের সামনে ভেসে উঠল, আমার বাগানের চলমান উদ্ভিদের চেহারা। তারও গুঁড়ো-গোড়া থেকে বেরিয়েছে চারটে শেকড়। চারটে গর্ত খুঁড়ে নিয়ে চারটে শেকড় চালিয়ে দিয়ে দিব্যি খাড়া থাকতে পারে। নিশ্চয় ছিলও সেইভাবে এখানে। আট উদ্ভিদ লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চারটে শেকড় চারকোণে চালিয়ে মাটি খামচে ধরেছিল।

কিন্তু গেল কোথায় বাকি সাতটা চতুষ্পদ উদ্ভিদ?

খুঁজে পেলাম না।

বাড়ি ফিরে বালতির মধ্যে দেখতে পেলাম না অপার্থিব উদ্ভিদকে।

তাকে পেলাম বাড়ির সামনের দিকে। জানলার ওপর উঠে বসে রয়েছে। সুন্দর ফুলগাছগুলোর অবস্থা কাহিল করে তুলেছে।

এ কী কাণ্ড! মাঠের দরজার তালা খুলে চলে এসেছে এতদূর? তালা খোলার বিদ্যেও জানে আশ্চর্য উদ্ভিদ।

বেশ টান-টান ভঙ্গিমায় সটান দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। আমাকে দেখেই একটু ঝুঁকে একটা শেকড় বাড়িয়ে টুক-টুক করে বুক ঠুকে দিল আমার।

করমর্দনের উদ্ভিজ্জ প্রথা নাকি?

তবে হ্যাঁ, একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। অপার্থিব এই উদ্ভিদ আর যাই হোক, ভয়ানক নয়। চায় আমার বন্ধুত্ব। ক্ষতি কী? থাক না বাগানে।

চলে গেলাম নিদ্রাদেবীর আরাধনায়।

পরের সন্ধ্যায় বাগানে গিয়ে অপার্থিব আরও এক কীর্তি দেখলাম। নিজের চারপাশের বেশ কিছু ছোটখাট উদ্ভিদকে নিকেশ করে একাই খাড়া রয়েছে। আমাকে দেখেই অবশ্য শেকড় দুলিয়ে অভিবাদন জানিয়েছিল।

খুবই একালষেঁড়ে গাছ।

এরপর দেখেছিলাম এর স্বজাতীয় উদ্ভিদদের—মরা অবস্থায়। কিছু পড়ে আমার বাগানের পাঁচিলের পাশে —কিছু আমার প্রতিবেশীর বাগানে। বাগানে বিষ ছড়িয়ে রাখার অভ্যেস আছে এই ভদ্রলোকের। ফলে, খতম হয়েছে অপার্থিব উদ্ভিদবাহিনী।

একজনই টিকে রইল তাহলে আমার বাগানে।

বাড়ি ফেরার পথে দেখেছিলাম, সেই বদমাশ কুকুরটা ফের ডাস্টবিনের নোংরা ছড়িয়ে রাখছে। মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে গেলেও মনের মধ্যে রাগ চেপে নিয়ে এসে শুয়ে পড়লাম, ঘুমিয়েও পড়লাম।

ঘুম ভেঙে গেছিল কুকুরটার পরিত্রাহি আর্তনাদে। দেখলাম এক অসম্ভব দৃশ্য। অপার্থিব উদ্ভিদ তাড়া করেছে কুকুরকে—একটা শেকড় বাড়িয়ে কষে ধরে রেখেছে কুকুরের ল্যাজ!

বুঝলাম। কুকুরের ওপর যে খেপে রয়েছি আমি, তা টের পেয়েছে আশ্চর্য উদ্ভিদ। এমন কোনও ইন্দ্রিয়ক্ষমতা আছে এই উদ্ভিদের, যা মানুষের নেই।

তার প্রমাণও পেলাম পরের দিন। একগাল হেসে আমার প্রতিবেশী বললে,—কি মশায়, আপনার বাগানে নাকি একটা চলন্ত গাছ আছে? বাচ্চা মেয়েটি দেখেছে।

আমি বললাম,—বাচ্চাদের কথায় কান দেন কেন?

বলেই চলে এলাম বাগানে। আমাকে দেখেই অপার্থিব উদ্ভিদ চারটে শেকড়ের ওপর ভর দিয়ে দুলে-দুলে হেঁটে এল আমার সামনে। ডালপাতা বুলিয়ে দিল আমার

গায়ে আর মুখে। বেশ বুঝলাম, ও যে কৃতার্থ হয়ে গেছে আমার বাগানে ঠাঁই পেয়ে, তা জানাচ্ছে নিঃশব্দে।

আমি তখন দূরের বাক্সার দল দেখিয়ে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম। দিনের বেলা এত ঘোরাঘুরি করলে যে সবাই জেনে যাবে। টহল দিক রাত্রে—তাও চাঁদের আলো থাকলে কখনও নয়।

বিপদটা বুঝল চলমান গাছ। আমার কথা মনে ধরল। ডালপাতা দিয়ে আমার কব্জি জড়িয়ে ধরে আস্তে-আস্তে চার পায়ে হেঁটে গেল গাছঘরে। যদিও কোনও গাছ ছিল না সেই ঘরে। অপার্থিব উদ্ভিদ দাঁড়িয়ে গেল সেই ঘরে। আমি বাঁচলাম। সে-ও বাঁচল।

কিন্তু রাশি-রাশি ভাবনা চক্কিপাক দিয়ে চলেছিল মাথার মধ্যে। পৃথিবীর বাইরে থেকে অসাধারণ এই উদ্ভিদবাহিনী নিশ্চয় এসেছিল মহাকাশ-পোতে চেপে। স্পেসশিপ নেমেছিল বৃদ্ধ প্রতিবেশীর বাগানে—তাই অমন যানেদের আকারে গর্ত তৈরি হয়ে গেছিল মাটিতে। কিন্তু আট সঙ্গীকে ফেলে মহাকাশযান চলে গেল কেন?

ভেবে-ভেবে মাথা গরম করাই সার হয়েছিল—প্রশ্নের উত্তর পাইনি।

যদিও আশ্চর্য উদ্ভিদের সঙ্গে বিলক্ষণ বন্ধুত্ব হয়ে গেছিল আমার। ফাঁক পেলেই মুখোমুখি বসে থাকতাম। এটা-সেটা বলতাম। সে চুপ করে শুনেই যেত। একদিন আমাকে তাজ্জব করে ছাড়ল তার আর একটা পিলে চমকানো ক্ষমতা দেখিয়ে।

বিদ্যুৎচালিত মোটর নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছিলাম। পার্টস খুলে ফের লাগালাম—ওর সামনে, তারপর বোঝালাম, ইলেকট্রিসিটির দৌলতে মেশিন চলে কী করে।

আমার বকবকানি শেষ হতে-না-হতেই আশ্চর্য গাছ মোটরটার সমস্ত পার্টস খুলে ফেলে আবার ঠিকঠাক জুড়ে দিল আমার চোখের সামনে। কাণ্ড দেখে আমার চোখজোড়া তখন কপালে উঠে যাওয়ার অবস্থায় চলে এসেছিল!

আর একটা ঘটনার কথা না বললেই নয়। বাগানে বসে কাঠের তক্তা কাটছিলাম গাছটার সামনে। কেমন যেন নিঝুম হয়ে গেল সে। মনে হল বিষাদে আচ্ছন্ন।

খটকা লেগেছিল আমার। গাছের কাঠ কাটছি। গাছ তো ওর স্বজাতি—হোক না পৃথিবীর গাছ। সইতে পারছে না সেই কারণেই।

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়েছিল আর একদিনের কথা। ফুল ছিঁড়ছিলাম। ঠিক এই রকম নিঝুম হয়ে গেছিল। গাছের অঙ্গহানি ঘটলে গাছেদের কষ্ট তো হবেই।

ধরা যাক, এমন একটা গ্রহে গেছি যেখানকার বাসিন্দারা মানুষ খায়। দেখে কি আমাদের মন খারাপ হবে না?

আর একদিনের কথা মনে পড়ছে। বিজাতীয় বন্ধুকে নিয়ে উঠানে বসেছিলাম মুখোমুখি—আমাদের সামনেই লতাগাছ কেমন যেন এলিয়ে পড়েছিল। যেন তার প্রাণশক্তি ফুরিয়ে গেছে। আমার তো কষ্ট হচ্ছিলই, আমার বন্ধুটিও নিঝুম নিথর হয়ে

গেছিল—নিশ্চয় কষ্ট পেয়ে। হঠাৎ যেন প্রাণের প্রকাশ ঘটল লতাগাছের মধ্যে। চনমনে হয়ে উঠল দেখতে-দেখতে। রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আমাদের দুজনের সমবেদনার অন্তর্ধারা যুগ্ম ক্রিয়া চালিয়েছে রুগ্ণ লতা গাছের ওপর। তাই সতেজ হয়েছে।

মনের শক্তি দিয়ে তাহলে গাছের সেবা করা যায়?

ঠিক এইভাবে আর একদিন একটা রুগ্ণ ফুল গাছকে সজীব করে তুলেছিলাম দুজনে মিলে। মনে-মনে শুধু চেয়েছিলাম, কেটে যাক নির্জীব ভাব। ফুলগাছ, আমি তোমায় ভালোবাসি, আমার এই গাছ-বন্ধু তোমাকে ভালোবাসে। তুমি ভালো হয়ে ওঠো।

আমাদের চোখের সামনে আধমরা গাছটা ডালপাতা নেড়ে দিব্যি হয়ে গেছিল—আমার তো মনে হল, যেন আনন্দে হেসে উঠল।

শীতের সময়ে ওদের স্পেসশিপ নামল বাগানে। বেরিয়ে এল তিন ভিনগ্রহী উদ্ভিদ। আমার বাগানের অদ্ভুত উদ্ভিদের মতো গড়ন। আস্তে-আস্তে যখন এগিয়ে আসছে, আমার বন্ধুটি তার ডালপাতার স্নেহ-ভালোবাসা-কৃতজ্ঞতার পরশ বুলিয়ে গেল আমার মুখে, আমার গায়ে। ফিরে দাঁড়াল আগুয়ান তিন উদ্ভিদের দিকে। ডালপাতা নেড়ে নিশ্চয় কথা বলে নিল নিজেদের মধ্যে। তারপর চারজনেই আমার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল। কিছুক্ষণ। বিদায় অভিনন্দন জানাল নিথর নিষ্কম্প ভালোবাসা স্নিগ্ধ শরীরে। তারপর স্পেসশিপে উঠে চলে গেল দূর মহাকাশে।

শিখিয়ে গেল গাছেদের সঙ্গে মানুষের কত মিল—মন দিয়ে মন ছোঁয়া যায়।

মূল গল্প : ক্লিফোর্ড ডি সিম্যাক

লোহার তিল

যে কাহিনি আজ লিখতে বসেছি, তা বিশ্বাস করা, না করা আপনাদের অভিরুচি। এ কাহিনি আমি কোনওদিনই লিখতাম না যদি না 'আশ্চর্য!'-র একখানি সংখ্যা আমার হাতে এসে পড়ত। পড়বার পর মনে হল, এ পত্রিকা যাঁরা পড়েন, তাঁরা আমার কাহিনি অবিশ্বাস করবেন না। করতে পারেন না।

আর, তাই বসেছি সেই গল্প শোনাতে।

আমি তখন জাভাতে ছিলাম। প্রফেসর এরিক মার্টিন ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। জিওলজিতে মহাপণ্ডিত ছিলেন এরিক। আমি যে সময়কার কথা বলছি, তখন উনি আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে কী একটা সিরিয়াস গবেষণা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ একদিন শুনলাম জাভার পর্বত অঞ্চলে এই গবেষণা সূত্রেই গেছেন এরিক। আরও শুনলাম— তেরো নম্বর আগ্নেয়গিরির বিরাট জ্বালামুখ দিয়ে উনি ভেতরে নেমে গেছিলেন।

তারপর দু মাস কেটে গেছে। আর কোনও খবর পাওয়া যায়নি প্রফেসর এরিক মার্টিনের।

জ্বালামুখের ভেতরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে যদি এ খবর আসত আমার কাছে, তাহলে আমি তখনই তৎপর হয়ে উঠতাম। কেননা, এরিককে বাস্তবিকই ভালোবাসতাম আমি। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ট্যুরে বেরিয়েছিলাম আমি। ট্যুর থেকে ফিরেই শুনলাম এই কাণ্ড।

দেরি করলাম না। শুনেছিলাম, ড. লাভক্রাফট-এর সাথে প্রায়ই গবেষণা

সম্পর্কে আলোচনা করতে যেতেন এরিক। তাই তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম ডঃ লাভক্রাফট-এর বাড়ির দিকে।

ডঃ লাভক্রাফটও একজন নামী বিজ্ঞানী। তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল আমার। কিন্তু কোনওদিন আলাপ হয়নি। তাই তাঁর সাথে প্রথম আলাপেই যে কীরকম চমকেছিলাম, সেই কথাই আগে বলি।

কলিং বেল টেপার পর দরজা খুলে দিলেন এক তন্বী যুবতী। নীল-নীল চোখ। হালকা সোনালি চুলের রাশি। চুল-চোখ এবং গোলাপি কপোলের সঙ্গে মানানসই পোশাকের রঙ।

ভারিক্কি গলায় বললাম,—আমার নাম ডঃ চৌধুরী। আমি ডঃ লাভক্রাফট-এর সাথে কথা বলতে চাই।

আমিই ডঃ লাভক্র্যাফট,—শান্ত গলায় বললেন তন্বী মেয়েটি।

শুনেই তো চমকে উঠলাম আমি। কথা বলতে গিয়ে সেই প্রথম আবিষ্কার করলাম, আমিও বেশতিকে পড়লে তোতলাতে পারি।

ইয়ে...আপনি...আপনিই ডঃ লাভক্রাফট?

হ্যাঁ, আমিই। আসুন ভেতরে, ডঃ চৌধুরী। বলুন, কীভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে।

চট করে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিজেকে সামলে নিই। তারপর বলি,—আমি এসেছি ডঃ এরিক মার্টিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। আমি তাঁর বিশেষ বন্ধু।

দুই চোখ চিক-চিক করে ওঠে ডঃ লাভক্রাফট-এর।

—আপনি যা জানেন, তার বেশি আর কিছুই আমি জানি না, ডঃ চৌধুরী।

এরকম একটা উত্তর শুনব আশা করেই আমি এসেছিলাম। সত্যিই কিছু জানলে ডঃ লাভক্রাফট এতদিন বসে থাকতেন না। তাই বাগাড়ম্বর না করে সোজাসুজি এসে পড়লাম আমার পরিকল্পনার প্রথম পর্বে।

বললাম,—আচ্ছা, ডক্টর, আপনি 'লোহার তিল'-এর আবিষ্কর্তা...ইয়ে...আবিষ্কর্ত্রী না?

—হ্যাঁ, আমিই।

—আমি এসেছি আপনার 'লোহার তিল'কে নিয়ে যেতে।

—আমার মেশিন নিয়ে যান, আপত্তি নেই। কিন্তু 'লোহার তিল' যেখানে যায়, আমিও সেখানে যাই, ডঃ চৌধুরী।

—অর্থাৎ আপনি আমাদের সঙ্গে আসতে চান প্রফেসর মার্টিনের পরিণতি দেখার জন্যে। কিন্তু মনে রাখবেন, আমরা যেখানে যাচ্ছি, সেই আগ্নেয়গিরি অঞ্চলটা মেয়েদের পক্ষে খুব আরামপ্রদ নয়।

—আমি তা জানি ডঃ চৌধুরী। সত্যি কথা বলতে কী, 'লোহার তিল' নিয়ে আমি নিজেই ও অঞ্চলে যাওয়ার আয়োজন করছিলাম।

—আপনি একা?

—প্রফেসর গ্রিফন সঙ্গে আসছেন।

—প্রফেসর গ্রিফন?

—এই তো উনি এসেছেন। জিগ্যেস করুন না ওঁকে।

ইয়া মোটা একটা চুরুট মুখে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোক।

ঢুকেই আমাকে কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বললেন,—ডঃ চৌধুরী, ও ঘর থেকে সব কথাই আমি শুনছিলাম। লাভক্রাফটকে সঙ্গে না নিলে তো উপায় নেই। 'লোহার তিল'কে চালানোর কায়দা তো এত তাড়াতাড়ি আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন না।

দেখলাম, বৃথা কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। তাই এককথায় রাজি হয়ে গিয়ে বললাম,—বেশ শুভ। কবে রওনা হচ্ছি আমরা?

—কাল সকালে।

পরের দিন ভোর হতে-না-হতেই 'লোহার তিল'-এর ভেতরে বসে রওনা হলাম আমরা তিনজন। লোহার তিল জিনিসটা কী, তা জানার জন্যে নিশ্চয় খুব উৎসুক হয়ে উঠেছেন আপনি। লোহার তিল-এর বিস্তারিত বিবরণের মধ্যে না গিয়ে আমি শুধু বলব, ডঃ লাভক্রাফট-এর এক আশ্চর্য আবিষ্কার এই যন্ত্রযানটি। পাহাড়-পর্বতের বাধা নাকি কোনও বাধাই নয় লোহার তিলের সামনে। এমনি অনেক শুনেছিলাম। সেদিন নিজের চোখে দেখলাম এই আজব যানটিকে। দেখতে অনেকটা ট্যাঙ্কের মতো। সামনের দিকে একটা কঠিন ধাতুর শূল লাগানো। শূলটাকে আবার ভেতর থেকে ঘোরানো যায় স্ক্রুর মতো। কাজেই চলন্ত লোহার তিলের সেই দুরন্ত-শূলের সামনে যে-কোনও পর্বত-প্রাচীর ফুটো হতে বেশি দেরি লাগে না।

এই দুর্ভেদ্য দুর্গের মধ্যে বসে আমরা বিনা কষ্টে উঠে এলাম তেরো নম্বর আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে। তারপর শূল নিচু করে শুরু হল ভেতরে নামার পালা। তখনই প্রফেসর গ্রিফন আর ডঃ লাভক্র্যাফট-এর মধ্যে যে কথাবার্তা শুরু হল, তা থেকে আমি জানলাম আরও একটি আশ্চর্য তথ্য।

ডঃ লাভক্র্যাফট শুধোলেন,—প্রফেসর, কী জাতীয় শব্দ এখানে আপনি শুনেছিলেন বলুন তো?

কণ্ঠস্বরের আওয়াজ। আগ্নেয়গিরির ভেতরে জীবন্ত কিছু একটা যে আছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ আমার নেই।

পাথর ভাঙার প্রচণ্ড শব্দে কথা ডুবে যাচ্ছে দেখে চুপ করলেন দুই বিজ্ঞানী।

উঁচু-নিচু সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে তাড় দিয়ে পথ করে নিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলেছিল লোহার তিল। বাস্তবিকই মনে-মনে ডঃ লাভক্র্যাফট-এর আবিষ্কারের তারিফ না করে পারি না। কত বিচিত্র দৃশ্য ভেসে উঠতে থাকে চোখের সামনে। কখনও তা ভয়ংকর, আবার কখনও বা সুন্দর। কত রঙ-বেরঙের ক্রিস্টালের বাহার যে সেদিন দেখেছিলাম, তা বলে বোঝানো যায় না।

আওয়াজ একটু কমতেই ডঃ লাভক্রাফট বললেন,—কী ঝিকমিকে দীপ্তি দেখেছেন? মনে হচ্ছে, হিরের রাজ্যে এসে পড়েছি।

হঠাৎ প্রফেসর বলে উঠলেন,—দাঁড়ান। ওপরে ওই যে দুটো সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছে, ওই দুটোর কোনটার মধ্যে এরিক গেছেন, তা বুঝি কেমন করে?

জায়গাটা একটু খুঁজে দেখা যাক,—বলে লোহার ভিল থামিয়ে নেমে পড়েন ডঃ লাভক্রাফট। আমরাও নামি।

টর্চের আলো জমির ওপর পড়তেই একটা পরিচিত জিনিস চোখে পড়ল।

একটা তামাকের পাইপ।

পাইপটা হাতে নিয়েই 'হুররে' করে চিৎকার করে উঠলাম আমি। দৌড়ে এলেন দুই বিজ্ঞানী। পাইপটা উঁচু করে ধরে বললাম,—এরিকের পাইপ এটা। আমি চিনি। ইন্ডিয়া থেকে আসার সময়ে ওর জন্যে কিনে এনেছিলাম আমি।

প্রফেসর বললেন,—তাহলে আমরা ঠিক পথেই চলেছি। আবার আমরা উঠে বসি লোহার ভিলের ভেতরে। আবার শুরু হয় যন্ত্রযানের অগ্রগতি। সুড়ঙ্গের গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে কানে তালা-লাগানো শব্দে পথ করে নিয়ে এগিয়ে চলে বিচিত্র মেশিনটা। সামনে পড়ে একটা ফাটল। বিনা দ্বিধায় লোহার ভিল-এর ঘুরন্ত-ড্রিল ভেতরে ঢুকিয়ে দেন ডঃ লাভক্রাফট। মড়-মড় শব্দে ভেঙে পড়ে পাথরের চাঁইগুলো! আরও জোরে...আরও...আরও...তারপরেই আচমকা পাহাড়ের বাধা চুরমার করে ছিটকে বেরিয়ে যায় সামনে, এসে দাঁড়ায় এক নতুন জগতের মাঝখানে!

দারুণ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন প্রফেসর,—এ কী, এ যে দেখছি আর-একটা দুনিয়া!

চোখের সামনে সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে আমিও এমন অবাক হয়ে গেছিলাম যে, কথাও বলতে পারলাম না।

গম্ভীর স্বরে ডঃ লাভক্রাফট বললেন,—হ্যাঁ, প্রফেসর। আর-এক দুনিয়াই বটে। ওপরের পৃথিবীর অনেক...অনেক নিচে লুকনো এ আর-এক পৃথিবী।

আচমকা মেঘগর্জনের মতো গুরু-গুরু শব্দে চমকে উঠি আমরা। তার পরেই লক্ষ করি কীসের একটা বিরাট কালো ছায়া নেমে আসছে আমাদের ওপর।

পরক্ষণেই আতঙ্কে অবশ হয়ে আসে আমাদের সর্বশরীর। তালগাছের চেয়েও অনেক লম্বা এক অতিকায় দৈত্য পায়ে-পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। কী বিশাল তার চেহারা। বড়-বড় গোঁফ-দাড়ির মাঝে জ্বলন্ত দুটো চোখ দেখে মনে হয় যেন আগুনের গোলা। এগিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে সমানে মেঘগর্জনের মতো হুঙ্কারের বিরাম ছিল না।

এই দৈত্যেরই ছায়া এসে পড়েছিল আমাদের ওপরে।

আমিই প্রথম কথা বললাম,—প্রফেসর, ওই আপনার জীবন্ত প্রাণীর কণ্ঠস্বর! অতিকায়ের এক মানব!

ভয়ার্তস্বরে বলে উঠলেন ডঃ লাভক্র্যাফট,—কিন্তু ও যে লোহার তিল-এ ফিরে যাওয়ার পথ বন্ধ করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

কথা বলে নষ্ট করার মতো সময় ছিল না হাতে। দুই হাতে দুই বিজ্ঞানীকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে দৌড় দিলাম একদিকে।

দৌড়তে-দৌড়তে প্রফেসর বলে উঠলেন,—এবার বুঝেছি কেন এরিক বেচারি ফিরে যেতে পারেনি। এই দানবের হাতেই প্রাণ দিয়েছে সে।... এই যাঃ...

আচমকা নিভে যায় টর্চের আলো।

—প্রফেসর! প্রফেসর!

—টর্চটা হাত থেকে ছিটকে কোথায় পড়ল ডক্টর।

আর খোঁজবার সময় নেই। দৈত্যটা এসে পড়ল বলে।

সঙ্কীর্ণ একটা ফাটলের মধ্যে ঢুকে পড়ি আমরা। বাইরে থেকে শুনি মানুষ-দানবটার কানের পর্দা-ফাটানো গর্জন।

বলি,—এখানে আমরা নিরাপদ। এত সরু জায়গায় অত বড় দেহ ঢুকবে না।

তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু এখান থেকে বেরুই কী করে?—শুধোলেন ডঃ লাভক্র্যাফট।

হঠাৎ ফাটলের ভেতর দিয়ে আলোর একটা তির্যক রেখা এসে পড়ে আমাদের ওপর।

টর্চের আলো! দানবটার হাতে জ্বলছে আমাদেরই টর্চের আলো!

চক্ষু স্থির হয়ে যায় আমার। এ কী কাণ্ড! দৈত্যটা টর্চ জ্বালতে জানে দেখছি।

আশ্চর্য! এ কী করে সম্ভব, প্রফেসর?

বাকি কথাটা আর শোনা যায় না দানবটার গর্জনে।

গর্জন কমতেই প্রফেসরের স্বর শোনা যায়,—আমি বলছি তা কী করে সম্ভব। শুনে আপনাদের বিশ্বাস হবে না জানি, তবুও আমাকে বলতে দিন। আচ্ছা, দাড়ি বাদ দিয়ে দৈত্যটাকে কল্পনা করুন তো ডঃ লাভক্র্যাফট? আরও কল্পনা করুন ও যেন আমাদের মতোই ছোট হয়ে গেছে। ভাবুন। কী দেখছেন?

ইয়ে...অবিশ্বাস্য...কিন্তু আমি দেখছি প্রফেসর এরিক মার্টিনকে!—বলেন লাভক্র্যাফট।

এবং প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে লক্ষ করলাম বোঁ করে পেছন ফিরে অসুর মূর্তিটা দ্রুত পায়ে সরে যেতে লাগল অন্যদিকে।

চিৎকার করে উঠি আমি—প্রফেসর মার্টিন।

প্রফেসর স্প্রিঙ্গল বলেন,—হ্যাঁ, তিনিই। এইখানে আসার পরেই কিছু একটা পরিবর্তন এসে যায় ওঁর মধ্যে। খুব সম্ভব অজানা গ্যাস শোঁকার ফলেই আভ্যন্তরিক পরিবর্তন ঘটে ওঁর দেহের প্রতিটি কোষে-কোষে—তার ফলেই এই অকল্পনীয় দানব চেহারা পেয়েছেন উনি। খুব সম্ভব ওঁর মনটাও পালটে গেছে সেই সাথে। তা না হলে ওভাবে আমাদের আক্রমণ করতেন না।

হঠাৎ সব কিছু ছাপিয়ে শোনা যায় একটা গুম-গুম ধ্বনি।

ও কী?

—খুব সম্ভব মাটির তলার ভূমিকম্প। এরিককে যদি নিয়ে যেতে হয় এখান থেকে, তাহলে আর দেরি করার সময় নেই। পাথর ধসা শুরু হওয়ার আগেই কোনওরকমে ওকে বোঝাতে হবে, তারপর...।

কথা আর শেষ হয় না। মুহুর্মুহু কাঁপতে থাকে পাথরের দেওয়াল—আর সে কী দারুণ আওয়াজ!

—দেরি হয়ে গেছে, আর উপায় নেই!

—এরিক কোথায়?

এরিক নেই! কোন ফাঁকে সে উধাও হয়েছে দৃষ্টিপথ থেকে। বেশি ভাবনার সময় নেই। চট করে আমি বললাম,—আপনারা একটু সাবধানে দাঁড়ান। আমি দেখে আসি এরিককে পাওয়া যায় কি না।

বলেই, পাহাড়ের ফাটল ধরে ওপরে উঠতে লাগলাম। উঁচু কিনারায় খানিকটা উঠতে দেখতে পেলাম দানব-প্রফেসর এরিক মার্টিনকে। মাথা নিচু করে এগিয়ে চলেছিল ও সামনের দিকে। কিনারা বরাবর খানিকটা দৌড়ে গিয়ে চিৎকার করে উঠলাম আমি—এরিক মার্টিন! আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?...

থমকে দাঁড়িয়ে যায় অসুর মূর্তি। তারপর ধীরে-ধীরে মুখ ফেরায় আমার দিকে। বড়-বড় দুই চোখে কেমন জানি বিষণ্ণ দৃষ্টি নিয়ে ও তাকায় আমার দিকে। প্রফেসরের চেতনা তা হলে সম্পূর্ণ লোপ পায়নি। আমার কথা উনি শুনেছেন, বুঝেছেন। এমনকী মানবিক ভাবাবেগের লক্ষণও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দুই চোখে।

ঠিক এই সময়ে মাটির তলায় প্রচণ্ড বিস্ফোরণের পরেই থর-থর করে কেঁপে উঠল মাথার ওপরের ছাদ, চড়-চড় করে ফেটে গেল কয়েকটা জায়গা এবং পরক্ষণেই বিরাট একটা পাথরের চাঙড় খসে পড়ল ওঁর মাথার ওপর।

কোনওরকম শব্দ বেরুল না দানব-প্রফেসরের মুখ দিয়ে। বিরাট পাহাড়ের মতো সশব্দে উনি আছড়ে পড়েন কম্পমান জমির ওপর। ওঁর নিস্পন্দ দেহ দেখে বুঝতে দেরি হয় না আঘাতের আকস্মিকতায় জ্ঞান হারিয়েছেন উনি।

ঠিক এই সময়ে যেন ভোজবাজির মতোই থেমে যায় ভূগর্ভের প্রলয় লীলা। স্তব্ধ হয় গুমগুম ধ্বনি।

চিৎকার করে ওঠেন প্রফেসর প্রিসল,—আর দেরি নয়, বেরিয়ে আসুন চটপট। আবার ভূমিকম্প শুরু হওয়ার আগেই কাজ সারতে হবে আমাদের।

বলেই উনি দৌড়োন লোহার ডিমের দিকে। ভেতর থেকে একরাশি দড়ি নিয়ে ছুটে আসেন। তারপর তিনজনে মিলে দ্রুত হাত চালিয়ে বেঁধে ফেলি দানব প্রফেসরের দুই হাত।

ডঃ লাভক্রাফট বললেন,—কিন্তু এঁকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন কী করে?

লোহার ডিমের পেছনে বেঁধে টেনে নিয়ে যাব। কিন্তু আর তো দেরি করা যায় না। আবার শুরু হয়েছে ভূমিকম্প।

হঠাৎ লক্ষ করি চোখের পাতা কেঁপে উঠেছে এরিক মার্টিনের। এক লাফে পিছু হটে গিয়ে চিৎকার করে উঠি আমি—হুঁশিয়ার, ওঁর জ্ঞান ফিরে এসেছে।

বোধহয় আমার চিৎকার শুনেই লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন দানব-প্রফেসর এবং অবলীলাক্রমে দুহাতের বাঁধন ছিন্ন করে আকাশ-ফাটা গর্জন করে ওঠেন। বলাবাহুল্য আমরা তিন জনেই ততক্ষণে ছুটতে শুরু করেছি লোহার তিলের দিকে। সময় বুঝেই যেন প্রকৃতি আবার শুরু করে তার রুদ্রলীলা। ঘন-ঘন কাঁপতে থাকে পাথুরে-জমি, বড়-বড় পাথরের চাঙড় খসে পড়ে এদিকে-ওদিকে এবং কিছু দূরেই দেখা যায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে গলিত লাভার স্রোত থেকে। সে স্রোতের গতি আমাদের দিকেই।

চেঁচিয়ে উঠি আমি,—আর রেহাই নেই। এখুনি টুকরো হয়ে ফেটে পড়বে এই অঞ্চল, তার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে আমাদের।

লোহার তিলের মধ্যে ঢুকেই আমরা কোনও দিকে না তাকিয়ে তীরবেগে যন্ত্রযান চালাই বেরনোর পথের দিকে। সুড়ঙ্গের মুখের কাছে গিয়েই সভয়ে লক্ষ করি এক ভয়ংকর দৃশ্য।

রক্তাক্ত মুখে একটা বিরাট পাথরের চাঙড় দুহাতে মাথার ওপর-তুলে ধরে আমাদের দিকে তাক করছেন দানব-প্রফেসর এরিক মার্টিন!

এবং পরমুহূর্তেই দড়াম করে পাথরটা আছড়ে পড়ে সুড়ঙ্গের মুখে। বন্ধ হয়ে যায় সুড়ঙ্গ-মুখ।

আমরা ততক্ষণে সুড়ঙ্গের ভেতরে অনেকটা চলে এসেছি।

ছল-ছল চোখে ডঃ লাভক্রাফট বললেন,—এরিক এখনও আমাদের ভালোবাসেন। তাই পাথর তুলে উনি আমাদের মারতে চাননি। লাভার স্রোত যাতে আমাদের কাছে না পৌঁছয়, তাই পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দিলেন উনি।

কেউ কোনও কথা বলি না। বলার কিছু ছিলও না। গোঁ-গোঁ আওয়াজের সঙ্গে পাক্কা দিয়ে লোহার তিল সবেগে বেয়ে চলে ওপরের দিকে। আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে পৌঁছনোর পর প্রফেসর প্রিঙ্গল বললেন,—হ্যাঁ এরিক এখনও আমাদের ভালোবাসে। ওর ওই আকাশ-ফাটা গর্জন শুনে আমরা ভুল বুঝেছি। ও আসলে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিল। আমাদের হুঁশিয়ার করে ওই জায়গা থেকে তাড়াতাড়ি বার করে দিতে চেয়েছিল। ওর ভয় ছিল, পাছে ওরই মতো অবস্থা হয় আমাদেরও।

বললাম,—এরিক বুঝেছেন, ওঁর এই পরিবর্তন স্থায়ী এবং পৃথিবীর ওপরে তিনি বাঁচবেন না। তাই নিজের জীবন দিয়েও আমাদের জীবন রক্ষা করে গেলেন উনি। আর, আমরা কিনা গেছিলাম ওঁকেই জীবন্ত ফিরিয়ে আনতে।

এ কাহিনি অনেকদিনের। এর কিছুদিন পরেই ডঃ লাভক্রাফট আবার লোহার তিল নিয়ে একাকী গেছিলেন তেরো নম্বর আগ্নেয়গিরির ভেতরে।

আজও তিনি ফেরেননি।

ছ-পেয়ে পাখি

খবরটা পেয়েই পাঁই-পাঁই করে চলে এসেছিলাম। আমি যে খবরের কাগজের লোক। এরকম একটা আজব সংবাদ যদি কাগজে ছাপতে পারি, কাটতি বেড়ে যাবে না?

খবর বলে খবর! একটা এরোপ্লেন নাকি ভেঙে পড়েছে চাষির বাড়িতে!

সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট। অথচ আসবার পথে একটা অ্যাম্বুলেন্সও দেখলাম না!

বাজে খবর নাকি?

চাষি লোকটা কিন্তু তাজ্জব বনে গেল আমার কথা শুনে। এরোপ্লেন ভেঙে পড়েছে তার বাড়িতে? সে তো জানে না!

বেরিয়ে এল চাষির বউ। সে-ও বিলক্ষণ অবাক।

মুষড়ে পড়লাম। মিনমিন করে বললাম,—কিন্তু একটা লোক যে দেখেছে জ্বলতে-জ্বলতে একটা বিমান গোঁৎ খেয়ে এসে নেমেছে আপনাদের জমিতে।

চাষির বউ একটু ভাবল। তারপর বলল,—কিন্তু সেটা তো এরোপ্লেন নয়। এরোপ্লেনের তো দুদিকে দুটো ডানা থাকে।

তাহলে নিশ্চয় হেলিকপ্টার?—বলেছিলাম আমি।

—হেলিকপ্টারের মাথার ওপর পাখা ঘোরে শুনেছি—এর তো তা নেই।

আমি গেলাম ঘাবড়ে। চাষি লোকটার মন ভালো। আমার কাঁচুমাচু মুখ দেখে টেনে নিয়ে গেল পেছনের বাগানে। যেতে-যেতে অবশ্য বাজে কথার ফুলঝুরি ছুটিয়ে গেল। আর এই বাড়িতে মুরগির চাষ জমেছে ভালো। তারপরেই একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল,—এই মুরগি যদি অন্য গ্রহে চালান দিই ভালো ডিম দেবে নিশ্চয়?

চমকে উঠেছিলাম,—কোথায় চালান দেবেন?

অন্য গ্রহে—বলতে-বলতেই এসে গেলাম বাড়ির পেছন দিকে। চক্ষু সার্থক হল। খবরটা তাহলে মিথ্যে নয়। কিন্তু যা দেখছি, তা তো এরোপ্লেনও নয়, ঘোড়ার ডিমও বলব না—তবে ওই রকমই কিম্ভুত বস্তু।

মহাকায় বস্তুটাকে তো স্রেফ একটা বেলুন বলেই মনে হচ্ছে। প্লাস্টিক জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি বেলুন। হাওয়া ভরে ফুলিয়ে রাখা হয়েছে। নিশ্চয় কেউ রগড় করেছে। ভড়কে গিয়ে কাগজে খবর পাঠিয়েছে এক উজবুক।

ভালো মস্করা। আপনার গড়া নাকি? —বলেছিলাম মিটিমিটি হেসে।

—কী যে বলেন। ওর মধ্যেই তো এল আমার বন্ধুরা।

বন্ধুরা এল বেলুনে চেপে! কিন্তু চাষিভাইয়ের মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না মিথ্যের ঝুড়ি বুনছে!

তাই বলেছিলাম,—বন্ধুরা এল! ভালো, ভালো! কিন্তু তারা কারা?

এইবার ফাঁপরে পড়ে চাষিভাই,—সেটা তো বলতে পারব না। কথাই তো বলে না ছাই, জানব কী করে?

কথা বলে না। বোবা নাকি? অন্যমনস্ক হয়ে যেই বেলুন আকৃতি বস্তুটার দিকে এগিয়েছি—অমনি আমার নাকমুখ ঠুকে গেল নিদারুণ কঠিন একটা বস্তুতে—

অথচ সেটা অদৃশ্য। বেলুন-বস্তু তো রয়েছে এখনও বেশ দূরে।

বুরবক বনে গিয়ে যখন চোট খাওয়া কপালে আর নাকে হাত বুলোচ্ছি, তখন সাত তাড়াতাড়ি বলে উঠল চাষিভাই,—এই দেখুন! বলতেই ভুলে গেছি। বেলুন-গাড়ি নিয়ে পাছে গাঁয়ের ছেলেরা চ্যাংড়ামি করে, তাই একটা অদৃশ্য টুপি পরিয়ে রেখেছে।

—অদৃশ্য টুপি! বানিয়েছে আপনার দোস্তরা? তাহলে তো তাদের সঙ্গেই মোলাকাত হওয়া দরকার আমার।

—তাহলে চলুন বাড়ির মধ্যে—ওখানেই ওরা রয়েছে এখন। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা বলাটাই যে একটা ঝকমারি।

—কথা বোঝেন না?

—কথা বললে তো বুঝব। প্রথম এসেছিল বছর কয়েক আগে। কেন জানেন? আমার মুরগির ডিম নিয়ে গিয়ে মুরগির চাষ করবে বলে।

—ডিম দিয়েছিলেন?

—নিশ্চয়। কিন্তু কাজে তো লাগল না। যেতে-যেতেই নষ্ট হয়ে গেল। অনেক দূর যে—প্রায় বছর তিনেকের পথ। তাই আবার এসেছে। এবার ডিম নিয়েছি, সেই সঙ্গে বুদ্ধি খরচ করে একটা যন্ত্র দিয়েছি। যে যন্ত্র দিয়ে ডিম ফুটিয়ে মুরগি বের করা যায়। ভালোই হবে—যেতে-যেতেই পেয়ে যাবে মুরগির ছানা। —এই দেখুন আমার বন্ধুদের।

ঘরের মধ্যে পাশাপাশি বসে দুটি আশ্চর্য জীব। যেন গোলাপি কাচ দিয়ে তৈরি মুখ—বিলকুল স্বচ্ছ, ভাবলেশহীন। চোখ দুটো কাচের গুলির মতো। মাথায় অ্যান্টেনার মতো শুঁড় দুলছে। ছেলে কী মেয়ে, বোঝা মুশকিল।

এদের সামনে বসে রয়েছে চাষিবউ।

আমার ভ্যাবাচ্যাকা মুখ দেখে চাষিভাই আলাপ করিয়ে দিল,—শোনো বন্ধুরা, ইনি এসেছেন খবরের কাগজের অফিস থেকে।

অমনি কিম্ভূত আগন্তুকদের মাথার শুঁড়গুলো দুলে উঠল সবেগে।

হকচকিয়ে গিয়ে বলে ফেললাম,—এটা কী হল?

চাষিবউ বললে,—কথাটা যে বুঝতে পেরেছে, তা জানিয়ে দিল। ওরা তো মুখে কথা বলে না—শুঁড় দোলায়। যা বলতে চায়, তা মনের মধ্যে ছবি হয়ে ফুটে ওঠে।

আমি ঢোক গিললাম।

চাষিবউ বললে,—এই ধরুন, ওরা এরকম দেখতে কেন—প্রথম দিন জিগ্যেস করেছিলাম। তাতে যে ছবিটা দেখলাম, সেটা আরও গোলমেলে।

—কী ছবি?

—হাতুড়ি পেটা হচ্ছে লোহার পাতে।

সর্বনাশ। লোহার পাত দিয়ে তৈরি রোবট নাকি?

গলা তো শুকিয়ে গেছিলই, এবার নিশ্চয় মুখও শুকোল আমার। মিনমিন করে চাষিবউকে বললাম,—বলুন, আমি জানতে চাইছি, কোন চুলো থেকে আসা হয়েছে।

চাষিবউ মাথার ওপর আঙুল তুলে শুঁড়ের মতো নাড়তে-নাড়তে বলে গেল আমার প্রশ্নটা। বুঝলাম, এইটাই প্রশ্ন-সংকেত। আঙুল নাড়তে হবে শুঁড়ের মতো—যেহেতু ওরা শুঁড় নেড়েই ছবি চালাচালি করে।

বাস্তবিকই ঘটল তাই। আচমকা আমার মধ্যে যেন অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের ছায়াছবি দেখলাম। নক্ষত্র জগৎ, নীহারিকা, ছায়াপথ কল্পনাতীত বেগে সামনে থেকে এসে পেছনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। আলো...আলো...আলো...শত সূর্যের আলোয় ঝলমলে এক নক্ষত্র বিপুল বেগে কাছে এগিয়ে আসছে...

শিউরে উঠেছিলাম আমি—তৎক্ষণাৎ মাথার মধ্যেই মিলিয়ে গেছিল মহাকাশ চিত্র।

আর, আমার গলা চিরে বেরিয়ে এসেছিল আর্ত চিৎকার,—কী সর্বনাশ! এরা যে ভিনগ্রহ থেকে এসেছে, অনেকদূরের কোনও সূর্যের জগৎ থেকে।

তা তো বটেই,—চাষিভাই অকিঞ্চিৎ।

—আরে মশায়, খবরটা এখুনি দেওয়া দরকার আমার অফিসে। টেলিফোন... টেলিফোন চাই।

—এ বাড়িতে নেই।

—ক্যামেরা...ক্যামেরা দিন একটা—ছবিটা তুলে রাখি।

—চাষির বাড়িতে ক্যামেরা? কী যে বলেন।

আমার গলাবাজি আর লম্ফঝম্প দেখেই কিন্তু সবেগে শুঁড় সঞ্চালন শুরু করে দিয়েছিল কিম্ভুত দুই ভিনগ্রহী—নিশ্চয় এখন কী করা উচিত, সেই আলোচনা হচ্ছে। আচমকা উঠে দাঁড়িয়েই—শাঁত করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমিও দৌড়লাম পেছন-পেছন। যেতে-যেতেই শুনলাম ইঞ্জিন চালু হওয়ার আওয়াজ। আর আমার চোখের সামনেই অতিকায় বেলুন অগ্নি-লাফ দিয়ে উঠে গেল আকাশে—

তখন সন্ধ্যা নামছে। নিমেষে মিলিয়ে গেল কালো আকাশে।

দুই চক্ষু ছানাবড়া করে বাগানের মাটিতে বসে পড়লাম।

এমনসময়ে চাষিভাই সামনে এসে দাঁড়াতেই ঝাল ঝেড়েছিলাম তার ওপরেই, —এইভাবে ডিম বিলি করলে কদ্দিন চলবে আপনার কারবার?

—বিলি তো করিনি। দাম নিয়ে গেছিল প্রথম যখন এসেছিল।

—দেখি ওদের টাকা-পয়সার চেহারাটা।

টাকা-পয়সা! ভীষণ অবাক হয়ে গেছিল চাষিভাই,—ওরা তো বিনিময় প্রথায় কারবার করে। ওদের দেশের ডিম দিয়ে আমাদের দেশের ডিম নিয়ে গেছিল।

—ওদের দেশের ডিম! আনুন, আনুন, দেখি কীরকম ডিম।

—সে কি আছে? দেখতে ঠিক তারার মতো—পাঁচটা কোণ বেরিয়ে আছে। দুটো ডিম ফুটে বাচ্চা পাখিও বেরিয়েছিল—ছটা করে পা এক-একটার। কাণ্ড!

—কোথায় সেই পাখি? কতবড় হয়েছে?

—খেয়ে ফেলেছি।

—খুব্‌ভগোড় ?

—কুকুরে খেয়েছে।

টলতে-টলতে বেরিয়ে এলাম চাষিবাড়ি থেকে।

মূল গল্প : ফ্রিস ব্রাউন

মকর মল্লিকের মহামন্ত্র

মকর মল্লিকের মন্ত্র যে পেয়েছে, সে-ই নাকি মস্ত লেখক হয়ে যাবে। খবরটা চোখে পড়তেই টনক নড়েছিল আমার। আমি মস্ত লেখক নই। বরং বলা যেতে পারে সস্তা লেখক। দারুণ সস্তা। সম্পাদকরা দয়া করে ছিটেফোঁটা দু-পয়সা যা দেন তাতেই আমি আনন্দে ডগমগ থাকি।

সম্পাদকদেরই বা দোষ দিই কী করে। ম্যাগাজিন বিক্রি হলে তবে তো লেখক-টেখকদের দু-পয়সা দেবেন। কিন্তু সেগুড়ে বালি পড়েছে বেশ কয়েক বছর হবে। হু-হু করে ম্যাগাজিনগুলোর কাটতি কমছে। অন্যদিকে হু-হু করে টেলিভিশন-ভিসিপি-ভিসিআর—এর বিক্রি বাড়ছে। এখনতো চব্বিশঘণ্টা ইলেকট্রনিক আনন্দের যুগ এসে গেল—ঘাড় গুঁজে চোখের আর শিরদাঁড়ার বারোটা বাজিয়ে বই পড়ার যুগ ভাগলবা।

মকর মল্লিকের মহামন্ত্রের খবরটা চোখে পড়তেই তাই কলম বাগিয়ে লিখতে বসলাম।

বসেছিলাম মেঝেতে। পয়সা নেই যে টেবিল কিনব। দামি ফাউন্টেন পেনও নেই। একটা ভাঙা কলম আমার বন্ধু কৃপা করে দিয়েছিল। তার মধ্যে আবার কালি ভরা যায় না। দোয়াতে ডুবিয়ে-ডুবিয়ে লিখতে হয়। তাই করি আমি। দোয়াতে কলম ডুবোই আর বৈঠকখানা বাজার থেকে ওজনদরে কিনে আনা এক পিঠ লেখা সস্তা কাগজের আর একপিঠে এন্তার হিজিবিজি লিখে যাই মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে—অবিকল সাপের মতো। তাতে শিরদাঁড়া টনটনে থাকে, শিরদাঁড়ার মধ্যের স্নায়ুগুলো কখনও হেলিয়ে পড়ে না—লেখা চলে তরতরিয়ে।

এই ভাবেই একদিন একটা জমাটি উদ্ভট গল্প লিখছিলাম 'মাসিক কুরুক্ষেত্র' কাগজটার জন্যে। নামটা 'কুরুক্ষেত্র' হলেও ধর্মের সঙ্গে এ কাগজের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু এমনসব হট্টগোলে গল্প-কবিতা-উপন্যাস ছাপা হয়, যা পড়লে মাথার মধ্যে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যায়।

আমার উদ্ভট গল্পটার নাম ছিল 'অসম্ভবের দুনিয়া'। দু'লাইন লিখেই কলম কামড়াচ্ছিলাম আর ঘন-ঘন দোয়াতের মধ্যে নিব ডোবাচ্ছিলাম—কিন্তু মগজ থেকে তৃতীয় লাইনটা আর জন্ম নিচ্ছিল না।

এমন সময়ে চোখ গেল একপিঠে লেখা কাগজগুলোর দিকে।

প্রথম দিকে অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে তৃতীয় লাইনটার ধ্যান করছিলাম। তারপর ধ্যান-ট্যান মাথা থেকে উড়ে গেল, ড্যাবড্যাব করে চেয়ে রইলাম পুরোনো কাগজের কাগের-ঠ্যাং বগের-ঠ্যাং লেখাগুলোর দিকে।

এ যে দেখছি কারও পাণ্ডুলিপি। কেউ কাগজের এই পিঠে জঘন্য হাতের লেখায় লাইনের পর লাইন লিখে গেছে—আর ঠিক সেই কাগজখানাই উলটো করে রেখেছি ডেস্কের ওপর।

যারা লেখা নামক এই বাজে কাজটার চর্চা করে, তারা সবাই অন্যের হাতের লেখা সম্বন্ধে দারুণ কৌতূহলী থাকে। ঠোঁট বেঁকিয়ে নাক উঁচিয়ে পরের পাণ্ডুলিপির দিকে দৃকপাত করে এমনভাবে যেন, আস্তাকুঁড়ের জিনিস দেখছে।

আমিও তো লেখক। সস্তা হতে পারি, তবুও মা সরস্বতীর সাধনা করি সকাল-বিকেল। তাই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাণ্ডুলিপিটার দিকে তাকিয়েই চোখ বড়-বড় করেছিলাম।

কারণ, এই পাণ্ডুলিপিতেই প্রথম পড়লাম মকর মল্লিকের নাম। তার সম্বন্ধে একটা রস রচনা টাইপের লেখা লিখতে বসেছিল লেখক। অর্ধেকপাতা লিখেই এলেম ফুরিয়েছে—আর লেখেনি।

কিন্তু ওই কটা লাইন পড়েই আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল।

মকর মল্লিকের আসল নাম নাকি মকরধ্বজ মল্লিক। ঊর্ধ্বতন চোদ্দো পুরুষ কবিরাজি প্র্যাকটিস করে লাল হয়ে গেছিলেন বলে অকালকুষ্মাণ্ড মকরধ্বজ মল্লিক এখন খালি বসে খায়—বাপ-ঠাকুর্দার টাকা ধ্বংস করে।

কিন্তু এই ধরনের আলালের ঘরের দুলালদের কিছু না কিছু অপকীর্তি না রাখলেই নয়। যৎসামান্য বদভ্যাসও রাখতে হয়—মকরধ্বজ মল্লিক বাপের দেওয়া নাম থেকে 'ধ্বজ' অংশটুকু ছেঁটে দিয়েছে, শুধু মকর মল্লিক হয়ে গিয়ে ইংরেজি আর বাংলা সাহিত্য নিয়ে মেতেছে। কবরেজি জড়িবুটির সঙ্গে আফ্রিকী মন্ত্র মিলিয়ে এমন একটা শক্তি আবিষ্কার করে ফেলেছে, যার দৌলতে গোবরগণেশও সাহিত্য-দিগগজ হয়ে যেতে পারে। সাহিত্যের ধন্বন্তরী মকর মল্লিক জিন্দাবাদ।

এইটুকু লিখেই কাগের-ঠ্যাং বগের ঠ্যাং লেখক বাবাজির দৌড় ফুরিয়েছে। তারপর কাগজ ফাঁকা। শুধু তলার দিকে একটা কিটকেলে মন্ত্র লিখে রেখেছে এইভাবে:

হিং টিং ছট। হিং টিং ছট। হিরিং মিরিং কিরিং।

গল্পের গরু গাছে উঠুক—নাচো তিড়িং বিড়িং।

এটা ছড়া না মন্ত্র, এই দুটি সমস্যা নিয়ে চক্ষু-যুগলকে ঘূর্ণিত উলটপালট করে ফেলেছি, ঠিক এই সময়ে কড়া নড়ে উঠল দরজার। দরজার খিল নামিয়ে পাল্লা ফাঁক

করার আগেই, পাপ্পাই দমাস করে আছড়ে পড়ল আমার ওপর। আমি ঠিকরে গেলাম ঘরের মাঝখানে। কপালে খুব জোরে লেগেছিল বলে চোখে ধোঁয়া দেখছিলাম—কানের মধ্যে গোঁ-গোঁ আওয়াজ হচ্ছিল, সেই অবস্থাতেই দেখলাম সাদা লম্বা দাড়িওলা এক বেঁটে কেলে-কুচ্ছিত বুড়ো কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। তারপরেই দাঁত খিঁচিয়ে উঠল বিচ্ছিরিভাবে। সাতজন্মে না-মাজা দাঁতের হলদে শ্যাওলা দেখিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বললে,—হতচ্ছাড়া! ভুল করে বাজে কাগজের সঙ্গে একটা দামি কাগজ নিয়ে গেছিল পুরোনো কাগজওয়ালা। বৈঠকখানা বাজার থেকে আমার সেই কাগজ এনেছিস। অনেকক্ষণ থেকে ফলো করছি। ওই তো আমার কাগজ। পড়া হচ্ছিল। বলতে-বলতে বুড়ো বদমাস সাঁ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে আমার নাকের সামনে একটা সাদা কৌটো তুলে ধরে স্প্রে করতেই আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম, মকর মল্লিকের বৃত্তান্ত লেখা কাগজখানা উধাও হয়েছে মেঝে থেকে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র সব শুনে বললেন,—বেশ হয়েছে। ঠিক হয়েছে। ছাইপাঁশ লেখার ফল হাতে-হাতে ফলেছে। শুধু কপাল ঠুকে দিয়েই ছেড়ে দিল —দুখানা গাঁট্টা মেরে গেল না কেন!

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তখন তাঁর বিখ্যাত খি-খি-খি হাসি হাসলেন। হেসে-টেসে নিয়ে বললেন,—বৎস্য দীননাথ, ছাইপাঁশ যা লিখছ তাই লেখো—মকরের মার খেতে যেও না।

—মকরের মার! মানে?

—মকরের কোষ্ঠীতে লেখক হওয়ার কথা লেখা নেই, যেমন তোমার নেই। নেহাত আমি ছিলাম বলে, আমার আশ্চর্য অ্যাডভেঞ্চারগুলোকে রঙচঙে করে বাজারে ছেড়ে লেখক হয়েছ। কিন্তু মকরের মন্ত্র নিলে এই পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যাবে। যেহেতু ও লেখক হতে পারেনি—তাই এমন কাণ্ড করছে যে, লেখা আর পড়া জিনিসটাই লোপ পাবে পৃথিবী থেকে। লেখকদের আর হাঁড়ি চড়বে না, কাগজের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, সম্পাদকরা লোহালক্কড়ের ব্যবসা ধরবে। আজ থেকে একশো বছরও যাবে না—বই-টই সব মিউজিয়ামে রাখা থাকবে, মা সরস্বতীর মূর্তি তার পাশে রাখা থাকবে। —এরই নাম মকরের মার!

—কে এই মকর মল্লিক? কোথায় তার নিবাস?

—কেন? মারবে নাকি?

—ওর এই অপচেষ্টা ভণ্ডুল করব।

জুলজুল করে প্রফেসর আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বুড়োর চোখে অদ্ভুত ঝিলিক দেখলাম।

তারপর বললেন,—দীননাথ, হরফের মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। সেই হরফ লোপ পাক, এটা আমিও চাই না। হাজার-হাজার বছর ধরে ছবি হয়ে উঠেছে হরফ। কিন্তু এখনও তা ছবি। এখনও তার মধ্যে রয়েছে জাদুশক্তি। হাজার হাজার বছর পরে এই হরফ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, তার মধ্যে নতুন কী শক্তি আসবে—সেটা ডিবেটের

ব্যাপার। আমি তার মধ্যে ঢুকতে চাই না। যে যা লিখছে লিখুক, সব লেখারই একটা দাম আছে, এটা আমি বিশ্বাস করি। সবই চিন্তার জগৎ থেকে বেরিয়ে আসছে। পশু আর মানুষের মধ্যে তফাতটা এইখানেই। হুক না থাকলে মানুষ অনিত-মানুষ হবে, না অনতি-মানুষ হবে—সেটা মহাকাল দেখিয়ে দেবে। তত্ত্বের কচকচি শুনবে তো চলে এসো।

এই বলে প্রফেসর আলমারি খুলে একটা চৌকোনা খাম নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

মকর মল্লিক নিজেই দরজা খুলে দিয়েছিল। সেই বিকট বুড়োই বটে। কেলে-কুচ্ছিত, দাড়ির রঙ কিন্তু ধবধবে সাদা, লম্বা-লম্বা চুলও সাদা। বেঁটে মর্কট বললেই চলে। কটমট করে তাকিয়ে রইলাম তার মুখের দিকে। আর হাত বুলোতে লাগলাম কপালের আলুতে।

আলুর দিকে তাকিয়ে নির্দয় গলায় মকর মল্লিক বললে,—নাটবল্টু যে। চ্যালাকে নিয়ে এসেছ কেন?

প্রফেসর বললেন,—দ্যাখো মকর, আমাকে সবাই প্রফেসর নাটবল্টু চক্র বলে ডাকে। তুমি বন্ধুমানুষ, প্রফেসর নাই বা বললে, কিন্তু চক্র টাইটেলটাকে বাদ দেবে না। ওটা আমার বংশের ঐতিহ্যকে বহন করছে।

মকর তখন ওর সেই হলদে-শ্যাওলা-ঢাকা দাঁত দেখিয়ে হাসল। বললে,—চক্কোত্তি বামুনের আবার ঐতিহ্য। চাল-কলা বাঁধা ঐতিহ্য।

তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন প্রফেসর নাটবল্টুচক্র,—বংশ তুলে গালাগাল দেবে না বলে দিচ্ছি!

—তুমিই বা সবাইকে বলে বেড়াও কেন, আমি ঘাসপাতা মল্লিক?

—বেশ করি বলি। তোমার বংশ তো তাই করেছে। ঘাসপাতা বেচে পয়সা করেছে।

—খবরদার নাটবল্টু—

—খবরদার ঘাস-পাতা—

আমি সঙ্গে-সঙ্গে মাথা ঠান্ডা করে ফেললাম। আমি বোকা হতে পারি, কিন্তু মাঝে-মাঝে দেখেছি, আমার এই বোকা-বুদ্ধি দারুণ কাজ দেয়।

ঝট করে রূপোলি হাসি হেসে মিহিমাজা গলায় বলে উঠলাম,—আপনারা কি ঝগড়াই করবেন? আমি এলাম মকর-মন্ত্র শিখে নিয়ে, আপনার চ্যালা হয়ে, ছকে-বাঁধা লেখকগুলোর ভাত মারার জন্যে—

মকর মল্লিক জ্বলন্ত চোখে চেয়ে থেকে বললে,—তোমার মতো কুচোকে আমি চ্যালা বানাই না। আমার চ্যালা দরকার নেই। আমি একাই একশো।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র অমনি পটাং-পটাং করে তুড়ি মেরে বলে উঠলেন,—আর আমি একাই তোমার প্ল্যান ভণ্ডুল করে দেব।

তুমি? —মকর মল্লিকের দৃষ্টিতে যেন বাঘের চাউনি দেখলাম। বললে

চিবিয়ে-চিবিয়ে,—তুমি আমার প্ল্যান ভণ্ডুল করবে? জানো কতদূর এগিয়েছি? জানো না। এসো, ঘরে এসো—শুনে যাও শেষ প্যাঁচের গবেষণা।

পাতালঘরে যে এমন একখানা গবেষণামন্দির দেখতে পাব, কল্পনাও করিনি। আগেকার পয়সাওয়ালা লোকগুলো যাচ্ছে অভ্যেসে টাকা ওড়াত, মকর মল্লিক ওড়াচ্ছে কম্পিউটারের গবেষণায়।

বিরাট এই পাতালঘরে কত রকম কম্পিউটার আর ইউ.পি.এস. স্টেবিলাইজার ও প্রসেসর আছে, সেসবের নামও জানি না, বলতেও পারব না। অনেকগুলো এয়ারকন্ডিশনার চলছে—ঘর কনকনে ঠান্ডা। লিফটে করে আমরা নামলাম সেই ঘরে। লিফট উঠে যেতেই স্টিল-দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মকর মল্লিক। আর আমার দুচোখ ঠেলে বেরিয়ে এল ঘরের কলকব্জা দেখে।

হলদে দাঁতের ছিরি দেখিয়ে মকর বললে,—এই আমার অসম্ভবের দুনিয়া। এইখান থেকেই ছাড়ব আমি আমার মহামন্ত্র। মূর্খ দীননাথ, কোনও খবরই রাখো না বলে এখনও ভাঙা কলমে লিখে যাচ্ছ। সল কর্নবার্গ-এর নাম শুনেছ? শোননি। লাইব্রেরি টেকনলজির মস্ত ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। ইনি বলেছেন, খুব শিগগিরই লেখা আর পড়া, এই দুটো বিদ্যেই বাতিল বিদ্যে হয়ে যাবে। আর আমি বলছি, আমি মকর মল্লিক বলছি, সে জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়াবে কারিগরি দক্ষতা। বুঝলে কী বললাম? মেশিন-মেশিন-মেশিন...হাইস্পিডে জ্ঞান জুগিয়ে যাবে মানুষকে। মানুষের বই লেখা আর বই পড়ার দক্ষতার দিন ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। ফুরিয়ে যাচ্ছে বইয়ের বাজার।

আমি সত্যি-সত্যি অবাক হয়ে গিয়ে বললাম,—বলছেন কী?

—আমি ওইরকমই বলি দীননাথ, তোমার এই মূর্খ ভক্ত সেটা এখনও ধরতে পারেনি। ইংরিজি ভাষায় এখন যত শব্দ ব্যবহার করা হয়, তাদের সংখ্যা মোটামুটি সাড়ে চার লাখ। শেক্সপিয়রের সময়ে ছিল আড়াই লাখ। চারশো বছরে শব্দ বেড়েছে, অনেক শব্দ চলে গেছে। অনেক শব্দ নতুন এসেছে। বেশি পরিবর্তনটা এসেছে গত পঞ্চাশ বছরে। শেক্সপিয়র আজ যদি হঠাৎ আসতেন, মাতৃভাষা বুঝতে পারতেন না। তোমার মতো মহামূর্খরা বাংলা সাহিত্যে কলমবাজি করে চলেছ বলে ভালো-ভালো লেখকরা কল্কে পাচ্ছে না, বাংলা ভাষার হিসেবটা কেউ নিতে পারছে না। তবে মনে তো হয়, বাংলার দৈন্যদশা চলছে একই কারণে। অনেক শব্দ বাতিল হয়ে যাচ্ছে, অনেক নতুন শব্দ ঢুকছে। ঢুকুক। কিন্তু লাভ কী?

লাভ?—বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম আমি, সাহিত্য সেবা।

—তোমার মুণ্ডু সেবা। আমেরিকায় বেস্ট সেলারদের মার্কেট কমছে। দশবছর আগে দোকানের তাকে থাকত ১৮.৮ হপ্তা, এখন থাকে ১৫.৭ হপ্তা। দশ বছরেই মার্কেট গুটিয়ে গেছে ছ'ভাগের এক ভাগ। আরও হু-হু করে গুটোবে। কারণ? যে স্পিডে জ্ঞান-বিজ্ঞান বেড়ে চলেছে, সেই স্পিডে পাল্লা দিয়ে বই আর আপ-টু-ডেট জ্ঞান-বিজ্ঞান জুগিয়ে যেতে পারছে না। মাথার মধ্যে ঢোকাতেও পারছে না। সো, ভীষণ সো, নতুন-নতুন শব্দ উদ্ভাবন করেও ম্যাগাজিন আর ডেলি পেপারদের কাটতি কমছে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের আমদানির স্পিড আরও বাড়বে, বই হেরে যাবে—মেশিন সে জায়গা নেবে। হাঃ হাঃ হাঃ! সেই আমার মহামন্ত্র। সেই আমার জড়িবুটি।

কীভাবে? কীভাবে?—হাঁপাতে-হাঁপাতে বলেছিলাম আমি।

চোখ সরু করে তাকিয়ে থেকে মকর মল্লিক বলেছিল,—এ ঘর থেকে দুজনের কাউকেই আর জ্যান্ত বেরোতে দেব না যখন, তখন বলেই ফেলি আমার শেষ প্যাঁচের গবেষণা। জল দিয়ে জল বের করতে হয় জানো তো? বিষ দিয়ে বিষনাশ করতে হয়। আমার কম্পিউটার এমন সব শব্দ আবিষ্কার করে ফেলেছে, যার চমক দেখে সম্পাদক আর প্রকাশকরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এমন সব কাহিনি মেশিনই লিখে দেবে, যা ছাপা হলেই হইচই পড়ে যাবে, কাটতি হু-হু করে বেড়ে যাবে। হাতে-লিখিয়ে লেখকদের বাজারটা এইভাবে নষ্ট করে দেব। না খাইয়ে ওদের মারব। তারপর যখন লেখক জাতটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন মেশিন এমন সব শব্দ বানিয়ে বাজারে ছাড়বে যে, চালু শব্দ সব বাতিল হয়ে যাবে। আরও স্পিডে নতুন শব্দ, নতুন গল্প ছাড়ব—হার মেনে যাবে কল্পবিজ্ঞান—পাঠকরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে যখন পড়াবন্ধ করে দেবে—বই আর ম্যাগাজিনগুলো উঠে যেতে থাকবে, আর তখন আমার মেশিনই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাঁড়ারকে পুরো কন্ট্রোলে আনবে। জ্ঞানই শক্তি। সেই শক্তিতে শক্তিমান হবে আমার মেশিন। আর আমি—মন্ত্রনায়ক মকর মল্লিক হবে বিশ্বনায়ক।

বলতে-বলতে আবেশে দুচোখ বুজে ফেলেছিল মকর মল্লিক। সেই ফাঁকে টুক করে পাঞ্জাবির পকেট থেকে চৌকোনা খামটা বের করে, তা থেকে চৌকো জিনিস টেনে নিয়ে সট করে পাশের কম্পিউটারের টার্মিনালে ঢুকিয়ে দিলেন প্রফেসর। দিয়েই টার্মিনাল অন করেছিলেন।

ইতিমধ্যে চোখ খুলে ফেলেছিল মকর মল্লিক। প্রফেসরের শেষতম কাণ্ডটা দেখেই লম্ফ দিয়ে (অবিকল বাঁদরের মতো) টার্মিনালের সামনে গিয়ে সুইচ অফ করতে গেল।

কিন্তু আমি তাকে শূন্য পথেই লুফে নিয়ে—

তারপর কী করেছিলাম, তা আর বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না। বাড়ি ফিরে প্রফেসরকে জিগ্যেস করেছিলাম,—কী বিষ ঢুকিয়ে এলেন মকরের মেশিনে?

—ভাইরাস। সাড়ে সাতশো কম্পিউটার ভাইরাসের জ্বালায় কম্পিউটার বৈজ্ঞানিকরা চোখে ধোঁয়া দেখছে। শিগগিরই ওটা দাঁড়াবে দুহাজারে। আমি বানিয়ে রেখেছিলাম মকর-ভাইরাস। ওর আর অ্যান্টি-ডোজ নেই। মকরের সমস্ত গবেষণা মুছে গেল।

—কিন্তু পাগলা-গারদ থেকে বেরিয়ে মকর তো ফের আরম্ভ করবে?

—ততদিনে মরেই যাবে। কিন্তু তোমার হরফ বেঁচে থাকবে। লিখে যাও ছাইপাঁশ।

অদৃশ্য অবতার

এপ্রিল ৪, ১৯৯২ শনিবার

প্রফেসর বলেছিলেন,—দীননাথ, যেখানে যাচ্ছ, সেখানেই রয়েছে অদৃশ্য অবতারের মূল ঘাঁটি। ডাইরি লিখবে রোজ। অদ্ভুত যা কিছু দেখবে, লিখে রাখবে। সব আমার জানা দরকার।

আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না। যে আতঙ্ক গোটা তল্লাট জুড়ে দেখা দিয়েছে—তার উৎপত্তি এখানে নয়, অন্য কোথাও।

ব্যাপারটা জানলাম এইভাবে।

জঙ্গলের ভেতরে আমি ঢুকিনি। স্রেফ ভয়ে। এশিয়ার সবচেয়ে গভীর জঙ্গল এটা। প্রায় পঞ্চাশ বর্গমাইল জায়গা জুড়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপে রাজত্ব চালিয়ে যাচ্ছে গাছপালা। দিনের বেলা কাঠুরে ঢুকতে ভয় পায়। চোরাশিকারিরা দূর থেকেই ভয়ানক এই জঙ্গলকে নমস্কার করে সরে পড়ে।

অথচ এ জঙ্গল এই ভারতের। কত যে রহস্য আজও তিমিরে ঢাকা রয়েছে, —তা যদি কেউ জানত...

তবুও আমাকে ভাবতে হচ্ছে ভারতের বাইরের কথা। আমার মন বলছে, অদৃশ্য অবতারকে আমদানি করা হয়েছে ভারতের বাইরে থেকে।

বিকট ওই মড়া দেখবার পর থেকেই সন্দেহটা শেকড় গেড়েছিল মাথায়। তারপর পকেটে পেলাম তার নাম।

আমার প্ল্যান ছিল দিনের বেলায় চক্কর মারব জঙ্গল ঘিরে। রাত ঘনিয়ে আসার আগেই পালাব।

জঙ্গলকে বেশ খানিকটা দূরে রেখে আমি হাঁটছিলাম। আমার কাঁধে ঝুলছে শটগান, পিঠে ব্যাগ আর গলায় দূরবিন। হঠাৎ দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দেখলাম একটা সাদা জিনিস পড়ে রয়েছে জঙ্গলের ঠিক বাইরে। দেখেছিলাম দূরবিনের মধ্যে দিয়ে। সামনে একটা মাটির ঢিপি থাকায় পুরো দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঢিপির সামনে দিয়ে একটু এগিয়ে গেলাম।

এবার দূরবিনে স্পষ্ট দেখা গেল জিনিসটাকে।

সাদা কোটপ্যান্ট পরা একটা লোক উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে। তার দুটো হাত সামনের দিকে ছড়ানো—মাটি খামচে রয়েছে। পায়ে কালো বুটজুতো। লোকটা নড়ছে না। এতক্ষণ একইভাবে যখন পড়ে আছে, তখন নিশ্চয় মরে গেছে।

মড়াই যদি হয়, শকুনি দেখা দেয়নি কেন?

নাকি, এ জঙ্গলকে শকুনিরাও ভয় পায়!

মড়াটা একইভাবে পড়ে আছে।

একটু-একটু করে সাহস ফিরে এসেছিল। দূরবিন গলায় ঝুলিয়ে কাঁধের শটগান নিয়েছিলাম হাতে। ট্রিগার টিপলেই গোটা বারো গরম সিসে বেরিয়ে যাবে। যে বাহাদুরই তেড়ে আসুক—টিপ ঠিক না থাকলেও খতম সে হবেই। হাত যে কাঁপছে, তা তো বুঝতেই পারছিলাম।

কিন্তু বোবা গাছগুলো লাফিয়ে ঘাড়ে পড়েনি—যদিও প্রতিমুহূর্তে সেই রকমই মনে হচ্ছিল। ঘন-ঘন চোখ চলে যাচ্ছিল গাছতলার ছায়া-মায়ার দিকে। স্পষ্ট মনে হচ্ছিল কারা যেন ওৎ পেতে রয়েছে সেখানে।

ছায়া দেখে যারা চমকায়, তারা ভীতু। আর আমি চমকাচ্ছি গাছের ছায়া দেখে। কাউকে বলা যায় না।

মড়াটার হাতদশেক দূরে এসে সেকেন্ড-খানেক থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। ভয় হচ্ছিল, যদি লাফিয়ে উঠে ক্যাঁক করে চেপে ধরে!

শটগান টিপ করে ধরে গলাটাকে কর্কশ করে বলেছিলাম—কে তুমি? উঠে দাঁড়াও।

বলেছিলাম ইংরেজিতে। আমার বিদ্যে ওই পর্যন্ত। অন্য কোনও ভাষা জানি না।

মড়া উঠে দাঁড়ায়নি।

আমি তখন তিন লাফে পৌঁছেছিলাম তার পাশে। শটগান মাথার দিকে টিপ করে ধরে পা দিয়ে চিৎ করে শুইয়ে দিয়েছিলাম বডিটাকে।

নিশ্চয় আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোয়নি।

আমার শটগানের নল তাক করে রয়েছে একটা কঙ্কাল করোটিকে। পুরো

করোটি নয়। মাথা ভর্তি সোনালি চুল যেমন তেমনি রয়েছে। দুপাশের কানও রয়েছে।

নেই শুধু কপাল, চোখ, গাল, নাক, মুখ, চিবুক। সেখানে শুধু হাড়।

গোল করে মুখের চামড়া কেউ তুলে নিয়ে গেছে। ছাড়িয়ে নেয়নি—সেক্ষেত্রে একটু-আধটু মাংস লেগে থাকত সাদা হাড়ে।

কীভাবে নিয়েছে, তা আমার মাথায় এল না। সাদা হাড় মাঝে-মাঝে যেন খুবলে গেছে। এমন একটা জিনিস গোল হয়ে মুখখানাকে চামড়াহীন করে গেছে—যে-জিনিস শক্ত হাড়কেও ক্ষইয়ে দিয়ে গেছে।

নাকের তরুণাস্থি পর্যন্ত অদৃশ্য। চোখও নেই। নেই ঠোঁট, জিভ। চোখের ফুটো দিয়ে দেখা যাচ্ছে খুলির ভেতর পর্যন্ত। এক কণা মগজও নেই সেখানে। পুরো ব্রেনটাই অদৃশ্য!

ঠক-ঠক করে কাঁপছিলাম আমি। এক হাতে শটগান ধরে আর-এক হাতে লোকটার কোট আর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম।

রুমাল আর মানিব্যাগ ছাড়া কিছু পাইনি। মানিব্যাগে খানকয়েক কার্ড দেখেছিলাম। লোকটার ভিজিটিং কার্ড।

নাম তার, ফ্রেড স্যান্ডেজ। ঠিকানা দেখে কিছু বুঝলাম না। উলসস্থপ। বাড়ির নাম? না, জায়গার নাম?

প্রফেসরকে জিগ্যেস করতে হবে।

এপ্রিল ৭, ১৯৯২ মঙ্গলবার

প্রফেসর বললেন,—মড়া দেখে তুমি পালিয়ে এলে?

এই জন্যে প্রফেসরকে আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। টিটকিরি যখন দেন, গলায় তখন ছুরি চলে। মেজাজ ঠিক রাখা যায় না।

তা সত্ত্বেও মাথা ঠান্ডা রাখলাম।

বললাম,—উলসস্থপ কী জিনিস?

—উজবুক কি সাধে বলি?

তেতেপুড়ে এসে এইরকম অভ্যর্থনা?

গলা চড়িয়ে বলেছিলাম,—প্রফেসর, আমি কিন্তু ভয়ে আধখানা হয়ে রয়েছি।

আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বুড়ো বললে,—দেখে তো মনে হচ্ছে না। হাজার হোক, তুমি হলে গিয়ে গ্রেট দীননাথ নাথ—তবে হ্যাঁ, তোমাকে বলেছিলাম যা দেখবে, তা খুঁটিয়ে লিখবে।

—লিখেছি।

—যা দেখোনি—সেটা তো খুঁটিয়ে লেখা উচিত ছিল না।

—যা দেখিনি...মা-মানে? অদৃশ্য জিনিসকে?

তোমার মুন্ডু। —রক্ত দেখেছ?

—র-রক্ত।

মুখ থেকে চামড়া, খুলি থেকে ব্রেন, কোটর থেকে চোখ—সব উপড়ে নিয়ে গেছে—রক্ত ফেলে যায়নি?

হাঁ করে তাকিয়েছিলাম প্রফেসরের স্থির দুটো চোখের দিকে। সত্যিই তো, অমন পরিপাটিভাবে ছাল ছাড়ানোর পর তো রক্ত লেগে থাকা উচিত, সাদা কোট-প্যান্টে।

চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল সাহেবের কোট আর শার্ট। দুটোই ধবধবে সাদা। এক ফোঁটা রক্তও পড়েনি।

হতভম্ব হয়ে চেয়ে রয়েছি দেখে মনটা বোধহয় নরম হল প্রফেসরের। চাহনিও আর হৃদয়-কোঁড়া রইল না।

বললেন,—চলো, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসি।

আঁতকে উঠেছিলাম,—ওই জঙ্গলে? অ্যাদ্দিন পর? ডেডবডি থাকবে?

কী গোঁয়ার প্রফেসর, কোনও কথা শুনলেন না।

এপ্রিল ১৪, ১৯৯২ শনিবার

জঙ্গলের দিকে এইটাই শেষ গ্রাম। আদিবাসীদের গ্রাম। রামনবমীর পুজো চলছে সকাল থেকে।

মোড়লকে পাকড়াও করে গাছতলার বেদিতে ঘন্টাকয়েক বসেছিলেন প্রফেসর। পাশে আমি।

অনেক খবর পাওয়া গেল। ফ্রেড স্যাভেজ সাহেব দিন দশেক আগে এখানে এসেছিল। জিপে চেপে। নিজে চালিয়ে। ঝোপের মধ্যে রয়েছে সেই জিপ। আমরা দেখলাম গাছতলায় বসেই।

সাহেবের কথা কিছু বোঝেনি মোড়ল। সঙ্গে একটা লোক ছিল, বাঙালিবাবু। সেই লোকটাই বলেছিল, সাহেব ওই জঙ্গল দেখতে এসেছে। একা যাবে।

মোড়ল বারণ করেছিল। মাস কয়েক ধরে যে উৎপাত চলছে জঙ্গলের চারপাশের গ্রামগুলোয়—নিশ্চয় তার গোড়া রয়েছে জঙ্গলের মধ্যে।

প্রফেসর বললেন,—গ্রামকে-গ্রাম ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে রাতারাতি—গরু-ছাগল অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে—অথচ খুঁটিতে বাঁধা রয়েছে গলার দড়ি—ফাঁস পর্যন্ত এঁটে বাঁধা—ঠিক যেন মুন্ডুটা সরু হয়ে গিয়ে ফাঁসের মধ্যে দিয়ে গলে বেরিয়ে গেছে—এই তো?

মোড়ল অবাক হয়ে বললে,—আপনি জানেন?

—গোটা পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা জেনে ফেলেছে। তা সেই বাঙালিবাবুটা কোথায়?

আমার দিকে আঙুল তুলে মোড়ল বললে,—ইনি যেদিন এলেন, তার আগের দিন তিনিও গেলেন জঙ্গলে—সাহেবকে খুঁজতে।

—ফিরে আসেননি?

—না। এই বাবুকে অত কথা বলিনি। জঙ্গলে যেতে শুধু বারণ করেছিলাম। তা উনি শোনেন নি। ফিরে এলেন পাগলের মতো। আমাদের কারুর সঙ্গে কথা বললেন না। ঢক-ঢক করে জল খেয়েই পালিয়ে গেলেন।

পালিয়ে যাইনি,—গম্ভীরভাবে বললাম প্রফেসরকে দেখিয়ে,—এঁকে ডাকতে গেছিলাম।

মুচকি হেসে মোড়ল বললে,—কিন্তু আপনার কাছা খুলে গেছিল—বুঝতেও পারেননি।

প্রফেসর তাড়াতাড়ি বললেন,—আমরাও যাচ্ছি জঙ্গলে।

চোখ কপালে তুলে মোড়ল বললে,—পাগল নাকি!

ফ্রেড স্যান্ডেজের ডেডবডির কাছে প্রফেসরকে নিয়ে এসেছিলাম কিছুক্ষণ পরে।

নতুন একটা দৃশ্য দেখলাম।

সাহেবের কোট-প্যান্ট মোজা জুতো যেমন তেমনি আছে—একটুও সরে যায়নি বা লাট খায়নি।

নেই শুধু গায়ের চামড়া আর মাংস।

শুধু কঙ্কাল। রক্ত-টক্ত কিছু নেই।

চিবুক খুঁটতে-খুঁটতে থমথমে জঙ্গলের দিকে চেয়ে রইলেন প্রফেসর।

এপ্রিল, ১৮, ১৯৯২ শনিবার

প্রফেসর কেরামতি দেখালেন বটে।

লোকে বিদেশ যেতে গেলে কত কাঠখড় পোড়ায়। উনি শুধু টেলিফোন তুললেন, সব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ইংল্যান্ডের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই জিগ্যেস করেছিলাম,—এখনও বলেননি উলসথ্রপ জিনিস।

অনুকম্পার চোখে চেয়ে ছিলেন প্রফেসর। আর কথা বাড়াইনি।

এপ্রিল ১৯, ১৯৯২ রবিবার

গ্রামের মধ্যে যখন গাড়ি ঢুকেছে, তখন দেখেছিলাম, একটা কাঠের সাদাসিধে ফলকে ইংরেজিতে লেখা রয়েছে, উলসথ্রপ ম্যানর।

সাহেবের ভিজিটিং কার্ডে লেখা ছিল শুধু উলসথ্রপ।

প্রফেসরের মুখের দিকে তাকালাম। চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। খিঁচুনি খাবার ভয়ে কথা বললাম না।

গ্রামটা খুব ছোট্ট। রাস্তাঘাটে লোকজন নেই। রাস্তাগুলিও খুব সরু। পাড়াগাঁয়ের রাস্তা যে রকম হয়। তবে বাংলার পাড়াগাঁয়ের মতো ময়লা ছড়ানো নয়। ঝকঝক-তকতক করছে।

গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা বড় বাড়ির সামনে। ওপরে লাল টালি। দুপাশে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। দুই প্রান্তে দুটো ইঁটের চিমনি। সামনে ছোট্ট বাগান। ফটক শেকল দিয়ে বাঁধা। একটা বোর্ডে ইংরেজিতে লেখা : এপ্রিল অবধি বন্ধ।

গাড়ি থেকে নামলেন প্রফেসর। উনি চেয়ে আছেন বাগানের একটা গাছের দিকে। আপেল গাছ। ছোট-ছোট আপেল ঝুলছে। তলায় একটা লোহার বেঞ্চি পাতা।

আমাকে বললেন,—প্রণাম করো।

আমি নিশ্চয় ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলাম। কেউ কোথাও নেই। কাকে প্রণাম করব?

উনি তা বুঝলেন। বললেন,—ওই আপেল গাছ, লোহার বেঞ্চি আর বাড়িটাকে প্রণাম করো।

—কেন?

—নিউটন জন্মেছিলেন ওই বাড়িতে। ওই লোহার বেঞ্চিতে উনি বসেছিলেন,—গাছ থেকে আপেল পড়েছিল তাঁর সামনে।

প্রণাম করলাম। সারা গায়ে রোমাঞ্চ দেখা দিল।

বললাম,—উলসথ্রপ তাহলে একটা জায়গা। নিউটনের জন্মস্থান। ফ্রেড স্যাভেজ সাহেব এই গ্রামের মানুষ?

—হ্যাঁ। এইবার খোঁজা যাক তাঁর বাড়ি।

পাশের কাঁচা গলি দিয়ে বেরিয়ে এল মাঝবয়সি এক ইংরেজ। আমাদের সামনে এসে বললে,—আর দিন কয়েক পরেই গেট খুলবে।

প্রফেসর বললেন,—জানি। কিন্তু আমরা এসেছি ফ্রেড স্যাভেজ-এর বাড়ি দেখতে।

আধবুড়ো সাহেব চোখ সরু করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বললে,—সে তো নেই।

—জানি। বাড়ির লোককে খবরটা দিতে এসেছি।

—কী খবর?

—ফ্রেড স্যাভেজ মারা গেছেন।

চমকে উঠল আধবুড়ো সাহেব। মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এখন চোখ ছলছল করছে।

ধরা গলায় বললে,—জানতাম তাই হবে। মারা গেল কোথায়?

—ইন্ডিয়ায়। আপনি জানতেন উনি মারা যাবেন?

—জানতাম। কেননা, আমি ওর ভাই। আসুন। সব বলছি।

কাঁচা গলিতেই ফের ঢুকলাম। একটু গিয়ে একটা আস্তাবল—পুরোনো। তার পেছনে একটা বাড়ি। একইরকম জীর্ণ। বাগানে আগাছা।

এই বাড়ির দোতলায় বসে শুনলাম ফ্রেড স্যাভেজ-এর কাহিনি।

ছেলেবেলা থেকেই তার মাথার গোলমাল ছিল। নিজেকে বলত, এ জন্মের নিউটন। আগের জন্মে থাকত বড় বাড়িটায়। অনেক বড় বৈজ্ঞানিক ছিল। এ জন্মেও বৈজ্ঞানিক হবে।

মা-বাপ মরা এই পাগল ভাইটাকে বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছিল জ্যাক স্যাভেজ। গাঁয়ের লোক বিদ্রূপ করত বলে ভাইকে পাঠিয়ে দিয়েছিল লিঙ্কন শহরে। তারপর যায় বার্মিংহাম-এর কাছে ওয়ারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ে। পড়াশুনোয় আশ্চর্য মেধা দেখিয়ে ফিরে এল গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু কারুর সঙ্গে মেলামেশা করত না। মাঝে-মাঝে দিন কয়েকের জন্যে উধাও হয়ে যেত। ফিরে আসত কালিঝুলি মেখে। কিন্তু কিছুই বলত না দাদাকে। চিলেকোঠার ঘরে ছোট্ট ল্যাবরেটারিতে বসে খুটখাট করত দিন-রাত।

তারপর একদিন উধাও হয়ে গেল ফ্রেড। একটা চিরকুটে শুধু লিখে গেল—ডার্বিশায়ারের আতঙ্ক এবার গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। চললাম ওদের নতুন ঠিকানায়। ডাইরি রইল। যদি মারা যাই, তাহলে পড়বে। নইলে নয়।

এই সেই ডাইরি, এই সেই চিরকুট,—বলে একটা নীল মলাট দেওয়া খাতা আর-একটা চিঠি এগিয়ে দিল জ্যাক স্যাভেজ। খাতাটা লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা। গিঁটের ওপর গালার সীলমোহর।

প্রফেসর বললেন,—আমাকে এত বিশ্বাস করে ডাইরি দেখাতে চাইছেন কেন?

—আপনি তো প্রফেসর ন্যাটবল্টু চাকরো?

অবাক হলাম আমি। প্রফেসর কিন্তু হলেন না। শুধু উচ্চারণটা শুধরে দিলেন।

জ্যাক স্যাভেজ বললে,—বোনার্জি তো আপনারই লোক? সি পি বোনার্জি?

এইবার অবাক হলেন প্রফেসর।

বোনার্জি নয়, ব্যানার্জি। কিন্তু আমি তো ও-নামে কাউকে চিনি না?

চানদ্রো পেরকাশ বোনার্জি আপনার লোক নয়?—আঁতকে উঠল জ্যাক স্যাভেজ।

ফের শুধরে দিলেন প্রফেসর,—চন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জি। এবার চিনেছি। গ্রেট ফোর-টোয়েন্টি।

—ফোর-টোয়েন্টি?

—মানে, জোচ্চোর। সে এসেছিল এখানে?

—এই তো পরশু। বললে, ফ্রেড স্যাভেজের খোঁজ করতে আপনি আসতে পারেন। আমি যেন আপনাকে আটকে রেখে দিই। ডার্বিশায়ার থেকে ফিরে আপনাকে সব বলবে।

গুম হয়ে রইলেন প্রফেসর। তারপর, যা বললেন, আমি তো তা জানতাম না।

ফ্রেড স্যাভেজ দুনিয়ার একজনকেই নিজের আবিষ্কারের কথা লিখে

জানিয়েছিলেন। সবাই ওঁকে পাগল বলেছে ছেলেবেলা থেকে। অথচ ওঁর বিশ্বাসটা বড় হয়েও যায়নি। আগের জন্মে সত্যিই আইজাক নিউটন ছিলেন। যে সমস্ত বিরাট আবিষ্কার মানুষের চিন্তাধারা পাল্টে দিয়েছে, তার সবই আঠারো মাস ধরে করেছিলেন উলসথর্প-এর এই বাড়িতে। সব ওঁর মনে আছে। কিন্তু লোকে তা বিশ্বাস করে না।

তাই মন খুলেছিলেন শুধু প্রফেসরের কাছে। চিঠিপত্র চলছে অনেক দিন ধরেই। এই জন্মে তিনি যে ভয়ানক আবিষ্কারটা করে ফেলেছেন—তা যুগ-যুগ ধরে ঘুমিয়েছিল ডার্বিশায়ারের ফেলে যাওয়া কয়লাখনিগুলোর নিচের বদ্ধ ফোকরে। ভূমিকম্প পাথরের স্তর ফাটিয়ে দিয়েছে। রাতের অন্ধকারে সেই বিভীষিকারা কায়া ধারণ করে জীবন্ত প্রাণীর হাড়মাংস শুষে নিয়েছে। নইলে তারা অদৃশ্য। তারাই এ যুগের অদৃশ্য অবতার।

তাদের খতম করার দাওয়াই বানিয়েছেন ফ্রেড স্যাভেজ। ট্রায়াল দিয়েছেন কয়লাখনির পাতালে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে অদৃশ্য অবতার।

কিন্তু তাদেরই জ্ঞাতিভাইরা দেখা দিয়েছে ইন্ডিয়ার এক জঙ্গলে। ডার্বিশায়ারে যেমন প্রতি রাতে মানুষ আর পশু অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, অথবা শুধু কঙ্কাল পড়ে থাকছিল, কিন্তু রক্ত থাকত না কোথাও—ঠিক তেমনি ঘটনা ঘটছে ইন্ডিয়ার জঙ্গলেও।

অদৃশ্য অবতাররা সেখানকার পাতাল থেকেও বেরিয়ে এসেছে। জীবন্ত প্রাণীর মগজ, মাংস, রক্ত, হাড় গ্রহণ করে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে। তারা দিনের আলো সইতে পারে না—বেরোয় শুধু রাতে।

তাদের খতম করার দাওয়াই নিয়েই ফ্রেড স্যাভেজ যাচ্ছে জঙ্গলে।

আর-এক টিন দাওয়াই রইল উলসথর্প-এর বাড়িতে। সেই সঙ্গে ফরমুলাটা। ফ্রেড যদি আর না ফেরে, প্রফেসর যেন ফ্রেড-এর চিঠি দেখিয়ে সব নিয়ে যান।

আমি বললাম,—চন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জি তাহলে এর মধ্যে ঢুকল কী করে? কে লোকটা?

প্রফেসর বললেন,—বৈজ্ঞানিক জগতের ফরমুলা চোর। ফ্রেড সাদাসিধে মানুষ। ওর খপ্পরে পড়েছিল। আমাকে কিছু বলেনি। কিন্তু সে গেল কেন ডার্বিশায়ারে?

জ্যাক বললে,—চলুন, আপনার গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাক।

থ্যাচার সরকারের আমলে ইংল্যান্ডের অনেক কয়লার খনি বন্ধ হয়ে গেছে। চেস্টার ফিল্ড গ্রামটাও খাঁ-খাঁ করছে। অথচ এক সময়ে ছিল জমজমাট মাইনিং ভিলেজ। এখন কয়লার খনির কোনও চিহ্ন নেই। ইংরেজরা ভালবাসে সুন্দর পরিবেশ। তাই কয়লার পাহাড় সরিয়ে সুন্দর সবুজ খেত বানিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এখনও ঝোপ ঢাকা গর্ত দু-একটা পাওয়া যায়। রাতের অদৃশ্য অবতাররা এই সব ফুটোফাটা দিয়ে বেরিয়ে জীবন্ত প্রাণীদের হাড়মাস খেয়ে চলেছে। এইরকমই একটা ফুটোর ধারে পাওয়া গেল চন্দ্রপ্রকাশ ব্যানার্জির মৃতদেহ।

অদৃশ্য অবতার তাকে আধ-খাওয়া অবস্থায় ফেলে গেছে। চামড়া সাফ। সাদা পাঁজরার ফাঁক দিয়ে ভেতরের দেহযন্ত্রগুলো তখনও রয়েছে।

গাড়ি থেকে টিন আর স্প্রে-গান নামিয়ে আনলেন প্রফেসর। ফ্রেড স্যাভেজ চিলেকোঠার ল্যাবরেটারিতে সিন্দুকের মধ্যে রেখে গেছিল টিনটা।

ফুটোর মধ্যে স্প্রে-গান-এর লম্বা নল ঢুকিয়ে দিয়ে স্প্রে করে দিলেন প্রফেসর।

ভক-ভক করে বিকট দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল ফুটো দিয়ে।

প্রফেসর বললেন,—ফ্রেড-এর দাওয়াই এড়িয়ে একটা দল বোধহয় ঘাপটি মেরেছিল এখানে। শেষ হয়ে গেল। এরপর?

সেই সংবাদের অপেক্ষায় রোজ সকালে কাগজ খুলে বসে থাকি। যুগ-যুগ ধরে পাতালের প্রচণ্ড চাপ আর নীরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে থেকে অদৃশ্য অবতারেরা আবার বেরিয়েছে সর্বনাশা খিদের শান্তি মেটাতে। তারা এক সূক্ষ্ম জীবাণু। প্রাচীন জীবাণু-জিন গবেষণায় পাল্টা জীবাণু বানিয়েছেন ফ্রেড স্যাভেজ।

জীবন দিয়েছেন ইন্ডিয়ার জঙ্গলে। কিন্তু সাফ করে দিয়েছেন সেখানকার অদৃশ্য অবতারদের।

কিন্তু তারা ছিল, আছে, থাকবে। তারাই মায়া-দের নিশ্চিহ্ন করেছে, বার্মুডায় জাহাজ অদৃশ্য করেছে, পৃথিবীর নানান জায়গায় যুগ-যুগ ধরে দলে-দলে মানুষ উড়িয়ে নিয়ে গেছে...

তাদের আবার ঘুম ভেঙেছে...

কিন্তু ফরমুলা রয়েছে প্রফেসরের জিম্মায়। জন্মান্তরিত নিউটনের তৈরি ফরমুলা। যার দরকার পড়বে—সেই পাবে—

চিঠি লিখবে কিন্তু আমার ঠিকানায়।...

গাছ

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি পাগল হয়ে গেলেন?

মাসকয়েক নিপাত্তা ছিলেন উনি। ফিরে এসেই আমাকে ডেকে পাঠালেন। উদভ্রান্ত চোখে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন খুঁজতে-খুঁজতে যে কাহিনিটা বললেন, তা তাঁর জবানীতে শোনাচ্ছি :

দীননাথ, ওই যে মানিপ্ল্যান্ট গাছটা দেখছ, মাসকয়েক আগে ওর সামনে দাঁড়িয়ে একটা পাথর দেখছিলাম। চ্যাটালো, চৌকোনা পাথর। ওপরে খোদাই করা একটা অদ্ভুত মূর্তি। অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পাখি। মূর্তির পাশেই একটা গাছ। কচুপাতার মতো বড়-বড় পাতা। অনেক হাজার বছরের পুরনো কারুকাজ। তাই ভেঙেচুরে খোদাইয়ের কাজ নষ্ট হয়ে এসেছে। কোণগুলোও গোল হয়ে এসেছে। উলটে-পালটে দেখে শুধু এইটুকু বুঝলাম, এ পাথরে যে কারিগরের হাতের কাজ ফুটে উঠেছে, তার জন্ম, ঈস্টার আয়ল্যান্ডে।

কেননা, এ ধরনের মূর্তিওলা পাথর পৃথিবীর বহু মিউজিয়ামে আজকাল দেখা যাচ্ছে। বেশিরভাগই নকল। মানে, সম্প্রতি পাথর খুদে তৈরি হাজার-হাজার বছরের পুরোনো বলে চালানো হচ্ছে। এ-পাথরটা কিন্তু আসল, দেখেই বোঝা যাচ্ছে। তার বিন্দুতে ওই মূর্তির প্রস্তরমূর্তি কেবল ইস্টার আয়ল্যান্ডেই আছে।

ইস্টার আয়ল্যান্ডের নাম তুমি নিশ্চয় শুনেছ। সারা পৃথিবী এখন সরগরম ইস্টার আয়ল্যান্ডের রহস্য নিয়ে। হাজার রহস্যের এই দ্বীপে অনেকে মুহ্যমানই হয়ে গেল। দ্বীপের রহস্য কিন্তু আজও কেউ বুঝে উঠতে পারেনি।

সেই দ্বীপের প্রস্তর-ফলক আমার ল্যাবরেটরিতে হঠাৎ পেলাম। সকালবেলা

মুখ-টুখ ধুয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢুকেই দেখলাম মানিপ্ল্যান্টের গোড়ায় পড়ে রয়েছে পাথরটা। অথচ তার আগের রাতেও ওখানে এরকম কোনও পাথর দেখিনি। ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ। তা সত্ত্বেও পাথরটা যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে গজিয়ে উঠেছে মানিপ্ল্যান্টের তলায়।

ইস্টার দ্বীপকে পৃথিবীর সবচেয়ে নিভৃত দ্বীপ বলতে পারো—পাণ্ডববর্জিত হলেও মানুষ সেখানে আছে; গভর্নর আছে। অনেক কুঁড়েঘর আছে। আর আছে শ-চারেক বিরাট-বিরাট রহস্যময় শিলামূর্তি। দ্বীপে দাঁড়িয়ে বাসিন্দারা চারদিকে চেয়ে চোখ চাটিয়ে ফেললেও আর কোনও দ্বীপ দেখতে পায় না ধারেকাছে—মাথার ওপর তারা আর গ্রহরাই যেন সবচেয়ে কাছের রাজ্য বলে মনে হয়। গ্রহ-নক্ষত্রদের নাম তাই তাদের বেশি জানা—পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নামের চাইতে। বহু পাতাল গুহা আছে সেই দ্বীপে—আছে মৃত আগ্নেয়গিরি—কিন্তু নেই একটাও গাছ। অথচ আমার সামনে ইস্টার আয়ল্যান্ডের পাখি-মানুষের মূর্তির পাশে খোদাই করা রয়েছে দিব্যি আস্ত একটা গাছ।

হাজার রহস্যের দ্বীপ থেকে এ কোন রহস্য এসে হাজির হল আমার ল্যাবরেটরিতে? কে এনে রাখল? ভূতে?

ইস্টার আয়ল্যান্ডের আসল নামটা কী, আজও কিন্তু কেউ তা জানে না। দ্বীপের আদিবাসিরা বলে 'রাপানুই'। গবেষকরা কিন্তু নামটাকে আদিম নাম বলে মেনে নিতে পারেননি। সবচেয়ে প্রাচীন কিংবদন্তি অনুসারে দ্বীপের নাম ছিল 'তে পিতোও তে হেনুয়া' অর্থাৎ পৃথিবীর নাভি। এটাও হয়তো আসল নাম নয়—কবিত্ব করে পৃথিবীর নাইকুণ্ড বলা হয়েছে। কেননা, পরবর্তীকালে নেটিভরাই এ দ্বীপের নাম দিয়েছে 'স্বর্গ দেখার চোখ'। অর্থাৎ ইস্টার দ্বীপ যেন একটা চক্ষু—যে চক্ষু স্বর্গ দেখতে পায়। অদ্ভুত নাম, নয় কি?

হাজার-হাজার মাইল দূরের সভ্য মানুষরা কিন্তু এ-দ্বীপের নাম দিয়েছিল ইস্টার আয়ল্যান্ড। ম্যাপে এ নাম লেখার কারণও ছিল। ১৭২২ সালের ইস্টার দিবসে ওলন্দাজ রোগেভিন সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে প্রথম পা দেয় এই দ্বীপে—ইউরোপ থেকে সেই প্রথম মানুষ নামল রহস্যময় এই দ্বীপে। ওদিককার সমুদ্রে ইউরোপ থেকে জাহাজও যেত না। এরাই গেল সেই প্রথম, পালতোলা জাহাজে। তখন সন্ধে হয়েছে। নোঙর ফেলতে-ফেলতে সবাই দেখলে দ্বীপের মানুষরা ধোঁয়া-সংকেত জানাচ্ছে। দেখাও হল দ্বীপবাসীদের সঙ্গে। জাহাজে উঠে এল অদ্ভুত মানুষগুলো। লম্বা, সুগঠিত চেহারা। সাউথ সি-র তাহিতি, হাওয়াই এবং অন্যান্য দ্বীপের পলিনেশিয়ানদের মতো গায়ের রঙ ফর্সা। আবার কালচে চামড়ার মানুষও আছে তাদের মধ্যে। আর আছে লালচে ফর্সা মানুষও—ঠিক ইউরোপের মানুষদের মতো কারও-কারও চামড়া জ্বলে গেছে রোদ্দুরে। অনেকের গালে আছে দাড়ি।

তীরের ওপর দেখা গেল তিরিশ ফুট লম্বা-বিশাল বিশাল পাথরের মূর্তি। মাথায় মুকুটের মতো বসানো পাথরের চোঙা। রোগেভিন পরে লেখেছিল, দানবিক এই সব

পাথরের মূর্তির সামনেই ওদের কবরখানা—আবার পুজো-আচ্চাও চলছে সেখানে। আগুন জ্বালিয়ে সূর্য পুজো।

ওলন্দাজ জাহাজে প্রথমে পা দিয়েছিল লম্বকর্ণ এক ধবধবে সাদা নেটিভ। মাথায় পাক্কা সাড়ে ছফুট লম্বা। কানের ফুটোয় মুঠোর মতো মোটা কাঠের খুঁটি ঢোকানো। তাই কান লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে কাঁধ পর্যন্ত। এরকম লম্বকর্ণ নেটিভ আরও অনেক দেখা গিয়েছিল সেই দ্বীপে।

দীননাথ, দ্বীপের আদি ইতিহাস তোমায় শোনাচ্ছি, পরের কাহিনিটুকু বুঝতে সুবিধে হবে বলে। প্রতিটি কথা মনে রেখো—শেষপর্যন্ত শুনে শুধু বলবে আমি এখন পাগল হয়ে গিয়েছি কিনা।

ওলন্দাজদের পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ধু-ধু প্রশান্ত মহাসাগরের এককোণে নির্জনে থেকে গিয়েছে ইস্টার আয়ল্যান্ড—কেউ আসেনি। জাহাজ আসা-যাওয়ার পথ তো সেটা নয়। এল আবার ১৭৭০ সালে—এবার স্প্যানিয়ার্ডরা। দ্বীপের নতুন নাম দিলে তারা—সান কার্লোজ আয়ল্যান্ড।

এর অনেক বছর পরে এলেন ক্যাপ্টেন কুক। দ্বীপে নেমে অবাক হলেন তিনি। বাচ্চাকাচ্চা কাউকে দেখলেন না। মেয়ে দেখলেন শুধু চারজন। এর আগে যারা এসেছিল, তারাও বাচ্চাকাচ্চা দেখেনি। তবে কি দ্বীপে বাচ্চা নেই? মেয়েরাও সংখ্যায় কম? ক্যাপ্টেন কুকের কিন্তু সন্দেহ হল। দ্বীপময় ছড়ানো চারশো দানবিক মূর্তির আশেপাশে ছড়ানো বিস্তর গুহা তিনি দেখেছিলেন। আর ছিল উলটোনো নৌকোর মতো কুঁড়ে—জানলা-টানলার বালাই নেই। কুঁড়েঘরগুলোয় উঁকিঝুঁকি মেরে বাচ্চা বা মেয়েদের তিনি দেখতে পেলেন না। এ তো বড় জবর রহস্য! হঠাৎ তাঁর খেয়াল হল, পাতাল সুড়ঙ্গ নেই তো আশ্চর্য এই দ্বীপে? খুঁজে-খুঁজে সত্যিই অনেকগুলো পাতাল-সুড়ঙ্গের প্রবেশপথ তাঁর চোখে পড়ল। কিন্তু আদিবাসীরা সে সব সুড়ঙ্গের ধারে-কাছেও ঘেঁষতে দিলে না ক্যাপ্টেন কুককে। নিরুপায় হয়ে বিদায় নিলেন ক্যাপ্টেন কুক।

এরপর এল ফরাসিরা। তারাও এসে দেখল সেই একই দৃশ্য। গাছপালাহীন রহস্য-দ্বীপে বাচ্চাকাচ্চা, মেয়েরাও যেন নেই। তারপর এল আমেরিকান আর রাশিয়ানরা। আস্তে-আস্তে সভ্য মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ইস্টার আয়ল্যান্ড। আবিষ্কৃত হল অনেকগুলো রন্ধ্রপথ—পাতালে গোলকধাঁধার মতো সুড়ঙ্গ। বিদেশি দেখলেই বাচ্চাকাচ্চাদের নিয়ে মেয়েরা লুকিয়ে থাকে এখানে।

ইস্টার দ্বীপের হাজার রহস্য নিয়ে এখন পৃথিবী তোলপাড়। আমি তাই এ দ্বীপের অনেক রহস্যের খবর রাখতাম বলেই পাথরের ফলকটাকে আমারই ল্যাবরেটরিতে দেখে হ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম।

দীননাথ, এর পরে যা ঘটল, তা অবিশ্বাস্য। কিন্তু আমার অলৌকিক অবিশ্বাস্য কাহিনির সঙ্গে তুমি জড়িয়ে আছ বলে তোমাকেই শুধু বলব সেই ব্যাপার।

আগেই বলেছি, তখন সকালবেলা। খুব সকালবেলা। তুমি যখন নাক ডেকে ঘুমোও, সেই সকালবেলা। সাত-সকালে ওঠা আমার অভ্যেস। তাই সূর্য ওঠবার আগে

এসেছিলাম ল্যাবরেটরিতে। ফুরফুর করে হাওয়া দিচ্ছিল। শিরশির করে কাঁপছিল মানিপ্ল্যান্টের পাতা। হঠাৎ আমার গায়ের লোমগুলোও কেমন যেন শিরশির করে উঠল। ভাবলাম, ভোরের হাওয়ায় এমন হচ্ছে। কিন্তু শিরশিরানি ভাবটা যেন বেড়েই চলল। সেই সঙ্গে খুব মৃদু কারেন্টের চিড়িক মারতে লাগল যেন হাতের চেটোতে—মনে হল,—দীননাথ হেসো না—মনে হল যেন পাথরের ফলকটা থেকে কারেন্ট বেরিয়ে ঢুকেছে আমার শরীরে। গা-মাথা ঝিমঝিম করছে কারেন্টের ঢেউয়ে। আরও মনে হল, মানিপ্ল্যান্টটা যেন জীবন্ত প্রাণীর মতো হঠাৎ খুব বেশি দুলে-দুলে উঠছে। আর...আর যেন প্যাট-প্যাট করে চেয়ে আছে আমার পানে।

জানি, তুমি বলবে আমার পেট গরম হয়েছিল, রাত জেগে গবেষণা করে মাথায় চর্কি দিচ্ছিল। নইলে এমনধারা চিন্তা মাথায় আসবে কেন? গাছের চোখ নেই, কান নেই, জিভ নেই, নাক নেই, চামড়া নেই। তা সত্ত্বেও গাছের জীবন তো আছে। কিন্তু যাদের চোখ নেই, তারা প্যাট-প্যাট করে চেয়ে দেখতে পারে—এমন অদ্ভুত কল্পনা স্যার জগদীশ বোসও করেননি। কিন্তু সেই মুহূর্তে এই অসম্ভব কল্পনাটাই শিউরে দিয়ে গেল আমার দেহ-মন-মস্তিষ্ককে। স্পষ্ট অনুভব করলাম—কেন অনুভব করলাম, তা তোমায় ব্যাখ্যা করতে পারব না—ধৈর্য ধরে এই কাহিনির শেষপর্যন্ত শুনলে হয়তো বুঝতে পারবে—স্পষ্ট অনুভব করলাম, মানিপ্ল্যান্ট তার চক্ষুহীন প্রত্যঙ্গ দিয়ে নির্নিমেষ নয়নে দেখছে আমার শিউরে ওঠা চেহারাখানা।

তারপর আর কিছু মনে নেই আমার। মানিপ্ল্যান্ট মুছে গিয়েছিল চোখের সামনে থেকে। মাথা টলে যাওয়ার জন্যই বোধ হয় বসে পড়েছিলাম মেঝের ওপর। সম্বিত ফিরে পাওয়ার পর ওইভাবেই বসে থাকতে দেখেছিলাম নিজেকে।

কিন্তু তার আগে সিনেমার দৃশ্যের মতো অনেকগুলো ছায়াছবি ভেসে গিয়েছিল চোখের সামনে দিয়ে। তার কিছু-কিছু এখনেই তোমাকে বলেছি। ওলন্দাজদের ইস্টার দ্বীপে আবির্ভাব থেকে আরম্ভ করে ইদানিংকালের থর হেইয়ারডালের অভিযান পর্যন্ত সবক'টি দৃশ্য যেন হুস করে ভেসে গেল চোখের সামনে দিয়ে। বারবার ভেসে উঠল দানবিক মূর্তি-ছাওয়া ইস্টার দ্বীপের দৃশ্য। সবক'টা মূর্তিই সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। গাছপালার চিহ্ন নেই ন্যাড়া দ্বীপে। শুধু মূর্তি আর মূর্তি। মাথার ওপর আকাশে ঝিকিমিকি তারা—দিগন্ত জোড়া অথই সমুদ্র—যে সমুদ্র পেরিয়ে সভ্যদেশে যাওয়ার মতো বড় জাহাজও নেই দ্বীপবাসীদের—আছে কেবল গুটিকয় ডিঙিনৌকো।

আচমকা লম্বকর্ণ একটা মূর্তি আবির্ভূত হল আমার মনের চোখে, ধবধবে সাদা গায়ের রঙ—ঠিক সাহেবের মতো। মাথায় আশ্চর্য লম্বা—সাড়ে ছফুট তো বটেই। গালে সাদা দাড়ি। খালি গা পরনে নেংটি ছাড়া কিছু নেই—তাও শতছিন্ন। একদৃষ্টে সে চেয়ে রইল আমার পানে। তারপর হাত তুলল ওপরে। দেখলাম হাতের তালুতে রয়েছে পাথরের একটা ফলক—ঠিক যে-ফলক রাতারাতি আবির্ভূত হয়েছে আমার ঘরে মানিপ্ল্যান্টের গোড়ায়। ফলকটা আমাকে দেখিয়ে আকাশের দিকে তুলে কী যেন ইঙ্গিত করল লম্বকর্ণ লোকটা—কান যার ঝুলছে কাঁধ পর্যন্ত—কানের লতিতে ঝুলছে বিরাট কাঠের কুণ্ডল।

আকাশের দিকে পাথরটা তুলে ইঙ্গিত করতেই একটা বিদ্যুৎ-ঝলক যেন নেমে এল আকাশ থেকে দ্বীপের ওপর। তারপর আমার আর কিছু মনে রইল না। চোখের ধোঁয়া কেটে যাওয়ার পর হুঁশ ফিরে এল। দেখলাম, বসে রয়েছি মেঝের ওপর। হাতের মুঠোয় সেই পাথরটা। আর, হাওয়ায় অল্প-অল্প দুলছে মানিপ্লান্টের সবুজ পাতাগুলো।

আমার দেহের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে প্রচণ্ড একটা উন্মাদনা অনুভব করলাম। চুম্বকের প্রচণ্ড আকর্ষণ যেন আমাকে টানছে ইস্টার দ্বীপের দিকে। মানুষের মস্তিষ্ক আসলে কিছু নয়—কোষই সব। এ ধারণা অনেকদিন ধরেই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে। স্মৃতি এই কোষের মধ্যেই জমা থাকে—পুরুষানুক্রমে কোষের মধ্যে দিয়েই সেই স্মৃতি সারা জীবনের সঞ্চিত শিক্ষাদীক্ষা-সংস্কৃতির সাহায্যের সঞ্চারিত হয়। গাছের কোষের সঙ্গে প্রাণীর কোষের খুব একটা ফারাক নেই এ ব্যাপারে। মানিপ্লান্টের কোষগুলোই কি অতীন্দ্রিয় শক্তি দিয়ে সমাচার পাঠিয়ে দিল আমার কোষে-কোষে? কিন্তু এই পাথরের ফলকটার মধ্যে থেকে বিদ্যুৎশক্তি সঞ্চারিত হল কেন দেহের মধ্যে? কল্পনায় দেখা আকাশের ওই বিদ্যুৎঝলকের সঙ্গে এই তড়িৎ-প্রবাহের কোনও সম্পর্ক আছে আছে কি?

আছে, আছে, নিশ্চয় আছে। অলৌকিক এই বার্তা প্রেরণের মধ্যে আমি সেই গূঢ় সম্পর্কের নিশানা পেলাম। আমি যেন পাগল হয়ে গেলাম। হয়তো এখনও তাই আছি। আমার ব্রেনটা এনকেফালোগ্রাফি করে দেখবার জন্যেই তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি। তার আগেই কেন আমার এ অবস্থা হল, তা শোনাই।

নরওয়ের রাজধানী অসলো-তে পরের দিন খবর পাঠালাম। ওখানকার এক জাহাজ কোম্পানির মালিকের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ খাতির ছিল। তিনিই আমাকে একটা ডিজেল ইঞ্জিনের জাহাজ জুটিয়ে দিলেন। দেড়শো ফুট লম্বা জাহাজ। স্পিড ঘণ্টায় বারো নট। জল ধরবে পঞ্চাশ টন, আর তেল ১৩০ টন। এ দুটোরই খুব বেশি দরকার ইস্টার দ্বীপে। কেননা, সেখানে জাহাজঘাটা নেই, জল আর তেলের যোগানও নেই। যা কিছু দরকার সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। সেই সঙ্গে নিতে হল খোঁড়াখুঁড়ির সরঞ্জাম—আমার কোষগুলোই যেন তাগিদ দিয়ে আমাকে দিয়ে সব করিয়ে গেল। ইস্টার দ্বীপ আমাকে ডাকছে—কিন্তু সেখানে খোঁড়াখুঁড়ির প্রয়োজন হবে কেন তা আমার মস্তিষ্ক বুঝতে পারল না—তবুও আয়োজনে ত্রুটি রাখলাম না কোথাও। কিন্তু ইস্টার দ্বীপে খোঁড়াখুঁড়ি করতে গেলে পারমিশান লাগে চিলিয়ান গভর্নমেন্টের কাছ থেকে। সে অনুমতিও পেয়ে গেলাম নরওয়ের ফরেন অফিসের দৌলতে। শর্ত রইল কেবল একটা—রহস্যময় দ্বীপের কোনও প্রাচীন মূর্তির ক্ষতি না করে, খোঁড়াখুঁড়ি করতে হবে। গ্রেট বৃটেন আর ফ্রান্সও পারমিশান দিলে তাদের অন্যান্য দ্বীপে জাহাজ চালানোর জন্যে। সব ব্যবস্থা করলাম এই কলকাতায় বসে। তারপর একদিন প্লেনে চেপে হাওয়া হয়ে গেলাম।

ইস্টার দ্বীপে জাহাজ পৌঁছল রাত্রে। গভর্নরের বাড়ি আর গ্রামটা যেদিকে—

সেদিকে নয়। ক্যাপ্টেন বললে, পরের দিন সকালে জাহাজ নিয়ে যাবে সেখানে। না হলে এই রাত্রে তাদের উদ্ধার করা হবে।

ডেক-চেয়ারে শুয়ে আকাশের তারার দিকে তাকিয়েছিলাম, তারপর চোখ নামিয়ে আনলাম দূরের ইস্টার দ্বীপের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগেই দূর থেকে দেখেছিলাম ধূসর-সবুজ পাথর—উপকূল বরাবর পাথরের প্রাচীর বলে মনে হয় দূর থেকে। মরা আগ্নেয়গিরির ঢালু গায়ে সারি-সারি দাঁড়িয়ে আছে দানবিক প্রস্তর মূর্তি। লাল আকাশের পটভূমিকায় যেন কালো দৈত্য। স্কিপার ঠিক তখনি নোঙর ফেলেছিল।

রেলিংয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখে নিয়েছিলাম জনহীন দ্বীপের চেহারা। ইস্টার দ্বীপটা অনেকটা নিমকির তেকোনা, আমরা পৌঁছেছি একদম ডানদিকের কোণে। দূর থেকে নিশ্চল পাথুরে মূর্তির মাথাগুলো নিষ্পলকে যেন চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। জমাট লাভার বিরাট-বিরাট চাঁইগুলো যেন একটা মৃত জগতের শেষ চিহ্ন। এক সময়ে যেন ওই দ্বীপে প্রাণের স্পন্দন ছিল—এখন সব নিথর, নিস্তব্ধ, নিষ্প্রাণ।

অথচ এই দ্বীপই অলৌকিক আকর্ষণে আমাকে টেনে এনেছে সুদূর কলকাতা থেকে।

লাল টকটকে সূর্য ডুবে যাওয়ার আগেই দেখে নিয়েছিলাম এই দৃশ্য। তারপর ডেক-চেয়ারে শুয়ে আকাশের দিকে চেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ পরে চোখ নামিয়ে দ্বীপের দিকে চাইতেই আবার দেহের প্রতিটি কোষের মধ্যে অনুভব করলাম এই শিরশিরানি—কলকাতায় মানিপ্লান্টের সামনে দাঁড়িয়ে যে ঝিম-ঝিম ভাব জাগ্রত হয়েছিল অণু-পরমাণুর মধ্যে—অবিকল সেই উপলব্ধি।

একটা বিচিত্র, অব্যাখ্যাত আকুতি জাগ্রত হল আমার মধ্যে। ওই দ্বীপে আমাকে এখুনি যেতে হবে—দেরি নয়...দেরি নয়। না...না...ওই দ্বীপে নয়। নিমকির মতো দ্বীপের যে প্রান্তে আমরা এসেছি—যেতে হবে তার বাঁদিকের প্রান্তে। সেখানে আছে আরও তিনটে টুকরো দ্বীপ। ভারতবর্ষের তলায় যেমন শ্রীলঙ্কা—অনেকটা সেইরকম। তিনটে দ্বীপের সবচেয়ে ছোটটার নাম মোটু কাওকাও, মেজটার নাম মোটুইটি, বড়টার নাম মোটুনুই।

এই মোটুনুই দ্বীপের আরেকটা নাম আছে—পাখি-মানুষের দ্বীপ। আমার সত্তার মধ্যে অদ্ভুত আহ্বানটা জেগে উঠল এই পাখিমানুষের দ্বীপ থেকে। এখুনি আমাকে যেতে হবে সেখানে—এখুনি...এখুনি।

ক্যাপ্টেনকে ডাকলাম। হুকুম দিলাম। সে কী শুনতে চায়! এখানকার সমুদ্র তাঁর জানা নেই। চোরাপাহাড় থাকতে পারে। রাতবিরেতে জাহাজের তলা ফেঁসে যেতে পারে তো।

আমি কিন্তু অটল। পাগলের মতো ধমকে উঠে বলেছিলাম,—এখুনি, এখুনি...কোনও কথা শুনতে চাই না...এখুনি নামতে হবে আমাকে মোটুনুই-তে।

এখুনি নামবেন? —চোখ কপালে তুলে বলেছিল ক্যাপ্টেন, দ্বীপ পৌঁছনোর খবরটা গভর্নরকে না দিয়েই?

সে দায়িত্ব আমার!—খিঁচিয়ে উঠেছিলাম আমি। ক্যাপ্টেন আমার চোখমুখের চেহারা দেখেই বোধহয় আর কথা বললে না। সেই রাতেই জাহাজ নিয়ে রওনা হলেন পাখিমানুষের দ্বীপের দিকে। আমি ডেক-চেয়ারে চেয়ে রইলাম আকাশের তারাগুলোর দিকে। মনের চোখে বার-বার ভেসে উঠতে লাগল একটা সাদা বিদ্যুৎঝলক—কলকাতায় মনিস্লাটের সামনে দাঁড়িয়ে মুহ্যমান অবস্থায় যা দেখেছিলাম!

খুব সাবধানে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে গেল ক্যাপ্টেন। মোটুনুই দ্বীপে যখন পৌঁছলাম—তখন ভোর হতে বেশি দেরি নেই। এত সাবধানে ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগুলে দেরি তো হবেই।

তৎক্ষণাৎ লাইফবোট নিয়ে আমি নেমে গেলাম দ্বীপে। একজন ছাড়া কাউকে সঙ্গে নিলাম না। ক্যাপ্টেনকে বলে গেলাম কর্তব্য করতে। জাহাজ নিয়ে যেন গভর্নরের দপ্তরে গিয়ে খবরটা নিয়ে আসে যে আমি পৌঁছে গেছি। সন্ধে নাগাদ ফিরে এলেই হবে।

যাকে সঙ্গে নিলাম, তার নাম গুরাডিংগা। পলিনেশিয়ান। তাহিতি দ্বীপপুঞ্জের মানুষ। নরওয়ে থেকে জোগাড় করেছিলাম—ইস্টার দ্বীপের লোকদের পলিনেশিয়ান ভাষার তর্জমা করে আমাকে শোনাবে বলে। কিন্তু তার দরকার হয়নি। কেন দরকার হয়নি, তা মন দিয়ে অবিশ্বাস্য এই কাহিনির শেষটুকু শুনলেই বুঝবে।

গুরাডিংগা পলিনেশিয়ানদের মতোই লম্বা, তামাটে গায়ের রঙ। ডাকাবুকো চেহারা। গাঁইতি-টাইতি নিয়ে একাই নৌকো বেয়ে নিয়ে গেল আমাকে মোটুনুই দ্বীপে। আমি উন্মাদের মতো চেয়ে রইলাম কেবল। কোথায় যাব, কেন যাব—কিছু জানি না। শুধু জানি, যেতে আমাকে হবে। হবেই। যেভাবে হোক। একরত্তি সমুদ্রঘেরা এই দ্বীপ আমাকে ডাকছে...ডাকছে।

মোটুনুই দ্বীপে কিন্তু একটাও দানবিক স্ট্যাচু নেই। তবুও যখন মন টানছে ওইদিকেই, তখন শুধু এইটুকুই বুঝলাম যে মূর্তিরা আমাকে টানছে না—টানছে অন্য কেউ। সে কে, না গেলে জানা যাবে না। অথচ এই মূর্তি সম্বন্ধে কত রোমাঞ্চকর গল্পই না আসবার পথে শুনেছি গুরাডিংগার মুখে। মূর্তিগুলো নাকি নিরেট পাথরের নয়, ফোঁপরা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে রহস্যময় যে পাখিমানুষরা এ দ্বীপে রাজত্ব করে গেছে, তাদের রাজাদের নাকি রাখা হয়েছে এক-একটা মূর্তির মধ্যে। এক-একটা মূর্তি এক-একজন রাজার জন্যে। মৃত্যুর পর অবশ্য। যেমন মিশরের পিরামিডে সেই দেশের রাজারাজড়াদের কবর দেওয়া হয়েছে—সেইরকম। তাই আজও ইস্টার দ্বীপের মানুষরা দেবতাজ্ঞানে পুজো করে স্ট্যাচুগুলোকে। পাখিমানুষদের আসল চেহারা নাকি দেখা যাবে মূর্তিগুলো ভাঙলে। তারা মরেও নাকি মরেনি—সময় এলে একে-একে সব জেগে উঠবে। দানবিক মূর্তিগুলো তখন দিগ্বিজয়ে বেরবে। ইস্টার দ্বীপ হবে তাদের পৃথিবীজোড়া সাম্রাজ্যের রাজধানী। পৃথিবীর নাভি। এবং স্বর্গ দেখার চোখ।

উদ্ভট এই গালগল্প কেবল শুনে গেছি। মন্তব্য করিনি। দ্বীপের পাথরের স্ট্যাচুর ক্ষতি করব না—এই কথা দিয়ে তবে তো এ দ্বীপে আসবার অনুমতি পেয়েছি। কাজেই

কী দরকার মূর্তি রহস্য নিয়ে অযথা মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে। ইস্টার দ্বীপের হাজার রহস্যের একটা রহস্য হয়েই থাকুক এই মূর্তি-রহস্য। আমি শুধু মীমাংসা করতে চাই একটা রহস্যের। পাখি-মানুষ খোদাই করা পাথরের ফলক হাতে নিয়ে কেন সম্বিৎ হারিয়েছিলাম, কেন লম্বা কানওয়ালা লোকটা হুবহু একই পাথরের ফলক আকাশের দিকে তুলতেই বিদ্যুৎঝলক দ্বীপের ওপর নেমে আসতে দেখেছিলাম যেন স্বপ্নের মধ্যে, কেন মানিপ্ল্যান্ট শিউরে-শিউরে উঠে শিহরণ জাগিয়েছিল আমার লোমকূপে-লোমকূপে—কেন মনে হয়েছিল সবুজ গাছটা চক্ষুহীন প্রত্যঙ্গ মেলে চেয়ে আছে আমার পানে। এই এতগুলো 'কেন' র জবাব পেলেই আমি ফিরে যাব কলকাতায়—হাজার রহস্য নিয়ে মাথা ঘামাক অন্য সবাই।

পাখিমূর্তি খোদাই করা পাথরের ট্যাবলেটটা হাতে নিয়ে পা দিলাম দ্বীপে। আশা করেছিলাম, মূর্তির পাশে খোদাই করা গাছটা এবার দেখতে পাব। কিন্তু গোটা ইস্টার দ্বীপের মতো মোটুনুই দ্বীপটাও বেবাক ন্যাড়া। ঘাস পর্যন্ত নেই কোথাও। পাথর আর পাথর। ধূসর-সবুজ খোঁচা-খোঁচা আগ্নেয়পাথরে মাটি নেই কোথাও। গাছ জন্মাবে কী করে। তাছাড়া যেখানে মাটি নেই, সেখানে খোঁড়াখুঁড়ি করেই বা পাব কী। তবুও কেন খোঁড়াখুঁড়ির তাগিদটা মনের ভেতর থেকে আমাকে পাগল করে ছেড়েছে, সেটাও একটা রহস্য।

দ্বীপের মাঝামাঝি জায়গায় পাথরের অনেকগুলো টিলায় খোঁড়াখুঁড়ির চিহ্ন অবশ্য লক্ষ করলাম। আগের অভিযাত্রীরা ডিনামাইট দিয়ে পাথর উড়িয়ে হাজার রহস্যের সন্ধান করেছে। পেয়েছে কি না জানি না। আমার হাতে ধরা পাথরের ফলকটা যেন চুম্বকের মতো টেনে নিয়ে চলল তার পাশ দিয়ে আরও পেছন দিকে।

ওরাউংগা চলেছে পেছন-পেছন। ওর মুখে ভয়ার্ত দৃষ্টি। দিনের বেলাতেও গা ছমছম করছে যেন। আমার চোখমুখের অবস্থা দেখেও ভয় পেতে পারে। আমি হাঁটছি তো সম্মোহিতের মতো। কীসের টানে এগিয়ে যাচ্ছি, তা নিজেও জানি না।

দূর থেকে দেখলাম একটা গ্রানাইট-স্তূপ। বড়-বড় দোতলা তিনতলা কতকগুলো আলগা পাথর যেন ওপর-ওপর পড়ে। এমনভাবে রয়েছে যে, পাথর বেয়ে ওপরে ওঠা যায় না। তেলতেলে মসৃণ পাথরের গায়ে পা রাখবার জায়গা পর্যন্ত নেই।

চুম্বকের টানে লোহা যেমন ছুটে যায়, আমিও তেমনি অজ্ঞাত সেই আকর্ষণে এসে দাঁড়ালাম এই গ্রানাইট-স্তূপের সামনে। দুটো বড় পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে আমার মন বলল, এই পাথর ভেদ করে এবার আমাকে ভেতরে ঢুকতে হবে। পাতালে কিং কে জানে। অত জানবারও দরকার নেই। পাথর উড়িয়ে ভেতরে পথ করে নিতে হবে।

পাথরের ফাঁকটা দেখিয়ে ওরাউংগাকে বললাম,—চালাও গাঁইতি।

বিদ্যুতের মতো দূরের মরা আগ্নেয়গিরি রানো কাও-র দিকে একবার চেয়ে নিয়ে বোধহয় প্রতিবাদ করতে গেল ওরাউংগা—আমি অধীর হয়ে শুধু বললাম,—চালাও গাঁইতি।

মরিয়া হয়ে গাঁইতি মাথার ওপর তুলে পাথরের জোড়ে ঠকাং করে মারল

ওরাউংগা। আগুনের ফুলকি ছিটকে গেল। এক চিলতে পাথরও খসানো গেল না। আবার গাঁইতি মাথার ওপর তুলে ঠকাং করে মারল ও। আবার...আবার...

পর-পর সাতবার ঠকাং-ঠকাং করে মারবার পর ভোজবাজির মতো ব্যাপারটা ঘটল। আচমকা পাথরে-পাথরে ঘষাঘষির কড়-কড় শব্দ তুলে দুটো পাথর যেন দুদিকে হেলে পড়ল। গাঁইতির ঘায়ে যে অত বড় পাথরদুটো গড়িয়ে যায়নি, তা বুঝলাম। বুঝেও পা বাড়ালাম হাঁ হয়ে যাওয়া প্রবেশ পথের দিকে—কেননা ঠিক সামনেই দেখলাম একটা সুড়ঙ্গের অন্ধকার মুখ।

এই সময়ে ওরাউংগার পক্ষে যা শোভন নয়, ঠিক তাই করে বসল। পেছন থেকে খপ করে আমার হাত চেপে ধরল। ও বুঝেছে, এবং স্বচক্ষে দেখেছে—হাজার রহস্যের দ্বীপের একটা রহস্য—মুখব্যাদান করেছে আমার সামনে—হয়তো আমাকে গিলে খাবার জন্যে। তাই সব কিছু ভুলে গিয়ে পথ আটকাতে গেল আমার।

আমি কিন্তু খেপে গেলাম। জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে গেলাম। ওরাউংগার সঙ্গে পারব কেন। ও আমাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল পাতাল সুড়ঙ্গের সামনে থেকে। আমি তখন উন্মাদ। তাই যা কখনও ভাবতে পারি না—তাই করে বসলাম। ওর গাঁইতিটা হাতে ঠেকতেই দুহাতে তুলে নিয়ে ওর পায়ের দিকে লক্ষ্য করে কোপ মারলাম।

চক্ষের নিমেষে আমাকে ছেড়ে দিয়ে ছিটকে গেল ওরাউংগা। তাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়লাম আমি। গাঁইতির ধারালো ফলা ঘাঁচ করে বসে গেল আমারই ডানহাতের চেটোতে।

আমি তখন কাণ্ডজ্ঞানরহিত। বাহ্যজ্ঞানশূন্য। রক্তাক্ত ডানহাত শূন্যে তুলে, বাঁহাতে পাখিমানুষ আঁকা পাথরের ফলকটা বগলে ধরে তীর বেগে দৌড়ে ঢুকে গেলাম পাতাল-সুড়ঙ্গে।

অন্ধকার...অবর্ণনীয় অন্ধকার ভেতরে। আমি কিন্তু সেই অন্ধকারের মধ্যেই এতটুকু হোঁচট না খেয়ে ছুটে চলে এলাম। কয়েকবার মোড় ঘুরলাম অন্ধকারের মধ্যেই। তারপরেই দেখলাম অন্ধকারের মধ্যে আলোর নিশানা। দিনের আলো দেখা যাচ্ছে স্রেফ একটা ফোকরের মধ্যে দিয়ে।

আমি পাগলের মতো ধেয়ে গেলাম সেইদিকে। আলোটা আসছে একটা গোলাকার ফুটো থেকে। পাথরের গায়ে একটা ছেঁদা—এক বেগদা ব্যাস বড়জোর—তার বেশি নয়। হাঁটু সমান উঁচু। আমি হাঁপাতে-হাঁপাতে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম এই ফুটোর সামনে।

অমনি টের পেলাম আনতোভাবে কে যেন বসে পড়ল আমার পাশে।

নিঃসীম অন্ধকারে চোখ চালালাম। আমার ডানদিকে আমারই কায়দায় হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে একটা মনুষ্যমূর্তি। খুব লম্বা পুরুষ। খালি গা। ফুটো দিয়ে আসা আলোর আভায় তার মুখের একটা পাশ কেবল স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কানটা অদ্ভুত লম্বা। ঘাড় পর্যন্ত লুটোচ্ছে। লতিতে মুঠো সমান ফুটোর মধ্যে কাঠের গোঁজ ঢোকানো।

ইস্টার দ্বীপের চারশো মূর্তির বেশিরভাগ কাট এমনি লম্বা বলেই যে আমি চমকে উঠলাম, তা নয়। ঠিক এই মূর্তিই আমি দেখেছি কলকাতায় স্বপ্নের ঘোরে— মানিপ্লান্টের সামনে।

মূর্তিটা একদৃষ্টে চেয়েছিল আমার রক্তাক্ত ডানহাতটার দিকে। আবছা আলোয় দেখলাম বয়স তার অনেক। সাদা দাড়ি। লোলচর্ম, কিন্তু জরার চিহ্ন নেই। প্রাণশক্তি যেন ঠিকরে পড়ছে চামড়ার প্রতিটি ভাঁজ আর বলিরেখা থেকে। এরকম আশ্চর্য অতিবৃদ্ধ অথচ যৌবনরসে টগমল মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

অন্ধকারে তখন আমার চোখ সয়ে গেছে। মুখে কিন্তু কোনও কথা সরছে না। অতিবৃদ্ধ লম্বকর্ণ এবার সযত্নে তুলে নিল আমার ডানহাতটা। চোখের সামনে টেনে এনে ভালো করে দেখে নিয়ে আস্তে-আস্তে ফুটো দিয়ে গলিয়ে দিল ভেতরদিকে।

আমি বাধা দিলাম না। আমার কেবলই মনে হল, শেষ হয়েছে আমার এতদূর ছুটে আসা। যে প্রচণ্ড চৌম্বকশক্তি টেনে এনেছে আমাকে এত দূরে, তার উৎস রয়েছে ওই ফুটোর মধ্যে। আমার হাত প্রসারিত হল সেই ছিদ্র-পথেই।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা চিনচিনে তড়িৎপ্রবাহ অনুভব করলাম চেটোর ঠিক মাঝখানে ক্ষতস্থানের মুখে। অদ্ভুত সুখানুভূতি ওই ক্ষতমুখ দিয়ে যেন ধমনী-প্রবাহিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অস্থিমজ্জায়, রক্তপ্রবাহে। শরীর-মন যেন জুড়িয়ে গেল আমার। মিলিয়ে গেল উন্মাদনা। স্থির হলাম, চাঞ্চল্য পালিয়ে গেল।

মিনিট কয়েক হাতটা ওই ভাবে ধরে রেখে টেনে বার করে আনল লম্বকর্ণ অতিবৃদ্ধ। এক হাত দিয়ে মুছিয়ে দিল চেটোর রক্ত। আমি ম্লান আলোর আভায় দেখলাম সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

আমার চেটোয় কোনও ক্ষত নেই। ক্ষতমুখ বেমালুম জুড়ে গেছে। কাটা-ছেঁড়ার চিহ্ন পর্যন্ত নেই!

গভীর দৃষ্টি মেলে এবার অতিবৃদ্ধ চাইল আমার পানে। ইশারা করল হেঁট হয়ে ফুটোর মধ্যে দিয়ে ভেতরে দেখতে। আকাঙ্ক্ষাটা প্রবল হতে প্রবলতর হচ্ছিল আমার মধ্যে। তাই আর দ্বিতীয়বার ইশারা করতে হল না। হেঁট হয়ে, একরকম বুকের ওপর শুয়ে পড়ে, তাকালাম ফুটো দিয়ে ভেতর দিকে। ভেবেছিলাম, অদ্ভুত ভয়ংকর কিছু দেখব। কিন্তু তার বদলে এমন একটা জিনিস দেখলাম—যা ইস্টার দ্বীপে কোথাও দেখা যায় না।

একটা গাছ। ঝাঁকড়া। লতায়-পাতায় সবুজ। বড়-বড় পাতা কচুপাতার মতো বড়। অনেক উঁচুতে দেখা যাচ্ছে নীল আকাশের একটু কণা। সূর্য উঠছে। রোদের আলো কুয়োর মতো গহ্বরের ওপরের কিনারায় পড়েছে। গাছের মগডাল পর্যন্ত ততদূর ওঠেনি। ওঠেনি বলেই বাইরে থেকে এ-গাছ দেখা যায় না। গ্রানাইট-স্তূপের আড়ালে রয়ে গেছে যুগ-যুগ ধরে।

আমি কিন্তু দেখেছি এ গাছ। কলকাতায় বসেই দেখেছি। বাহাদুরের মুঠোয় ধরা পাথরের ফলকে এই গাছটারই ছবি খোদাই করা রয়েছে। বড়-বড় ওই কচুপাতার মতো পাতা এর বড় কোনও গাছে হয় বলে জানা ছিল না।

কিন্তু পাথরের ফলকটা তো হাজার-হাজার বছরের পুরনো। গাছটার বয়সও কি তাই? নাকি, এই গাছটারই পূর্বপুরুষের ছবি? এক গাছ গেছে—সে জায়গাই বীজ থেকে জন্মেছে আরেকটা গাছ? ...তাছাড়া যার আকর্ষণে প্লেনে চেপে, জাহাজে করে উম্মাদের মতো এতদূর ছুটে এলাম—সে কি নিছক একটা গাছ?

অমনি মাথার মধ্যে আবার কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। কচুপাতার মতো বড় বড় পাতাগুলো যেন দুলে-দুলে উঠল। আর স্পষ্ট মনে হল গোটা গাছটা যেন অনিমেষে চেয়ে আছে আমার পানে—ঠিক যেভাবে কলকাতার ল্যাবরেটরিতে মনে হয়েছিল মানিপ্লান্ট চেয়েছিল আমার দিকে।

এর পরেই ঘটল আরেকটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমার চোখের ভুল কি না বলতে পারব না—কিন্তু মনে হল গোটা গাছটা থেকে একটা প্রায়-অদৃশ্য রশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়ে এসে পড়ল আমার দুই ভুরুর মাঝখানে। আতস কাচ দিয়ে রোদ্দুর ফোকাস করলে যেমন দেখায়—ঠিক তেমনিভাবে যেন একটা হালকা সবুজ রশ্মি গাছটার গা থেকে মিহি বাষ্পের মতো বেরিয়ে এসে সরু হয়ে পড়ল আমার দুই ভুরুর মাঝখানে।

তারপরেই আমার সমস্ত আবোলতাবোল ভাবনাকে ডুবিয়ে দিয়ে জোরদার হয়ে উঠল কতকগুলো কথা মাথার মধ্যে। মাথার মধ্যে—কানের মধ্যে নয়। কান দিয়ে কিছু শুনলাম না। কথাগুলো যেন গুঞ্জনের মতো ভেসে-ভেসে গেল মাথার মধ্য দিয়ে।

বন্ধু, গাছটা তোমাকে টেনে এনেছে ঠিকই—কিন্তু টানিয়ে এনেছি আমরা—গ্রহান্তরের পাথিমানুষরা—যাদের ছবি তোমার হাতে ধরা পাথরের ফলকে খোদাই করা রয়েছে। গাছেরও প্রাণ আছে। আর আছে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা—যা তোমাদের নেই। তোমরা চোখ-কান-নাক-জিভ-চামড়া দিয়ে যা টের পাও—গাছেরা পায় তার চাইতেও অনেক বেশি। গাছেদের এই বিরাট ক্ষমতার কণামাত্রও তোমরা এখনও টের পাওনি—ওদের ক্লোরোফিল-রহস্য পর্যন্ত আজও ধরতে পারনি। গাছ তাই তোমাদের কাছে যতটা রহস্য—আমাদের কাছে তা নয়।

গাছেদের কসমিক রশ্মিগ্রহণ ক্ষমতা আছে। দূর-দূর গ্রহ থেকে পাঠানো খবর গ্রহণ করার-মতো ক্ষমতাও আছে—যে ক্ষমতা তোমাদের তৈরি কোনও রেডিওর নেই। তাই আজও আমাদের কোনও বার্তা তোমরা ধরতে পারনি। কিন্তু ওরা পেরেছে। ওরা তাই জানে—শুধুই ওরা জানে—আমরা বার-বার আসি এই পৃথিবীতে—উড়নচাকির ধোঁকাবাজি বলে তোমরা তাকে হেসে উড়িয়ে দাও।

মহাজাগতিক রশ্মি সংহত করে নিজেদের মধ্যে রাখতে পারে বলেই গাছপালার ওষধিগুণের তুলনা হয় না। কোনও কেমিক্যাল দিয়ে যে রোগ তোমরা সারাতে পারনি—গাছপালা তা পারে—গ্রহ-নক্ষত্রের এনার্জিকে পাতায়-পাতায় আহরণ করে সঞ্চয় করে রাখতে পারে বলে। রহস্যজনক সেই ভাইটাল এলিমেন্টের কোনও হদিশ তোমরা আজও পাওনি—পেয়েছিল তোমার দেশের প্রাচীন মুনিঋষিরা—আয়ুর্বেদ পণ্ডিতেরা—জীবক তাদের একজন।

তোমার হৃদয়ের ক্ষত নিরাময় দেখে বিস্মিত হচ্ছ কি? অসাধ্যসাধন করতে পারে এই গাছেরাও যাদের তোমরা নিকৃষ্ট প্রাণীরও অধম মনে করো—নড়ে চড়ে হেঁটে বেড়াতে পারে না বলে।

কিন্তু ওদের তা দরকার হয় না। একজায়গায় থেকেই গ্রহ-গ্রহান্তরে যারা যোগাযোগ রাখতে পারে, তারা এই পৃথিবীর সমস্ত খবরই রাখে। উদ্ভিদ বা প্রাণীদের সমস্ত কোষের মূল যা—ওরা সেই মূল প্রাণশক্তি দিয়ে এক হয়ে আছে। তোমাদের খবর তো বটেই, গোটা উদ্ভিদজগতে কোথায় কী হচ্ছে—চক্ষের নিমেষে তা জেনে যাচ্ছে প্রতিটি গাছ।

এই কারণেই কলকাতার মানিপ্ল্যান্ট মারফত খবর পেয়েছিলে তুমি। একসূত্রে গাঁথা যে ওদের প্রাণশক্তি। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধ দিয়ে এখান থেকেই খবর গেছিল মানিপ্ল্যান্টে—তোমাকে আমন্ত্রণ এবং আকর্ষণ—সবই করা হয়েছে এই গাছ আর তোমার মানিপ্ল্যান্টের মধ্যে দিয়ে। পাথরের ফলকটা আমরাই রেখে এসেছিলাম তোমার ল্যাবরেটরিতে—যাতে বুঝতে পার কোথায় তোমাকে আসতে হবে।

তোমাকে এখানে টেনে আনার কারণটা এবার বলি। গাছেরা শঙ্কিত তোমাদের অদূরদর্শিতায়। এই পৃথিবীকে প্রাণের উপযোগী করে গড়ে তুলেছে শুধু গাছেরাই। আদিতে ছিল গাছ—জীবজগতের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছে তাদের জন্যেই। এরা অ্যালকেমিস্টও বটে। এক পদার্থকে ভেঙে আরেক পদার্থ বানিয়ে নিতে পারে নিজেদের মধ্যে—যা তোমরা ভাবতেও পার না। ক্রমাগত বস্তুর উৎপাদন চালিয়ে যাচ্ছে এরা। ফসফরাস থেকে গন্ধক বানাচ্ছে, ক্যালসিয়ামকে ফসফরাসে রূপান্তরিত করছে, ম্যাগনেসিয়ামকে ক্যালসিয়ামে নিয়ে যাচ্ছে, কার্বনিক অ্যাসিড থেকে ম্যাগনেসিয়াম সৃষ্টি করছে, নাইট্রোজেন থেকে তৈরি করছে পটাসিয়াম। আণবিক পরিবর্তনের গুপ্ত রহস্য এখন কেবল এরাই জানে—আর জানত তোমাদের অ্যালকেমিস্টরা—যাদের তোমরা ধাপ্পাবাজ বলে উড়িয়ে দাও।

তোমাদের অস্তিত্ব যাদের ওপর নির্ভর করছে, সেই পরম উপকারী বন্ধু গাছপালা কেটে তোমরা পৃথিবীটাকে ন্যাড়া করতে চলেছ—যেমন করা হয়েছে এই দ্বীপকে। তোমরা আণবিক বোমা ফাটিয়ে আর কলকারখানার ধোঁয়া ছেড়ে, নদীতে সাগরে কেমিক্যাল ফেলে বাতাস আর জলকে বিষাক্ত করে তুলছ। যারা তোমাদের বাঁচাতে পারে, তাদের নিশ্চিহ্ন ধ্বংস করে চলেছ।

গাছেরা তাই আবার পৃথিবী ছেয়ে ফেলবে ঠিক করেছে। আমরা তাদের সাহায্য করব। যে বীজগতি শক্তি দিয়ে তারা আণবিক পরিবর্তন ঘটিয়ে এক পদার্থকে আরেক পদার্থে রূপান্তরিত করছে—তারই নাম আণবিক শক্তি। প্রলয়ঙ্কর এই শক্তি ওদের প্রতিটি কোষে রয়েছে। তোমাদের আণবিক বোমা নিয়ে অদূরদর্শিতার সাজা ওরা দেবে এই শক্তি দিয়েই পাল্টা মার মেরে। সে যে কী ভয়ংকর সাজা, তা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না।

তোমরা বলবে, তোমার সতীর্থ বৈজ্ঞানিকদের কথা বলছি। তাঁরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ

ছাড়া আর কিছু মানতে চায় না—কিন্তু প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতাও নেই—তাই যা অপ্রত্যক্ষ, তাকেই অবৈজ্ঞানিক আর যুক্তিহীন বলেই বাহাদুরি নিতে চায়।

কিন্তু তুমি এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। হ্যাঁ, তুমি। তাই তোমাকে আমরা এনেছি নির্জন এই দ্বীপে। তুমিই একমাত্র বৈজ্ঞানিক যে অসম্ভবের মধ্যে অনেক সম্ভাবনা আঁচ করতে পারো। তাই তোমার মুখ দিয়ে সাবধান করতে চাই পৃথিবীর তাবৎ নির্বোধ বৈজ্ঞানিকদের।

গাছেরা চায় না এই সবুজ পৃথিবীর জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যাক। দানবপ্রাণীদের ধ্বংস হয়েছিল রাক্ষুসে খিদে দিয়ে এই উদ্ভিদজগৎকে শেষ করতে চেয়েছিল বলে। রহস্যজনক সেই পাইকারি মৃত্যুর কোনও কিনারা আজও তোমরা করতে পারোনি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সরীসৃপ দানবদের মতো তোমরাও যদি লুপ্ত হতে না চাও, তাহলে সাবধান হও। পৃথিবীর জল-বাতাস আর বিষাক্ত করো না। গাছপালা কেটে জঙ্গল সাফ আর করতে যেও না। যদি করো, তাহলে যা ঘটবে, তা রোধ করার ক্ষমতা কারও হবে না। তারপর বহু লক্ষ বছর পরে আবার জীবজগতের আবির্ভাব ঘটবে ঠিকই—কিন্তু তার দরকার আছে কি? সরীসৃপ-দানবদের মতো তোমরা তো বুদ্ধিহীন নও!

বন্ধু, এই আমাদের শেষ হুঁশিয়ারি। তোমার সঙ্গে আবার আমাদের যোগাযোগ ঘটবে। পৃথিবীবাসীর চেতনা উদয় করার ভার রইল তোমার ওপর।

বিদায়।

দীননাথ, এরপর আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখেছিলাম, জাহাজের ডেকে শুয়ে আছি। সকালবেলা জাহাজ নিয়ে এসে ক্যাপ্টেন আমাকে দেখেছিল তীরে শুয়ে আছি। ওরাউংগা নেই। তাকে দ্বীপের কোথাও পাওয়া যায়নি। লাইফবোটও রয়েছে—নিয়ে পালায়নি। কিন্তু রহস্যজনকভাবে সে যেন উবে গেছে দ্বীপ থেকে। একমাত্র সে-ই দেখেছে গ্রানাইটস্তূপের ভেতরে পাতাল-সুড়ঙ্গ। কিন্তু সে না থাকায় আমার কথা কেউ বিশ্বাস করেনি। তাছাড়া আমি প্রলাপ বকছিলাম। পাগলের মতো চেঁচাচ্ছিলাম। তাই ওরা আমাকে কেবিনে আটকে রেখে ফিরিয়ে আনে নরওয়েতে। সেখান থেকে রেখে যায় কলকাতায়।

দীননাথ, আমি জানি ওরা আমার ওপর চোখ রেখেছে। এই আকাশের কোথাও ওদের ঘাঁটি আছে। কিন্তু যে কাজের ভার আমাকে দিয়ে গেছে, তা করব কী করে ভেবে পাচ্ছি না। কে শুনবে আমার কথা?

কিন্তু আমি চেষ্টা করব। পৃথিবীকে মানুষশূন্য করতে আমি চাই না। তার আগে জানতে চাই, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গেছি কি না। আমার সেটা পরীক্ষা করার ব্যবস্থা করবে?

চেয়ে দেখলাম জানলার সামনে বসানো মানিপ্ল্যান্টটাকে। সবুজ পাতাগুলো থিরথির করে কাঁপছে—হাওয়ায় নিশ্চয়।

ক্রিস্টাল হেলমেট

ডাঃ শান্তনু সরখেল মনের ডাক্তার।

জন্মেছিলেন নেহাতই এক গণ্ডগ্রামে। বাবা ছিলেন সম্পন্ন চাষি। গোয়ালের গরু আর মাঠের ফসল দেখাশুনো করার জন্যে তিনি ঠিক করেছিলেন, পাঁচ ছেলের মধ্যে মেজ ছেলেকেই এই কাজে লাগাবেন। অন্য ছেলেদের চেয়ে মেজ ছেলের মাথা নাকি একটু মোটা। কিন্তু গাছে চড়তে আর মাঠে ঘুরতে পোক্ত।

কিন্তু শান্তনু সরখেলের বড়দা বাদ সাধলেন। তিনি কলকাতায় ডাক্তারি পড়তেন। মেজ ভাইয়ের বুদ্ধি কম, এটা তিনি মানতে রাজি হলেন না। ছুটিতে বাড়ি এসে যেদিন শুনলেন, গাঁয়ের মোড়লদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাবা ঠিক করেছেন শান্তনুকে চাষি বানাবেন—তারপরের দিনই ভাইকে নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন। একই মেসে রয়ে গেলেন দুই ভাই। বাবা রেগে টং হয়ে গিয়ে খরচ পাঠানো বন্ধ করে দিলেন। বড়দার তাতে বয়ে গেল। খানকয়েক টিউশনি ধরে মেসের খরচ আর পড়ার খরচ তুলে নিলেন।

মুচিপাড়ায় দেবুতলা পার্কের কোণের সেই মেসবাড়ি থেকে মাসখানেক ভয়ের চোটে রাস্তাতেই বেরোননি শান্তনু। তারপর দাদার কৃপায় একটু-একটু করে লেখাপড়ায় ডুবে গেলেন। শুরু করেছিলেন শশীভূষণ দে স্ট্রিটের কর্পোরেশন ফ্রি স্কুলে—শেষ করলেন বিলেতের কলেজে। বড় ডাক্তার হয়ে ফিরলেন কলকাতায়।

এখন তিনি লেকের পাড়ে সাদার্ন অ্যাভিনিউতে বিরাট বাড়ি বানিয়েছেন। দুই ছেলের বিয়েও দিয়ে দিয়েছেন। তারাও মনের ডাক্তারি করে।

সত্তর বছর বয়েসে শান্তনু সরখেল ঠিক করলেন, এবার অবসর নেবেন।

কিন্তু এ কি পরের চাকরি করা যে, ইচ্ছে করলেই রিটায়ার করবেন? রুগিরা তাঁকে ছাড়বে কেন? চাপের চোটে তিনি রুগি দেখা চালিয়ে গেলেন বটে—কিন্তু সংখ্যা কমিয়ে আনলেন। রোজ দশটি রুগির বেশি দেখতেন না—তাও বিশেষ ধরনের রুগি হওয়া চাই। নইলে তাঁর মন উঠবে না।

কথায় বলে, পাগলের ডাক্তাররা শেষ পর্যন্ত নিজেরাই পাগল হয়ে যায়। শান্তনু সরখেলও নিশ্চয় আধপাগল হয়ে গেছিলেন। নইলে বিশেষ ধরনের রুগি খোঁজবার জন্যে লোক লাগাবেন কেন? তাঁর মাইনে করা লোক হাসপাতাল থেকে, নার্সিংহোম থেকে, অন্ধপাড়াগাঁ থেকে বিদঘুটে রুগি ধরে আনত। তিনি তাদের নিজের মেন্টাল-হোমে রেখে বিনে পয়সায় চিকিৎসা করতেন। কাগজেও বিজ্ঞাপন দিতেন—যারা ভয়ানক মাথামোটা হয়ে জন্মেছে, যাদের লোকে জড়ভরত আর অকর্মার ধাড়ি বলে দুরছাই করে—তারা যেন তাঁর কাছে চলে আসে।

ছোট-বড় সব কাগজেই ফলাও করে তিনি বিজ্ঞাপন দিতেন। অথচ খুব একটা সাড়া পেতেন না। কারণ, সত্যিই যারা জড়ভরত তারা ওই বিজ্ঞাপনের মানে বুঝতে পারত না। তাদের আত্মীয়-স্বজনেরাও জন্ম-ইস্তক মাথামোটাদের পেছনে অহেতুক সময় নষ্ট করতে চাইত না।

মাইনে করা লোকটা চাকরি রাখবার জন্যে এন্তার বোকা আবিষ্কার করে যেত বটে, তাদের ধরে-বেঁধে নিয়েও আসত—কিন্তু ডাঃ শান্তনু সরখেল তাদের পরীক্ষা করেই বাদ দিয়ে দিতেন। কারণ, আস্ত গবেট তারা কেউই নয়—এসেছে শুধু টাকা ঘুষ খেয়ে।

গুজব জিনিসটার পাখা আছে। নিজেরাই উড়ে গিয়ে লোকের কানে ঢুকে যায়। লোকে তা বিশ্বাসও করে। শান্তনু সরখেলের সৃষ্টিছাড়া খেয়াল লক্ষ করে গুজব রটাতে লাগল তাঁরই পেশার ডাক্তাররা। ঈর্ষায় যারা জ্বলে তারাই এবার কোমর বেঁধে লাগল গুজব রটনায়। শান্তনু ডাক্তার বুড়ো বয়েসে নিজেই পাগল হয়েছেন।

নিছক রটনাই বা তাকে বলা যায় কী করে? শান্তনু ডাক্তারের কাণ্ডকারখানা তো আর স্বাভাবিক ছিল না। সাদার্ন অ্যাভিনিউর বাড়ির ছাদের তিনখানা ঘরে তিনি ল্যাবরেটরি আর মেন্টাল-হোম বানিয়েছিলেন। ছাদে ওঠার দরজায় সবসময়ে তালা লাগিয়ে রাখতেন। ছেলেদের ছাদে উঠতে দিতেন না। শুধু খাবার সময়ে নিচে নামতেন। নইলে নয়।

নিচের তলার ঘর থেকে ছেলে বউ নাতি নাতনিরা টের পেত গভীর রাতেও ছাদে পায়চারি করছেন শান্তনু সরখেল। রাত দুটো-তিনটের সময়ে শুতে নামতেন নিচের তলায়। ভোর হতে না হতেই আবার চলে যেতেন ছাদে। রুগি থাকলে তাদের খাবার-দাবার পর্যন্ত নিজে ওপরে বয়ে নিয়ে যেতেন। এঁটো বাসন নিজেই নিচে নামিয়ে দিতেন।

তারপর, যখন বিচ্ছিরি শুককীটগুলো ডানা মেলে উড়তে লাগল চারিদিকে, তখন হাজার বিজ্ঞাপন দিয়েও আর রুগি পেলেন না শান্তনু। মাইনে করা লোকটার বুজরুকি ধরতে পেরে তাকেও দূর-দূর করে তাড়িয়ে দিলেন। রুগি দেখব না—এই বায়না ধরেছিলেন যিনি সত্তর বছর বয়েসে—এখন রুগির অভাবে তিনিই বুঝি রুগি হয়ে গেলেন।

চিন্তায় পড়ল ছেলেরা। তারাও তো মনের ডাক্তার। বাবার মাথা যে বিগড়েছে, তা তারা বুঝেও কিছু করতে পারল না। কেননা, শান্তনুর মেজাজও ইদানীং বিগড়েছে। চিরকাল তিনি নরম ধাতের শান্ত পুরুষ—এখন তিনি কড়া ধাতের জবরদস্ত মানুষ। চিরকাল কথা বলতেন খুব আস্তে—এখন কথা বললে বাড়ি-ঘরদোর কাঁপতে থাকে। চিরকাল তাঁর মুখে হাসি ভাসত, চোখ স্নিগ্ধ থাকত,—এখন ঠোঁট বেঁকিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে থাকেন। কটমট করে তাকান। পাগল না হলে এমনিভাবে কেউ পালটে যায়?

মাস কয়েক পরে দেখা গেল নতুন এক উপসর্গ। সারারাত ধরে আপনমনে কথা বলে যেতে লাগলেন শান্তনু সরখেল। ছাদের বন্ধ দরজার সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছেলে বউ নাতি নাতনিরা শুনল, বাড়ির কর্তা শুধু যে নিজের মনেই বকে যাচ্ছেন, তা না, উনি যেন কার সঙ্গে কথা বলছেন। অথচ ছাদের ঘরে আর তো কেউ থাকে না, রুগি তো নেই।

নিশুত রাতে কিন্তু স্পষ্ট শোনা গেছে তিনি খুব আস্তে কথা বলে যাচ্ছেন আরও একটা লোকের সঙ্গে। ঠিক আগের মতন। শান্ত গলায়, গলা না চড়িয়ে। দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কী বলছেন। তবে কথার আভাসে বোঝা যাচ্ছে, কখনও সায় দিচ্ছেন, কখনও প্রশ্ন করছেন, কখনও জবাব দিচ্ছেন,—ভালো থাকার সময়ে রুগিদের সঙ্গে যেভাবে কথা বলতেন,—ঠিক সেইভাবে।

ভোরের দিকে হাসি-হাসি মুখে শান্তনু নেমে আসতেন নিচের তলায়। কিছু খেয়েই এক ঘুম ঘুমিয়ে নিয়ে ফের উঠে যেতেন ছাদে। ছাদের চাবি কখনও কাছছাড়া করতেন না।

তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন অনেক আগেই। বিপত্নীক মানুষটাকে দেখভাল করার ভার ছেলেদের বউদের ওপর। তিনি কিন্তু তাদের দেখলেই শুধু মিটি-মিটি হাসতেন। কোনও কথা বলতেন না।

নাতি-নাতনিরা তাঁর হাসি দেখে ভুলে যাবার পাত্র নয়। নাতির বয়স চোদ্দো, নাতনির বয়স তেরো। একজনের নাম ধুলো, আর একজনের নাম বালি। আদর করে এই নাম রেখেছিলেন শান্তনু ডাক্তার। নাতি ধুলো আর নাতনি বালি। দুজনেই তাঁর দুই চোখের মণি।

ছেলে আর ছেলের বউরা একদিন শলাপরামর্শ করে এই ধুলো আর বালিকেই লেলিয়ে দিল শান্তনুর পেছনে।

শান্তনু তখন ঘণ্টা তিনেকের ঘুম ঘুমিয়ে উঠে ছাদে যাওয়ার তোড়জোড় করছেন। এমন সময়ে ধুলো আর বালি এসে তাঁকে চেপে ধরল দুদিক থেকে।

নাতি বললে,—দাদু, আমি তো তোমার পায়ের ধুলো।

নাতনি বললে,—আর আমি তোমার দুচোখের বালি।

মতলবটা কী? —তাদের চাঁদিতে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন শান্তনু। মস্ত ডাক্তার হয়েও তিনি ধুতির ভক্ত।

বালি বললে,—গাঁড়াকলে পড়েছি।

কী গাঁড়াকল? —নাতি-নাতনিদের সঙ্গে এই সব ভাষাতেই কথা বলেন শান্তনু। পালিশ করা সমাজে যে সব শব্দ চলে না, সে সব শব্দ ফুসফুস করে বেরিয়ে আসে শান্তনুর মুখ দিয়ে, ধুলো আর বালির পাল্লায় পড়লেই। এতদিন এরা ছিল দার্জিলিং-এর হোস্টেলে। বাড়ি ছিল ঠান্ডা। এখন বাড়ি বেশ গরম।

ধুলো বললে,—গাঁড়াকলে আমিও পড়েছি দাদু।

দাদু বললেন,—কী গাঁড়াকল সেটা বলবি তো?

—বাক্যি হারিয়ে ফেলেছি।

মানে? —চোখ বড় হয়ে গেল শান্তনুর।

—পড়ার চাপেই এরকম হচ্ছে কি না জানি না—কিন্তু নতুন লোক দেখলেই সিঁটিয়ে যাচ্ছি। মুখ দিয়ে কথা বেরচ্ছে না।

—বটে! বটে! কাওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছিস?

—এগজ্যাক্টলি দাদু। বালির হয়েছে অন্য বিপদ। ও আস্তে-আস্তে মাথামোটা হয়ে যাচ্ছে।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ দাদু। কোনও ব্যাপারেই মাথা খেলাতে পারছে না। সব গুবলেট করে ফেলছে।

তাহলে তো তোদের ব্রেন পরীক্ষা করতে হয়। —বলেই যেন সামলে নিলেন শান্তনু, না, না, ব্রেন-ট্রেন ঠিকই আছে। তোরা পাঁচজনের সঙ্গে মেলামেশা বাড়িয়ে দে—সব ঠিক হয়ে যাবে।

এই অবস্থা কি কেউ ছাড়ে? ছাদে ওঠার এই তো সুযোগ! দাদুর গলা জড়িয়ে ধরে বালি বললে,—ব্রেন...ব্রেনটাই তো গোলমাল করছে দাদু...কপাল টিপ-টিপ করছে...রগ দপ-দপ করছে...মাথার মধ্যে খাঁচড়-মাঁচড় ইলেকট্রিক ফ্ল্যাশ চলছে মনে হচ্ছে।

দাদু বললেন,—লক্ষণ ভালো মনে হচ্ছে না।

—পাগল হয়ে যাচ্ছি নাকি দাদু?

বালাই ষাট! —একটু ভাবলেন, বোস।

বলেই ভোঁ করে উঠে গেলেন ছাদের সিঁড়ি বেয়ে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বসে রইল ধুলো আর বালি।

তাদের বাবা-মায়েরা ওষুধ ধরেছে দেখে, দরজা দিয়ে উঁকি দিয়েই নেমে গেল আরও নিচের তলায়। খ্যাপা বাবা তাদের দেখলেই যদি বিগড়ে যান।

একটু পরেই ট্যাঁকে চাবি গুঁজতে-গুঁজতে নেমে এলেন শান্তনু। তাঁর হাতে এখন একটা বাজারের থলি। তার মধ্যে ভারী মতন কিছু একটা রয়েছে।

থলি থেকে বের করলেন একটা হেলমেট। স্কুটারে আর মোটর সাইকেলে চড়বার সময়ে যে হেলমেট মাথায় দিতে হয় প্রায় সেইরকম। কিন্তু সারা গায়ে গোল-গোল কাচ আর যন্ত্রপাতি বসানো। অনেক বোতাম, অনেক মিটার। কম্পিউটারের সামনে টাইপরাইটারের মতন যেমন 'কি-বোর্ড' থাকে তেমনি কি-বোর্ড রয়েছে হেলমেটের পেছন দিকে। তার ওপর ছোট্ট মনিটরও রয়েছে। চলতি কথায় যাকে বলা হয় টিভি স্ক্রিন।

ধুলো আর বালি হাঁ করে হেলমেটের চেহারা দেখে নিয়ে বললে,—এটা নিয়ে কী করবে দাদু?

—তোদের মাথায় পরাব।

—কেন?

—ব্রেনগুলোর চেহারা দেখব।

—স্ক্যানিং করবে?

কী বলতে গিয়েও থেমে গেলেন শান্তনু সরখেল। ধুলো আর বালি বুঝল, দাদু আসল রহস্যে আসতে চাইছেন না। দাদু যে বদ্ধ পাগল—বাবা-মায়েদের এই বিশ্বাস তারা মানতে চায়নি। দাদুর ব্রেন যে সৃষ্টিছাড়া, তিনি যে একটা জিনিয়াস—এমটাই তারা জানে। এটাও জানে যে, জিনিয়াসদের চিরকালই লোকে পাগল বলে মনে করে এসেছে।

চোখে-চোখে চেয়ে নিল ধুলো আর বালি। দাদু তখন মাথা নিচু করে হেলমেটের কলকব্জা টিপছেন। রঙবেরঙের আলো জ্বলছে আর নিভছে। মনিটরে তেড়াবেঁকা উদ্ভট লাইন আর নকশা ভাসছে। তারপরই কোঁ-কোঁ করে একটা আওয়াজ ভেসে এল হেলমেটের ভেতর থেকে।

মুখ তুলে দাদু বললেন,—রেডি? কার ব্রেন আগে দেখব?

আমতা-আমতা করে ধুলো বললে,—দাদু ওটা কী?

—হেলমেট।

—এ কীরকম হেলমেট?

—ক্রিস্টাল হেলমেট।

হেলমেটের সারা গায়ে অনেকগুলো হীরে পান্না চুনি মুক্তোর মতন বস্তু ছিল বটে। রঙবেরঙের আলো জ্বলছে তাদের নিচে—ফলে অদ্ভুত মহার্ঘ মুকুটের মতন মনে হচ্ছে গোটা হেলমেটটাকে। এমন মুকুট এই পৃথিবীর কোনও সম্রাট কখনও দেখেননি—পেলে সঙ্গে-সঙ্গে মাথায় পরতেন নিশ্চয়।

আস্তে বললে ধুলো,—এ কীরকম ক্রিস্টাল? মণিমুক্তো বলে তো মনে হচ্ছে না।

খুট করে একটা বোতাম টিপে কৃস্টাল হেলমেটকে অন্ধকার করে দিলেন শান্তনু। বললেন,—তোদের কৌতূহল বড্ড বেশি। ছোটদের কৌতূহল না মেটানো মহাপাপ। কাউকে এ জিনিস দেখাইনি, বুঝতে পারবে না বলে। আর-একটা বিপদ আছে। ডক্টর ফ্যাচাং-এর স্পাইরা টের পেলে—

বলেই থেমে গেলেন শান্তনু সরখেল।

ধুলো আর বালি চুপ করে চেয়ে রইল। দাদুর মুখ যখন খুলেছে, একটু-একটু করে সব রহস্যই ফাঁস হবে। চাপ দিলে মুখে কুলুপ আঁটতে পারেন।

কৃস্টাল হেলমেটের গায়ে হাত বুলোতে-বুলোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন শান্তনু ডাক্তার,—তোরা এ যুগের ছেলেমেয়ে। তোদের মাথা আমার মতন মোটা নয়, তোদের বাবাদের মাথার চেয়েও ধারালো। তোরা শুনে রাখ।...সুইস আল্পস-এর নাম নিশ্চয় শুনেছিস?

গড়গড় করে বলে গেল ধুলো,—সাউথ সেন্ট্রাল ইউরোপের পর্বতমালা। আশি হাজার স্কোয়ার মাইল জায়গা জুড়ে রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের মাঝখান দিয়ে দক্ষিণ দিকে যখন গেছে—তখন তার নাম সুইস আল্পস।

দাদু বললেন,—তোর ব্রেনটা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। এত ব্যাপার জানলি কী করে?

—মুখস্থ বিদ্যে, দাদু।

—অ। এই আল্পস পর্বতমালার সৃষ্টি হয়েছিল কী করে, তা কি জানিস?

বালি বললে,—কেন জানব না? চাপের চোটে পৃথিবীর খোসা কুঁচকে গুটিয়ে ঢেউ খেলে গেছিল। চাপ এসেছিল পৃথিবীর ভেতর থেকে, বাইরে থেকে। বাইরের চাপের জন্যে দায়ী হিমবাহরা।

দাদু বললেন,—তোর ব্রেনেও ডিফেক্ট আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

ধুলো আর বালি প্রায়ই একসঙ্গে বললে,—তোমার ব্রেনের মতন।

সন্দিগ্ধ চোখে তাকালেন শান্তনু। হেলমেটটা থলির মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে বললেন,—তোরা স্পাই!

আমরা! —চোখ বড় করে বললে ধুলো।

বালি প্রায় কেঁদে ফেলে আর কী,—আমি স্পাই! এতবড় কথাটা তুমি বলতে পারলে?

—তোদের বাবা আর মায়েরা লেলিয়ে দিয়েছে। ঠিক কি না? ওরা তো আমাকে পাগল ঠাউরেছে।

আস্তে-আস্তে আর কথা বলতে পারছেন না শান্তনু ডাক্তার। চোখ শক্ত হচ্ছে, গলা চড়ছে।

দাদুর এরকম চেহারা কখনও দেখেনি নাতি-নাতনিরা। নরম ঠান্ডা স্নেহময় যে দাদুকে ধুলো আর বালি এতদিন দেখেছে—এ দাদু সে দাদু নয়। অন্য মানুষ।

ভয় পেয়ে গেল দুজনেই। মুখ শুকিয়ে আমসি। বুক ঢিপঢিপ করছে।

কড়কড়ে গলায় শান্তনু সরখেল বললেন,—ঠিকই ধরেছি। তোদের জানতে পাঠিয়েছে ওই দুটো উজবুক?

উজবুক মানে নিজেরই দুই ছেলে। তা বুঝেও ভয়ের চোটে মাথা হেলিয়ে সায় দিয়ে গেল ধুলো আর বালি।

মাথা নামিয়ে কী ভাবলেন শান্তনু সরখেল। তারপর বললেন কড়কড়ে গলায়,—ভেবেছিলাম কিছু না জানিয়েই চলে যাব। কেউ তা বুঝল না—বুঝবেও না। স্টুপিডের দল। তার ওপর পেছনে ঘুরছে ডক্টর ক্যাচাং-এরা।

ফস করে বলে উঠল ধুলো,—ডক্টর ক্যাচাং-এর ঠিকানাটা দাও না—ধ্যাচাং করে এমন ক্যারাটে ঝাড়ব—

—তোদের কম্মো নয়। ক্যাচাং এই কলকাতার মাফিয়াদের ডন। ধাপার চীনে-পাড়ায় তার ঘাঁটি কোথায়—পুলিশই তা জানে না। সে চায় আমার এই রেলেটেটা। পৃথিবীটাকে কব্জায় আনবে বলে। আর আমি চাই তাকে পৃথিবী থেকে সরাতে। না পারলে আমিই সরে যাব। আমাকে কেউ চায় না, কেউই আমাকে বুঝল না।

বলতে-বলতে গলা ধরে এল শান্তনু সরখেলের। চাহনি ঘোলাটে হয়ে এল। এমনিতেই ছানির প্রলেপ পড়ছে চোখে, এখন সেই চোখ হল ছলছলে।

বালি বললে,—দাদু, আমাদের বলো, আমরা বুঝব।

ধুলো বললে,—দাদু, তুমি যেও না।

দাদু বললেন,—আজ রাত ঠিক বারোটায় ছাদে যাবি। কেউ যেন জানতে না পারে। —প্রমিস?

—প্রমিস।

রাত এগারোটায় সারা বাড়ির আলো নিভে গেল। খাটিয়া পেতে দুটো ঘরে শুয়েছিল ধুলো আর বালি। ওরা বড় হয়ে গেছে। তিনতলার আলাদা ঘরে থাকে। রাত বারোটা বাজতেই দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ওদের ঘরের পাশেই দাদুর ঘর ফাঁকা। ছাদের সিঁড়ির দিকে এগলো পা টিপে-টিপে। সিঁড়ির মাথায় অন্ধকার। নিচের ধাপ থেকেই দেখা যাচ্ছে আবছা এক মূর্তি —দাদু দাঁড়িয়ে আছেন।

কথা বললেন না। ছাদের দরজা খুলে ছাদে গিয়ে দাঁড়ালেন। ধুলো আর বালি চৌকাঠ পেরিয়ে এল। দরজা বন্ধ করে তালায় চাবি ঘুরিয়ে দিলেন। চাবিটা ধুলোর হাতে দিলেন। বললেন, যত্ন করে রাখ।

—তোমার কাছে রাখবে না?

—না। ...থাক।

পাশাপাশি তিনটে ঘর ছাদে। সব ঘরেই আলো নিভানো। প্রথম ঘরটায় নাকি-

নাতনিকে নিয়ে ঢুকলেন শান্তনু সরখেল। আলো জ্বালালেন না। ওদের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে একটা সোফায় বসিয়ে দিলেন। নিজেও বসলেন সেই সোফায়। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল ছাদ আর আকাশ। অমাবস্যার অন্ধকারে শুধু নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে।

ঘরের কোথায় কী আছে, কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু মনে হচ্ছে, ঘরটা নিছক বসবার ঘর নয়। তার চাইতেও বেশি করে মনে হচ্ছে—ঘরে আরও কিছু আছে। এমন কিছু যা ধুলো আর বালিকে নজরে রেখেছে।

দাদুকে মাঝে বসিয়ে ধুলো আর বালি দু-পাশ থেকে তাঁর দু-হাত চেপে ধরল।

শান্তনু সরখেল বললেন,—ভয় নেই।

ঘরে আর কে আছে, দাদু? —ধুলোর প্রশ্ন।

—কে আছে, না, কী আছে?

—মা-মানে?

—জীবন্ত কেউ নেই—তবে একজন আছে।

গা হিম হয়ে এল ধুলোর। বালির অবস্থা আরও খারাপ।

শান্তনু সরখেল বললেন,—আগে আল্পস-এর গল্পটা বলে নিই। হাতে বেশি সময় নেই। তোরা তো জানিস, ইউরোপের টুরিস্টদের কাছে আল্পস একটা স্বর্গভূমি—মস্ত একটা প্লে-গ্রাউন্ড। আমি যখন ইউরোপে ছিলাম, আমিও পৌঁছেছিলাম সেখানে অ্যাডভেঞ্চার করতে। পাহাড়ে চড়ার মজা আলাদা জিনিস। সাত-আট হাজার ফুট ওপরেও বড়-বড় পাইন গাছ। বারো হাজার ফুট ওপরে তুষার। পাথরের খাঁজে-খাঁজে গুপ্তধন।

গুপ্তধন?. —ধুলোর প্রশ্ন। ভয় ভাঙছে দাদুর গল্প বলার ঢঙে।

—ঝকমকে ক্রিস্টাল। সে এক ফ্যানটাসি। না দেখলে চোখে ঘোর লাগবে না। শীতের লম্বা রাতে এই ক্রিস্টাল গুপ্তধনের খোঁজে চোরা অভিযানের গোপন প্রস্তুতি চালায় ডাকাবুকোরা। শীতের শেষে যখন বরফ গলতে শুরু করে, তখন শুরু হয় বসন্ত-অভিযান। কোথায়-কোথায় ক্রিস্টাল থাকতে পারে—সে খবর কেউ কাউকে জানায় না। কখনও-সখনও হেলিকপ্টারও কাজে লাগানো হয়। স্পাইদের ধোঁকা দেওয়া হয়। ক্রিস্টাল যেখানে দেখার—সেখানে যেন পৌঁছতে না পারে। মানুষ যেখানে যেতে পারে না—হেলিকপ্টার সেখানে পৌঁছে যায়। দু'হাজার ফুট নিচের লেভেলে আল্পস-এর যেখানে যত ক্রিস্টাল ছিল—সব লোপাট হয়ে গেছে। এখন হয়েছে ওপরের লেভেলে। হানা দেওয়া হচ্ছে সেখানেই। আল্পস-এর আশ্চর্য ক্রিস্টাল গোটা পৃথিবীকে মাতিয়ে দিয়েছে।

দম নিতে একটু থামলেন শান্তনু সরখেল। অন্ধকার ঘর এখন থমথম করছে।

শুরু করলেন,—আমি ক্রিস্টাল খুঁজতাম হিমবাহের গায়ে—গর্তে আর ফাটলের ফুটোর সন্ধিতে। পাহাড়ে চড়তে গিয়ে মরতে-মরতে বেঁচে গেছি। তবুও হাল ছাড়িনি।

একদিন একটা খোঁদলে পেলাম অদ্ভুত একতাল ক্রিস্টাল। পৃথিবীর আদিম

অবস্থায় অজানা শক্তিদের হাতে যাদের সৃষ্টি—তাদের ভেতরেও যে অদ্ভুত অলৌকিক শক্তি রয়ে গেছে তা বুঝলাম ডাক্তারি শুরু করার পর।

ম্যাগনেটিক হিলিং-এর নাম নিশ্চয় শুনেছিস। শরীরের নানান জায়গায় চুম্বক বুলিয়ে নাকি নানারকম জটিল রোগ সারিয়ে দেওয়া যায়। আমি তারই নকল আরম্ভ করেছিলাম ক্রিস্টাল বুলিয়ে। স্রেফ খেয়াল। মানসিক চিকিৎসার অঙ্গ হিসেবে। রুগি মনে করত তার মাথায় আর সারা শরীরে অদ্ভুতুড়ে মতন মন্ত্রপূত পাথর বোলানো হচ্ছে।

আশ্চর্য ব্যাপারটা লক্ষ করেছিলাম প্রথম থেকেই। প্রায় সব রুগিরই কিছু না কিছু উপকার হয়েছে। তখনই খটকা লেগেছিল আমার মনে। নিছক মনের ব্যাপার নিশ্চয় নয়—ক্রিস্টালের কারসাজি থাকাও অসম্ভব নয়। লক্ষকোটি বছর আগে তৈরি অজানা শক্তিদের কিছু-কিছু নিশ্চয় রয়ে গেছে ক্রিস্টালদের মধ্যে।

গোপনে গবেষণা শুরু করেছিলাম তখন থেকেই। কাকপক্ষীকেও টের পেতে দিইনি। রিটায়ার করতে চেয়েছিলাম এই কারণেই। খুব জটিল রুগি ছাড়া দেখতাম না শুধু একটাই মতলবে—ক্রিস্টালদের ক্ষমতা কদ্দুর যেতে পারে, তা যাচাই করবার জন্যে।

দেখলাম, এদের ক্ষমতা অসীম। নাগাল ধরবার ক্ষমতা আমার এই মোটা মাথায় নেই। তখন কম্পিউটার-এর যুগ এসে গেছে। চিপস-এর জয়জয়কার আরম্ভ হয়েছে। আমি সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে বানালাম ক্রিস্টাল হেলমেট। লক্ষগুণ বেড়ে গেল ক্রিস্টালদের ক্ষমতা।

প্রথমদিনের কথাটা বলি। গভীর রাতে ক্রিস্টাল হেলমেট মাথায় লাগিয়ে ছাদে বেরোতেই মাথার মধ্যে গুনগুন আওয়াজ শুনলাম। যেন অনেক পোকামাকড় ঘ্যানর-ঘ্যানর করছে। তারপরেই সব ঘ্যানঘ্যানানি জুড়ে-মুড়ে গিয়ে পরিষ্কার বাক্য হয়ে গেল,—পৃথিবীর ডাক্তার, তোমাকে আমরা চাই।

আমি বললাম,—তুমি কে?

কণ্ঠস্বর বললে,—নক্ষত্রলোকের বাসিন্দা। যে গ্রহের ঠিকানা এখনও তোমরা পাওনি—আমি সেখান থেকে কথা বলছি।

—আমাদের ঠিকানা পেলে কী করে?

—এই ছায়াপথের সব গ্রহের খবর আমাদের রাখতে হয়।

—সাধু। এবার বলো মতলবটা কী?

—বিজ্ঞান নিয়ে বেশি ভাবতে গিয়ে আমাদের এই গ্রহ পাগলে বোঝাই হয়ে গেছে।

—বেশ হয়েছে। চিকিৎসা করাও।

—পাগলের ডাক্তার যে নেই এখানে।

—সে কী!

—তাই তোমাকে চাই। যে ক্রিস্টাল দিয়ে হেলমেট বানালে—এই ক্রিস্টাল এ গ্রহে নেই। আশ্চর্য ওই ক্রিস্টালের শক্তি দিয়ে তুমি পাগলামি সারিয়েছ, আমাদেরও নাগাল করে ফেলেছ।

—কীভাবে?

—আমরা যে-কোনও বস্তুকে চক্ষের নিমেষে ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে খুশি পাঠাতে পারি। কিন্তু সেই বস্তুকে ধরে নেওয়ার মতন জিনিস সেই ঠিকানায় থাকা দরকার। তোমার হেলমেটের ক্রিস্টালদের সেই ক্ষমতা আছে। ওই আমার কথা তাই করে শুনতে পেলে। এবার আমাকেও দেখতে পাবে।

বলতে না বলতেই সে এসে হাজির হল আমার সামনে। প্রথমে দেখলাম খানিকটা ধোঁয়া আমার সামনে। তারপর দেখলাম তাকে। বিকট চেহারা। দেখেই আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। সে বললে,—ভয় পেও না। আমি জীবন্ত নই—রোবট।

রোবটের চেহারা যে এরকম হয়, তা জানা ছিল না। যাই হোক, তারপর থেকেই সে এখানে আছে—এই ঘরেই। বেশ ছিলাম দুজনে। এখান থেকেই ওর সঙ্গে গিয়ে ওদের গ্রহের পাগলদের চিকিৎসাও করে আসছিলাম ক্রিস্টাল হেলমেট দিয়ে। ...এমন সময় শুনলাম একালের দস্যুসর্দার ফ্যাচাং খবর পেয়েছে আমার ক্রিস্টাল হেলমেটের। এই হেলমেট শুধু পাগলামিই সারায় না—বুদ্ধিও বাড়িয়ে দেয়। মিনমিনে লোককে জবরদস্ত করে তোলে। আমি কীরকম হয়ে গেছিলাম—তা দেখে তো আমার ছেলে আর বউমারাই ভড়কে গেছিল।

মাফিয়া ডন ফ্যাচাং ঠিক করেছে, সামনের ইলেকশনে তার স্যাঙাত ক্রিমিনালদের ক্যানডিডেট করে নামাবে। ক্রিস্টাল হেলমেট পরিয়ে তাদের প্রত্যেককে সুভাষ বোস, সি আর দাশ, জহরলাল নেহরু, জ্যোতি বসুর মতন ভালো-ভালো বক্তা করে তুলবে—পার্লামেন্টে নিজেদের এম. পি. ঢুকিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে নিজেই প্রাইম মিনিস্টার হয়ে বসবে। তারপর রাষ্ট্রসংঘ বিজয় হতে পারে।

পৃথিবীর এতবড় সর্বনাশ আমার এই অপয়া হেলমেটের জন্যে হবে—আমি তা চাই না। দুঃসংবাদটা আমার এই ভিনগ্রহের রোবট বন্ধুই আমাকে দিয়েছিল। সমাধানটাও অবশ্য সে বাতলে দিয়েছে। এক ঢিলে দু-পাখি মারা হবে। ক্রিস্টাল হেলমেট বগলে করে এ গ্রহে, সে গ্রহে যাতায়াত করার দরকারটা কী? একেবারেই থেকে যাব সেই গ্রহে। পাগলরা ভালো হয়ে উঠবে, আরও বড় বৈজ্ঞানিক হবে তারা। ছায়াপথের একমাত্র পাগলের ডাক্তার হয়ে দাঁড়াব আমি।

শান্তনু সরখেল থামলেন। ঘর নিস্তব্ধ।

বুলো আর বাবলি স্পষ্ট বুঝল তাদের দাদু সত্যিই পাগল হয়ে গেছেন। বাবা-মায়েরা বাড়িয়ে বলেনি।

কিন্তু পাগলের সঙ্গে তর্ক করতে নেই। সায় দিয়ে যেতে হয়। তাই বুলো বললে,—সেইটাই ভালো।

বালি তারপরেই বললে,—এখুনি যাও।

অমনি গমগমে খ্যানখেনে গলা শোনা গেল অন্ধকারের মধ্যে,—তাহলে তো বাধা কেটেই গেল। চলো হে ডাক্তার।

হু-উ-উ-স করে একটা আওয়াজ হল। অন্ধকার কোণ থেকে একটা ছায়ামূর্তি এগিয়ে এসে শান্তনু সরখেলকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল ছাদের মাঝখানে। ওই অবস্থাতেই ক্রিস্টাল হেলমেট মাথায় পরতে-পরতে চেঁচিয়ে বললেন শান্তনু,—বিদায়। বিদায়!

বলেই মিলিয়ে গেলেন ফুস করে। ছাদ বিলকুল ফাঁকা।

এতক্ষণে ধুলো বুঝল, কেন ছাদের চাবি তার হাতে দিয়ে গেছেন দাদু। বালিকে হিড়-হিড় করে টানতে-টানতে দৌড়ে এল দরজার সামনে। তালা খুলেই হুড়মুড় করে নেমে এল দোতলায়। মা-বাবাদের ঘুম থেকে টেনে তুলে বললে এইমাত্র কী ঘটে গেল ছাদে। কেউই একবর্ণও বিশ্বাস করল না। কিন্তু ছুটে এল ছাদে। কাউকে সেখানে পাওয়া গেল না।

তখন ঘোর সন্দেহ হল বাবা-মায়েদের—উদ্ভট কল্পবিজ্ঞান পড়ে ছেলে-মেয়েদুটোর মাথার ব্যায়রাম দেখা দেয়নি তো?

—বেশ, তা না হয় হল, কিন্তু খোদ শান্তনু সরখেল গেলেন কোথায়?

তারা চেপে ধরল ধুলো আর বালিকে,—সত্যি করে বল কী হয়েছে। কী দেখেছিস?

—তারার আলোয় যা দেখেছি, তা এঁকে দেখাতে পারি।

বলে ঝটাঝট পেনসিল-স্কেচ করে তিনহাতি সেই কিম্ভুত রোবটের ছবিটা এঁকে দিল ধুলো।

টেরা ইনকগনিটো

১ জানুয়ারি ১৯—

ডংবাজ বিশু আজ এসেছিল। ন্যাকা-ন্যাকা অনেক কথা বলে গেল। লোকটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারি না। বিশেষ করে দীননাথ ওকে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে। ভাগিস সে ব্রেকরা এখন নেই।

গা-জ্বালানো হাসি হেসে-হেসে বিশু বলছিল,—প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আজ ভুবন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক।

আমি তখন মশা মারার জন্যে কামান দাগা টাইপের একটা দারুণ এক্সপেরিমেন্টের কথা ভাবছিলাম। গোটা পৃথিবীটা জুড়ে এই যে যুদ্ধ-যুদ্ধ ভাব আরম্ভ হয়েছে—তার গোড়ায় জল ঢেলে দেওয়ার পরিকল্পনা। সে ব্যাপার আর-এক সময়ে বলব। এখন বলি ন্যাকা বিশুর বোকা-বোকা কথাগুলো।

অন্যমনস্ক রইছি দেখে বিশু আবার ঘ্যানর ঘ্যানর করে বলে গেল একই কথা।

আমি একটু রেগেমেগেই বললাম,—ও ব্যাপারটা আজকে আবিষ্কার করলি নাকি?

বেমালুম সায় দিয়ে গেল বিশু। সেই রকম মিচকি হেসে বললে—আমি কি জানতুম? স্যামুয়েল বার্ট্ ভ্যাড়-ভ্যাড় করে বলেছে একই কথা। আমি বললুম, জানি...জানি...জানি—

ভুরু কুঁচকোলাম এতক্ষণে,—স্যামুয়েল বান্টুটা কোন পয়মাল?

—হাঃ হাঃ হাঃ! যা বলেছেন দাদু—ব্যাটা একটা পয়মালই বটে। থুমরি দেখলেই বোমকে যাবেন।

—থুমরি মানে?

—থুমরি? থুমরি মানে থুমরি,—ভীষণ অবাক হয়ে গেল ক-অক্ষর গোমাংস বিশু—থুমরি মানে জানেন না? থুমরি মানে...ইয়ে...এই মুখ।

—বুঝেছি। খুব বিচ্ছিরি বুঝি?

—কী বলছেন দাদু! ও রকম থুমরি এই পিথিবির কোথাও দেখতে পাবেন না। ব্যাটা মর্কটের বাচ্চা। বলে কিনা, 'সোনাদানা ঘেঁটে-ঘেঁটে তার ইয়েদের উৎপাতে চেহারাটা একটু শুকিয়ে গেছে বটে, প্রফেসরের এক্সপেরিমেন্ট শুরু হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—সোনার খনিতে কাজ করে বুঝি?

—ওর চোদ্দো পুরুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলেনি। খালি জমিয়ে গেছে। বলে কী, রুপো আর ব্রোঞ্জ আমার পূর্বপুরুষরা ছুঁতো না—সোনার কাপে শরবত খেয়েছে, সোনার খাটে শুয়ে পটল তুলেছে। ঢেলার সোনা পাতালঘরে রেখে দেওয়া হয়েছে। বান্টু ব্যাটা সে-সবের ঠিকানা জানে। —যাবেন নাকি, দাদু?

সোনা খুব খারাপ জিনিস। মানুষকে পিশাচ করে দেয়। কিন্তু পাতালপুরীর সোনার খবর শুনে মনটা উসখুস করে উঠল।

বললাম,—কেন যাব আমি?

জুল-জুল করে তাকিয়ে রইল বিশু। তারপর চোখ দুটোকে আরও গোল করে বললে,—বেঁটে ভূত! বেঁটে ভূত! সবাইকে বেঁটে বানিয়ে ছাড়ছে। আপনাকে দেখলেই নাকি ভূত পালাবে।

শুনে ভালোই লাগল! আমার এলেম তো আমি জানি।

ভূতেরাও তাহলে আজকাল আমাকে ডরাচ্ছে।

খুশি-খুশি গলায় বললাম,—দীননাথ আসুক—

না...না...না, যেন আঁতকে উঠল বিশু—এ যাত্রায় ওকে নাইবা নিলেন...আমাকে দেখলেই তেড়ে আসে—

বিশুর কাতর মুখ দেখে রাজি হয়ে গেলাম। খাবলে তুলে-তুলে দীননাথ বড্ড চোয়াড়ে আর গবেট হয়ে যাচ্ছে। ভূত দেখে যদি তেড়ে যায়?

বললাম —তথাস্তু।

তাই চলে এসেছি সাউথ আফ্রিকার এই আশ্চর্য অঞ্চলে। ডাইরি লিখে যাচ্ছি দীননাথকে উপহার দেব বলে।

২ জানুয়ারি, ১৯...

কেপটাউনে জাহাজ থেকে নেমে ইস্তক বড্ড ধকল গেছে। বয়স হয়েছে, শরীর

আর সয় না। বিশু অবশ্য জামাই-আদরে রেখেছে আমাকে। তবে গভীর রাতে যখন বিলিতি গাড়িখানা নাচতে-নাচতে ঢুকেছিল এই অঞ্চলে—তখন কিছুই দেখতে পাইনি, নিদারুণ অন্ধকার। গাড়ির কাচেও কালো প্লাস্টিক লাগানো। যমপুরীতে এলাম, না, ভূতপুরীতে এলাম—কিছুই বুঝতে পারলাম না।

গাড়ি থামল। আমিও নামলাম। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার, আর একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ। কবরখানায় এমনই গন্ধ পাওয়া যায়।

বিশু আমার হাত ধরে নামিয়ে আনল গাড়ি থেকে। কানের কাছে বললে,—নড়বেন না, দাদু। ওরা এসে নিয়ে যাবে।

তাই দাঁড়িয়ে রইলাম বিলকুল অন্ধকারে অবিকল প্রেতচ্ছায়ার মতো। বিলিতি গাড়িটা গোঁ-গোঁ করে ব্যাক করে বেরিয়ে গেল আলো-টালো না জ্বালিয়েই।

ব্যাপার কী? এরা কি অন্ধকারেও দেখতে পায়?

তাছাড়া এলাম কোথায়? মাটির ওপরে নিশ্চয় নয়—তাহলে গায়ে খোলা হাওয়া লাগত—আকাশের তারা দেখতে পেতাম। নিকষ এই আঁধার বিরাজ করে শুধু পাতালে...অথবা নরকে।

উদ্ভট এই ভাবনাটা মাথায় এসেছিল নিশ্চয় আমার, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আচমকা চনমনে হয়ে গেছিল বলে।

নারকীয় অভিজ্ঞতা-টভিজ্ঞতাগুলো শুরু হল তো তারপরেই। হঠাৎ থিরথির করে কেঁপে উঠল পায়ের তলার মাটি—তারপরেই হু-উ-উ-স্ করে নেমে গেল পাতালে। হ্যাঁচকা টান মেরে বিশু টেনে আনল একপাশে—অন্ধকারেই আওয়াজ শুনে বুঝলাম আজব লিফট উঠে গেল ওপরে।

৩ জানুয়ারি ১৯..

গায়ে-গতরে ব্যথা মিলোতেই গেল এই দুটো দিন। বিশু লোকটা আমার কাছেই রয়েছে। ভয় পেলেও উঞ্ছবৃত্তী সোনার লোভে তোফা মেজাজে আছে।

একটা ব্যাপারে খচ-খচ করছে মনের ভেতরটা।

যার আমন্ত্রণে এতদূরে এলাম, তাকে আজও দেখিনি। কলকাতাতেও দেখিনি—জাহাজেও দেখিনি—এখানেও দেখছি না।

বিশুকে বলেছিলাম,—বাপু আমার সামনে আসছে না কেন?

একগাল হেসে বিশু বলেছে প্রতিবার,—লজ্জা পাচ্ছে...লজ্জা পাচ্ছে দাদু। ও খুপরি দেখলেই আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাবে আপনার।

চেহারা দেখাতে যে চায় না, তাকে দেখতে আমারও বয়ে গেছে, তবে হ্যাঁ, এত রহস্য করার পেছনে যে অন্য একটা পৈশাচিক কারণও থাকতে পারে, সেটাও আমার ভাবা উচিত ছিল।

আমরা এখন যেখানে রয়েছি, সে ঘরটা নিঃসন্দেহে মাটির তলায়। জানলা-

জানলার বালাই নেই। পাথরের দেওয়াল, পাথরের ছাদ, পাথরের মেঝে। দরজাটা কেবল চকচকে ধাতুর। সোনালি ধাতু। নখ দিয়ে আঁচড়ে সোনা বলেই তো মনে হয়েছে।

ঘরে ইলেকট্রিক আলো আছে। এয়ারকন্ডিশনার আছে। খাট, আলমারি, চেয়ার, টেবিল সবই হালফ্যাশনের। এহেন পাথুরে ঘরের সঙ্গে মানায় না।

এই দু'দিন এখানে খেয়েই যাচ্ছি। খাবার-দাবার বিশুই নিয়ে আসে। এ ঘরের সামনেই একটা বড় হলঘর। একদম ফাঁকা লিফট নামিয়ে দিয়ে গেছে এখানে এবং এখানেই কল-পাইখানা। একদিকের দেওয়ালে একটা সোনার দরজা। বিশু গিয়ে এই দরজার সামনে আফ্রিকান ভাষায় কী যেন বলে। অমনি দরজা খুলে যায়। ও বেরিয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যায়। ফিরে আসে খাবার-দাবার নিয়ে।

বিশু গড়-গড় করে এই ভাষায় কথা বলতে পারে। সাউথ আফ্রিকার এ ভাষা অবশ্য এসেছে ওলন্দাজ ভাষা থেকে। গায়ের রঙ যাদের সাদা, তারাও কথা বলে আফ্রিকান ভাষায়। ইংলিশও চলে। দুটোই তো সরকারি ভাষা।

বিশু শিখেছে পেটের দায়ে। নাটালে ইন্ডিয়ান ডেরায় ছিল বহুবছর। খাপার খেটে মরেছে বছরের পর বছর। ভেড়া, ছাগলের চামড়া চালান যায় এখান থেকে 'পার্শিয়ান ল্যাম্ব' আর 'অ্যাংগোরা গোট' নামে। ও সেই কারখানায় কাজ করেছে। জার্মানে গিয়ে জাহাজে চেপে তিমি শিকারও করেছে বিশু। ওরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে নতুন সোনার খনিতে কাজ করেছে—সোনার উৎপাদনে কীভাবে ইউরোপিয়ান বাড়তি লাভ হয়ে দাঁড়ায় তাও জানে। কিম্বারলিতে হিরে খনিতে মেহনত করার সময়েই নাকি আলাপ হয় স্যামুয়েল বান্টুর সঙ্গে।

দোস্তি জমেছিল প্রথম দিন থেকেই। তার কারণও আছে। বিশুর বাবা আর মা দুজনেই ছিল দুটো চলমান আলকাতরার পিপে। বিশু বাটা নিজেও তাই—দেখলে কাফ্রি বলেই মনে হয়। সাউথ আফ্রিকার হটেনটট বুশম্যান, হ্যামিটিকদের মতোই চেহারা। একেবারে আদিবাসী টাইপ। যেমন হলদে দাঁত, তেমনি শুয়োরের লোমের মতো মাথায় চুল। গায়ের রঙ দেখলে ভূতেও লজ্জা পায়।

বান্টু সম্প্রদায় অবশ্য এই তিন আদিবাসীকে হটিয়ে দিয়েছে। স্যামুয়েল বান্টু এই সম্প্রদায়ের মানুষ।

বড় রহস্যময় মানুষ। আমার খবর আগে থেকেই জানত। তারপর কিম্বারলিতে বিশুর কাছে আমার বৃত্তান্ত বৃত্তান্ত শোনার পর থেকে আঠার মতো ওর পেছনে লেগে আছে। মুড়িমুড়কির মতো টাকা-পয়সা উড়িয়েছে। বিশুকে নিয়ে কলকাতায় এসে সোনার আর ভূতের লোভ দেখিয়ে আমাকে এনে ফেলল এমন একটা পাতালপুরীতে—যেখানে মড়ারা থাকলেই বুঝি মানায়।

থাকে কি না কে জানে। রাতদুপুরে বিশ্রী বিকট গন্ধটা অত উৎকট হয়ে ওঠে কেন? বন্ধ সোনার দরজার ওদিকে অত খসখস-খড়মড় আওয়াজ শোনা যায় কেন? কারা অমন চাপা গলায় কথা বলে?

কাল বাকি রাতটা ঘুমোতে পারিনি। ভোরের দিকে বিটকেল গন্ধ পাতলা হয়ে গেল খসখস খড়মড় আওয়াজ মিলিয়ে যেতেই।

দীননাথকে সঙ্গে আনলে ভালো হতো। মাথামোটা হলেও ছোকরা পাশে থাকলে বুকে বল পাই।

৪ জানুয়ারি ১৯..

নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল বিশু। ছিরে, সোনা, তিমি, ছাগল, ভেড়া নিয়ে এত ঘাঁটাঘাঁটি করেছে যে ওকে আর ঠিক মানুষ বলাও চলে না।

ঠেলে তুললাম ঘড়িতে ছটা বাজতেই। বললাম রাতদুপুরের গা-কাঁপানো গল্প। ও তো শুনেই হেসে গড়িয়ে পড়ল। খ্যাখ্যা করে হাসতে-হাসতে বললে,—ওরা যে আপনার সামনে আসে লজ্জা পাচ্ছে দাদু।

—কারা?

—স্যামুয়েল-এর সাঙ্গপাঙ্গরা।

—স্যামুয়েলকেই দেখলাম না—

—স্যামুয়েল আজকেই আসবে।

—এই দুটো দিন কেন আসেনি?

—তোড়জোড় করছিল যে।

—কীসের তোড়জোড়?

—ভূতগুলোকে দেখাতে হবে তো আপনাকে।

—ভূত?

—ভূত দেখবেন বলেই তো এসেছেন। ওদের আবার সব জায়গায় দেখা যায় না। বাপ্টুর ইচ্ছে দু-একটাকে খাঁচায় ধরে নিয়ে আসবে।

—খাঁচায় করে ভূত আনবে!

—অত অবাক হবেন না, দাদু। ভূত না দেখলে ভুতুড়ে রোগের ওষুধটা বের করবেন কী করে?

—ভুতুড়ে রোগটা তো—

—বেঁটে হয়ে যাওয়া। স্যামুয়েলকে দেখলেই বুঝবেন কী রকম বাঁটকুল-বাবা হয়ে গেছে বেচারা। ওই...ওই...এসে গেছে, স্যামুয়েল।

সোনার দরজার ওপারে শুনলাম খুব মিষ্টি গলায় কে যেন 'বিশু' 'বিশু' করে ডাকছে। তারপরেই ক্যাঁচ-ক্যাঁচ করে খুলে গেল সুবর্ণ কপাট। এবং...

স্যামুয়েল বাপ্টুর কিম্ভূত মূর্তি দর্শন করে চক্ষু চড়কগাছ করে ফেললাম।

৫ জানুয়ারি ১৯..

গতকাল স্যামুয়েল অনেক কথা বলে গেল।

ওকে দেখে আমি হতভম্ব হয়ে গেছিলাম। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিলাম। চোখের পাতা ফেলতে পারিনি।

তারপর মনে পড়ল বাক্সটার কথা। বিশুর নিত্যসঙ্গী সেই বাক্স, লম্বায় আর চওড়ায় একফুট, হাইটে দেড়ফুট। ডালায় অজস্র ফুটো। আংটা লাগানো। কিম্ভুটে সাইজের এক বাক্সকে কখনও হাতছাড়া করেনি বিশু। কলকাতা থেকে সাউথ আফ্রিকা —এতটা পথ নাড়া ধরে বাক্স নিয়ে এসেছে।

সেই বাক্স এখন কোথায়?

এ ঘরে নেই। বিলিতি গাড়ি থেকে নামবার সময়ে অন্ধকারে খেয়াল করিনি বাক্স হাতে ঝুলছিল কিনা। কিন্তু এই পাতালঘরে আশ্চর্য সেই বাক্স নেই!

না থাকারই কথা। বাক্সর মালিক তো এখন আমার সামনেই।

বাক্স-রহস্য পরিষ্কার হয়ে যেতেই খাঁচ করে খিঁচড়ে গেল মেজাজটা। বুরবক-বুরবক ভাবটাও নিশ্চয় চোঁ-চাঁ পালিয়েছিল চোখ-মুখ থেকে।

বলেছিলাম কড়া গলায়,—ইয়ার্কি হচ্ছিল?

দাবড়ানি খেয়ে নিমেষে চুপসে গেল স্যামুয়েল। দাখন হাসি উবে গেল মুখাবয়ব থেকে।

বললে তোৎলাতে-তোৎলাতে মিকি-মাউস ভয়েসে,—ই-ই ইয়ার্কি কেন?

—বাক্সর মধ্যে আস্তিন থাকা হয়েছিল তো বলা হয়নি কেন আমাকে?

ই..ই..ই..—একদম কথা আটকে গেল স্যামুয়েলের। ভীতুর ডিম কোথাকার। এতক্ষণে বুঝলাম দীননাথকে কেন সঙ্গে নিতে চায়নি বিশু। স্যামুয়েলকে নিয়ে নির্ঘাত লোফালুফি করত সকাল-সন্ধে—ঠিক যেভাবে জাগলেন ছুড়ে-ছুড়ে লুফে নেয়।

কাষ্ঠ হেসে ব্যাপারটা ম্যানেজ করার চেষ্টা করল বিশু,—দাদু, গুগলিকে দেখলে কারবার কেরোসিন হয়ে যেত বলে বলিনি।

—কারবার কেরোসিন! মানে?

—হিঃ হিঃ! দাদু যেন কী! রস ল্যাংগুয়েজ একদম বোঝেন না। গুপ্ত ব্যাপার ভেস্তে যেত না? অত অয়েলিং জলে যেত।

—অয়েলিং! কাকে?

—হেঃ-হেঃ! আপনাকে দাদু, আপনাকে। আপনি না এলে এ গিঁট খুলবে কে?

ভয়ানক রাগে পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। বিশু ব্যাটা যে এত বজ্জাত, তাতো জানতাম না। ক্রোধে কথা বন্ধ হয়ে গেল। চেয়ে রইলাম নিশ্চয় জ্বলন্ত চোখে।

তাই দেখে দোরগোড়া ছেড়ে গুটি-গুটি ঘরের ভেতরে এল আশ্চর্য জীব স্যামুয়েল। মাথায় দেড়ফুট—একটা দু-পাওলা গোলাপ কলমেরই চলে। ওইটুকু বডিতে কোট প্যান্ট টাই আর টপ হ্যাট দেখে হাসব কী কাঁদব ভেবে পেলাম না। খুদে হলেও নিখুঁত কাটিং। মায় পায়ের জুতোটা পর্যন্ত জেল্লা মারছে কালোহিরের মতো। আর

একটু কাছে আসতেই জুলপি, দাড়ি, আর গোঁফ দেখে তাজ্জব হয়ে গেলাম। ফুস করে রাগ উড়ে গেল। হেঁট হয়ে শেষকালে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে গুলি-গুলি চোখে (নিশ্চয় চোখের অবস্থা ওইরকম দাঁড়িয়ে ছিল তখন) চেয়ে রইলাম গুগলি স্যামুয়েলের চিবুক আর দাড়ির দিকে।

একে কি দাড়ি বলে? এ যে আঁশ। খুব শক্ত কালো আঁশ যেন কালো গ্রানাইট পাথর কেটে-কেটে পরিপাটিভাবে সেঁটে দেওয়া হয়েছে। নাকের নিচে, ঠোঁটের নিচে, জুলপির নিচে।

আমার চোখের একফুট তফাতে ঝিলমিল করতে লাগল গুগলি স্যামুয়েলের কালো চশমা। লিলিপুটিয়ান চশমা। ছোট-ছোট কালো কাচের আড়ালে যে চাহনি-আভাস দেখলাম, তা ঠিক মানবিক বলে আমার মনে হয়নি। নইলে আচমকা গা শিরশির করে উঠবে কেন?

দীননাথ থাকলে অপকর্মটা করে বসত তক্ষুনি। একটানে চশমা খুলে নিয়ে দেখত চোখের চেহারা, মণির আকৃতি...

গুগলি স্যামুয়েল আমার মনের ভাবনা যেন আঁচ করেই অদ্ভুত লাফ মেরে পেছিয়ে গেল দরজার কাছে।

বললে অবিকল মিকি-মাউস ভয়েসে,—টাচ করবেন না, বডি টাচ করবেন না...চশমায় হাত দেবেন না।

—কেন বৎসা, কেন? বললাম সুমধুর কণ্ঠে।

—এখনও সময় হয়নি।

—এখনও হেঁয়ালি?

—চটবেন না, প্রফেসর, চটবেন না। আমার ভাঙা-ভাঙা বাংলা শুনে বুঝছেন তো, অনেক সময় নিয়েছি নিজেকে তৈরি করতে—আপনাকে সব বলব বলেই তো এত মেহনত করলাম—এই গাঁড়াকল থেকে মুক্তির পথ বাতলাতে পারেন শুধু আপনি। প্রফেসর, প্লিজ, ধৈর্য ধরুন।

স্তব্ধ হল মিকি-মাউস ভয়েস। আমি হাঁটু গেড়ে বসেই বিষম বিস্ময়ে শুধু চেয়ে রইলাম দেড়ফুট হাইটের প্রাণীটার দিকে। কী বলব একে? মানুষ? অমানুষ? না মর্কট?

বাবু হয়ে মেঝেতে বসে পড়েছিল বিশু। কালো মুখে খ্যাঁকশিয়ালের হাসি (ভুল লিখলাম নাতো? খ্যাঁকশিয়াল কি হাসতে পারে? দীননাথ এডিট করে দেবেখন)।

ঠিক এই সময়ে তুরুক লাফ দেখাল মর্কট-মানুষ স্যামুয়েল। প্রথমবার এক লাফে পেছনে পেছিয়ে গেছিল পাক্কা ছফুট—এখন দশফুট লম্বা লাফ মেরে টুপ করে এসে বসল বিশুর কোলের ওপর, বিপুল আদরে দু'হাতে ওকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরল বিশু।

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেলেও মিছরির রসে ভেজানো গলায় বললাম,—অহো! অহো! এরকম লং জাম্প বিশ্বের কেউ দেখেনি।

দেখবে কী করে? ভাঙা-ভাঙা বাংলায় গুগলি স্যামুয়েল বলে গেল বিশুর কোলে বসে,—বেঁটে হওয়ার কত যে অ্যাডভান্টেজ, তা শুধু আমিই বুঝছি। হাড়ে-হাড়ে বুঝছি।

শেষ কথার সুরটা একটু যেন কেঁপে গেল। আমার মনটাও দুলে উঠল। মেঝেতে বসে পড়লাম পা মুড়ে।

বললাম,—হাড়ে-হাড়ে বুঝছ?

শুধু হাড়ে-হাড়ে নয়, রক্তমাংসে মেদমজ্জা—সবকিছু দিয়ে বুঝছি। আপনার হাইট কত, প্রফেসর?

আমার? তা আর কত...১৮০ সেন্টিমিটার বলেই তো জানি।

খুবই টল, অ্যাভারেজ বেঙ্গলিদের চেয়ে টল তো বটেই...আপনার শরীর অনুপাতে ব্রেনের ওজনটাও তাই একটু বেশি—ঠিক কি না?

উৎসুক চোখে চেয়ে রইলাম গুগলি মর্কটের দিকে। বিটলেটা অনেক খবর রাখে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আরও কী জানে, তা পেট থেকে বের কার দরকার।

বললাম ন্যাকা-ন্যাকা গলায়,—তাই নাকি? তাই নাকি? ব্রেনের ওজনের সঙ্গে হাইটের সম্পর্ক আছে নাকি?

কালো চশমার আড়ালে একজোড়া কালো পুঁতির ওপর পলক পড়ছে না মনে হল। নির্নিমেষ চাহনি নিবদ্ধ আমার ওপর, আবার আমার লোমকূপের গোড়ায়-গোড়ায় বিচিত্র শিহরণ অনুভব করলাম।

বললে গুগলি মর্কট,—না যদি থাকত, আপনার সঙ্গে আমার এভাবে মোলাকাত ঘটত না। প্রফেসর, আজকের আড্ডা নিছক আড্ডা বলে মনে করবেন না। খানকয়েক সিরিয়াস প্রবলেম আর ফ্যানটাসটিক ফ্যাক্ট থ্রো করছি আপনার সামনে। ভাবুন এবং মতামত দিন।

—যো হুকুম।

ব্যঙ্গ-কণ্ঠ শুনেও পুঁতি-চক্ষুর পলক পড়ল না। সাপের চোখ নাকি রে বাবা।

বললে গুগলি মর্কট,—মানুষের বাচ্চার ব্রেনের ওজন জন্মের সময়ে যা থাকে, প্রাপ্তবয়স্ক হলে তার তিনগুণ বাড়ে। কারেক্ট?

অ্যাবসলিউটলি,—বললাম আমি, মেয়েদের ব্রেন-ওয়েট অবশ্য—।

—চিরকালই কম থাকে। ও প্রসঙ্গ বাদ দিন। প্রফেসর, গত কয়েক প্রজন্ম ধরে অদ্ভুত কাণ্ড ঘটছে আমাদের এই ছোট্ট প্রজাতির মধ্যে। জন্মের সময়ে ব্রেনের ওয়েট যা থাকে, বড় হলে তার ছ'গুণ বাড়ছে।

সোজা হয়ে বসলাম আমি,—গোলার্ধদুটো সমান আছে তো?

এবার মনে হল কালো কাচের আড়ালে পুঁতি-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল,—না। ঠিক পয়েন্টে চলে এসেছেন। ব্রেনের বাম-গোলার্ধ লেখাপড়া আর কথার জন্যে দায়ী। এই গোলার্ধটা তেমন বাড়ছে না।

কথা লুকে নিয়ে আমি বললাম,—ডান-গোলার্ধ দায়ী কল্পনা শক্তির জন্যে—বাড়ছে ব্রেনের এই অংশ?

—ইয়েস প্রফেসর ইয়েস, দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম।

বটে! বটে! বটে! —বলে চোখ বন্ধ করে আলোর গতিবেগে ফটাফট কয়েকটা পয়েন্ট ভেবে নিলাম। চোখ খুলে বললাম,—বেঁটে হওয়া শুরু হয়েছে কি একই সঙ্গে? মানে, ব্রেনের ওয়েট বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে?

—দ্যাটস রাইট।

—ফাইন। ফাইন। ফাইন।

গুগলি মর্কটের কণ্ঠস্বর এবার একটু তিক্ত শোনাল,—এত খুশি হচ্ছ কেন?

—বেঁটে হওয়ার অনেক সুবিধে তো—নিজেই তো বললে একটু আগে।

—লং জাম্পের সুবিধে একটু আছে বইকি।

—আরও আছে বৎসা, আরও আছে। আমার সিকি হাইট এখন তোমার, ফলে খাবার আর অক্সিজেনের চাহিদা বেড়ে গেছে চারগুণ—কারেক্ট?

—ইয়েস, প্রফেসর, ইয়েস।

—তোমার শরীরের অনুপাতে যতটুকু খাওয়া দরকার—খাচ্ছ তার চারগুণ। এইটাই তো প্রবলেম?

—এগজাক্টলি। রাক্ষসের মতো খেয়ে চলেছে সবাই—এত খাবার জোটাই কোত্থেকে?

—অ্যাডভানটেজগুলো খতিয়ে দেখলে ও প্রবলেম কিছুই না। দৌড়োচ্ছ আটগুণ বেশি স্পিডে, পাহাড়ে উঠছ অথবা সিঁড়ি ভাঙাচ্ছ আটগুণ বেশি গতিবেগে—বেঁটে হওয়ার অনেক সুবিধে হে, অনেক সুবিধে।

—প্রফেসর!

—আছে, আছে, আরও সুবিধে আছে। আমি আমার শরীরের অনুপাতে খুবজোর একজনকে কাঁধে তুলতে পারব—তুমি পারবে চারজনকে। অবশ্যই তোমার মতো বেঁটে চারজনকে।'

—মানছি, প্রফেসর, মানছি—

তেড়েমেড়ে বলে চললাম,—বেঁটে হওয়ার ফলে হাড়গোড় কত মজবুত হয়ে যায় বলো? আটগুণ বেশি চোট পেলেও ভাঙে না। তাই তোমার সাইজের দশজনকে কাঁধে চাপালেও তোমার হাড় ভাঙবে না, তোমার ওজনের চারগুণ ওজনের গাড়ি-পাথর-গুঁড়ি টেনে নিয়ে গেলেও হাড়ে ফ্র্যাকচার দেখা দেবে না। ছফুট হাইট থেকে আমি লাফিয়ে নামলে আমার কিছু থাকবে না—তুমি কিন্তু বারো ফুট হাইট থেকে লাফিয়ে নেমে এসেও থাকবে বহাল তবিয়তে। কম নয় হে, কম নয়—বেড়াল-টেড়ালের এমনি ক্ষমতা থাকে।

—প্রফেসর...প্রফেসর...

—আহা...আহা...সুবিধেগুলোর বর্ণ শুনাতে ভালো লাগছে না কেন? বেঁটে হলে নার্ভ কমিউনিকেশন কত বেড়ে যায় বলো তো? পেশির ক্ষমতাও বাড়ছে বলেই তো অমন চমৎকার লাফ মারতে পারছ। এত প্রাণবন্ত, এত চটপটে, এত ছটফটে বেঁটেদের অথবা বাঁদরদের অনেক কদর সার্কাসে। আমি লাফিয়ে পেরিয়ে যাব একটা চেয়ার, তুমি পেরোবে একটা আলমারি—যা হাইট তোমার, তার দ্বিগুণ তো বটেই...

—মাই ডিয়ার প্রফেসর—

—ওয়েট, ওয়েট, লিটল ম্যান—আমার হাতে ছোড়া পাথর যাবে খুবজোর ষাট ফুট, মানে, আমার হাইটের দশগুণ—তোমার হাতে সেই পাথরই যাবে তোমার যা হাইট, তার চল্লিশগুণ দূরে—

—প্লিজ প্রফেসর—

—ওয়েট, মাই চাইল্ড, ওয়েট...কত সুবিধে বেঁটে হওয়ার বলো তো? তোমার ওই হাতে তলোয়ার ঘুরবে চারগুণ ঘন-ঘন, হাতুড়ি পড়বে চারগুণ ঘন-ঘন, ঘুষি মারবে চারগুণ ঘন-ঘন...অহো! অহো! অহো!

—আপনি পাগল।

—লোকে তাই বলে। বয়ে গেল। কিন্তু তোমাদের সুবিধেগুলো বিচার করো আগে। সাঁতার কাটা তোমাদের কাছে এখন ছেলেখেলা, জলের পোকার মতো সাঁতরাবে অনায়াসে—হাত-পা চলবে তো এখন চারগুণ ঘন-ঘন। ইস! কী আরাম। ঠিক যেন মানুষ-মাছি।

বিশুর কোল ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল বেঁটে স্যামুয়েল। আমিও তিড়িং করে দাঁড়িয়ে উঠে গড়গড়িয়ে বলে গেলাম,—সবচেয়ে বড় সুবিধে কী জানো? এই পৃথিবীর গ্র্যাভিটি তোমাদের চট করে কাহিল করতে পারে না। তোমরা অনেক বেশি এনারজেটিক, অনেক বেশি প্রাণোজ্জ্বল, অনেক বেশি সুইফট—ঠিক কি না? মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছে ব্রেনের ডান-গোলার্ধ বেশি বড় হওয়ায়। টপ হ্যাট-টা খুলবে স্যামুয়েল? দেখি কতটা ফুলেছে কপাল?

এক ঝটকায় টপ হ্যাট খুলে দূরে নিক্ষেপ করল স্যামুয়েল।

ডান-কপালের আকার দিকে তাকিয়ে যতটা না অবাক হলাম, তার চাইতেও বেশি হলাম মাথাজোড়া টাঁশ দেখে।

বললাম মুগ্ধ কণ্ঠে,—কী সুন্দর! কী সুন্দর।

সুন্দর! —স্যামুয়েল এবার ভড়কে গেছে মনে হল।

—সুন্দর না? এমন ঢিপি-কপাল যা—সে তো ইমাজিনেশনের মাস্টার—কল্পনার যাদুদণ্ড তার হাতের মুঠোয়—লেখাপড়ায় খুব ভালো হতে পারো—কথা বলায় থাকবে হতে পারো—কিন্তু কল্পনা...কল্পনা...শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা তোমাদের দেখলে ঈর্ষায় জ্বলে যাবে, স্যামুয়েল।

—ঈশ্বরীয় ব্রেন-স্পীড, তাই তো?

—অবশ্যই, অবশ্যই...কিন্তু মাথামোটা ওই আঁশ এল কোত্থেকে হে? গালে চপাটি আঁশগুলোও তো মানুষের মুখে মানায় না। কেরাটিন-প্রোটিন অ্যাবনর্মাল হয়ে গেছে, তাই না? চুল-টুল সব শক্ত চামড়া হয়ে গিয়ে নখের মতো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। দেখি-দেখি হাতের নখ দেখি...আরেব্বাস! এ যে বেড়ালের টালন...পশু-প্রাণীদের মতোই শিকারি নখ বেরিয়েছে...সামুয়েল...সামুয়েল...তুমি মানুষ তো?

কালো চশমার আড়ালে পুঁতি চোখ দুটো এবার কালো আগুন ছড়িয়ে গেল যেন। বেঁকে গেল হাতের লম্বা-লম্বা ছুঁচল নখ।

বিকৃত হয়ে গেল মিকি-মাউস স্বরেস,—জবাবটা আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে, প্রফেসর।

বলে তড়াক করে লাফ দিয়ে বিশুর কোলে গিয়ে উঠল বেঁটে মর্কট এবং আমার পানে জ্বলন্ত চাহনি নিক্ষেপ করে বিশু একে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল বাইরে।

৬ জানুয়ারি ১৯...

দুই মক্কেলই ঘুঁসতে-ঘুঁসতে বেরিয়ে যেতেই দীননাথ হতভাগার জন্যে বড্ড মন কেমন করে উঠল আমার। উদ্ভট যত আবিষ্কারের ওই থোকরাই তো আমার চিরকালের সঙ্গী। ব্রেন-ওয়েট ওর নেহাতই কম, কিন্তু খতি-ওয়েট তো আছে...

বিশু-নচ্ছার খুবই প্যাঁচে ফেলেছে। ঠিকরে বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে সোনালি দরজাটা বন্ধ করে দিতে ভোলেনি।

গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে আলতো চাপ দিলাম পাল্লায়।

দরজা খুলল না। জোরে ঠেলা মারলাম, তাও খুলল না। বুঝতে আর বাকি রইল না এখন থেকে আমি বন্দি—এই পাতাল-ঘরে। ঝুর-ঝুর করে এয়ারকন্ডিশনার চলছে—ঘরের মধ্যে মিষ্টি সুবাস ভেসে-ভেসে বেড়াচ্ছে। আরামের ঘাটতি নেই। নেই কেবল স্বাধীনতা।

মিষ্টি সুবাসটা একটু-একটু করে কমে যাচ্ছে না? এ সুগন্ধ এয়ারকন্ডিশনারের সুগন্ধ। কিন্তু এখন যে গা-গুলোনো গন্ধটা নাড়িকে পাক দিতে শুরু করেছে...এ গন্ধ আমার অপরিচিত নয়।

মাঝরাতে এমনি বোটকা গন্ধ ভেসে এসেছিল দরজার ওপার থেকে। সেই সঙ্গে খড়মড় খটমট খড়মড় আওয়াজ।

ঠিক এই দুর্গন্ধ সামুয়েলের গা থেকেও বেরোচ্ছিল, তখন অতটা আমল দিইনি।

তবে কি ওর জাতভাইরা আসছে দলে-দলে আমাকে ছিঁড়ে খাবে বলে?

খটমট খটমট খটাখট আওয়াজ বেড়েই চলেছে ওদিকের হলঘরের ফাঁপা ঘরে গমগম করে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি। কাতারে-কাতারে খুরওলা প্রাণী যেন হুটোপাটি দাপাদাপি করছে।

খাটে বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছি কী করা যায়, এমন সময়ে দড়াম করে খুলে গেল সোনালি দরজা।

ফ্রেম জুড়ে আবির্ভূত হল বদমাশ বিশু। বেঁটে কুঞ্চিত মুখখানায় ভাসছে ষড়যন্ত্রী কুটিল হাসি।

আমি কিন্তু হেঁট হয়ে ওর দু-পায়ের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে ছিলাম হলঘরের জীবগুলোর দিকে।

এক থেকে দেড় ফুট হাইটের অসংখ্য অমানুষ পিলপিল করছে ঘরের মধ্যে। তাদের প্রত্যেকেই এক-একটা দুপেয়ে পোসাপ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। দরজার সামনেই যারা গুঁতোগুঁতি করছে, আমি শুধু তাদেরকেই খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলাম।

এরা মানুষ না অমানুষ—চট করে তা বলা মুশকিল। আকৃতিতে প্রত্যেকেই স্যামুয়েলের সংস্করণ। মাথাভর্তি কালো আঁশ। জুলপি বেয়ে দুগাল আর চিবুকেও ছড়িয়ে পড়েছে সেই আঁশ এবং ঘাড়-গলা বেয়ে বুক-পিঠ-কোমর-উরু-পা-হাত-সর্বত্র কুচকুচে আর চকচকে হয়ে রয়েছে কালো আঁশে। দু-হাতের দশখানা আঙুলের দশখানা নখ শ্বাপদ প্রাণীর নখের মতোই তীক্ষ্ণ, ধারালো এবং যেন রক্তলোলুপ। সবচেয়ে কিম্ভূত ওদের পা। গরু-ছাগল-ঘোড়া-গাধা-হরিণ-বাইসনের মতো খুরওলা পা—তবে সে-খুরের প্রতিটিতে পাঁচটা ভাগ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচখানা আঙুল এখন পাঁচখানা খুর হয়ে জুড়ে গিয়ে এক হয়ে গেছে।

এদের কারও পরনে বস্ত্র নেই। স্যামুয়েল অত কোট প্যান্ট টাই হাঁকিয়ে এসেছিল তাহলে এই কারণেই...আঁশওলা কুৎসিত অবয়ব দেখাতে চায়নি বলে।

আমি অবাক হলাম না, ভয় পেলাম না, শুধু কৌতূহলী হলাম। কৌতূহল তুঙ্গে উঠল ওদের চোখ দেখে। চকচকে গোল পুঁতি। চোখের পাতা পড়ছে পিটপিট করে। নাকের জায়গায় দুটো ফুটো আছে বটে—কিন্তু বাঁশির মতো নাক তো নয়—বিলকুল চ্যাপ্টা।

মাথার আর গালের আঁশ কপালের ওপর নেমে এসে দুচোখ আর নাকের খুঁটো দিয়ে ধরে রীতিমতো অমানুষিক আকার এনে দিয়েছে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীগুলোকে।

হেঁট হয়েই বিশুর পায়ের তলা দিয়ে ঘাড় লম্বা করে আরও একটা প্রত্যঙ্গ দেখবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু দেখতে পেলাম না।

বিড়-বিড় করে বললাম আপন মনে,—সেটা নেই, অথচ...

অথচ কী? —কর্কশ গলায় বললে বিশু।

—দেখতে মারমোসেট-দের মতো।

—মারমোসেট?

নামটা প্রথম শুনলি তো? —বললাম মিষ্টি গলায়, জানলে আর এদের দলে ভিড়তিস না।

মারমোসেট কে? —রুক্ষ কিন্তু কৌতূহলী স্বর বিশুর—ওর পেছনে ঘরভর্তি

জীবগুলো শুধু খুর ঠুকছে খটাখট শব্দে—বড্ড অসভ্য, বড় ছটফটে, কথা বলতেও দেবে না।

বললাম,—এই পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট্ট বাঁদর।

—বাঁ...বাঁদর!

—হ্যাঁ, বাবা, খুদে বাঁদর। বেশিরভাগ মারমোসেট মাথায় আট-ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না—ল্যাজটা হয় কিন্তু বারো ইঞ্চি লটপটে। পিগমি মারমোসেটও আছে—মাথায় ছ'ইঞ্চি ল্যাজ আট-ইঞ্চি। কিন্তু ওদের আদি-নিবাস তো সাউথ আমেরিকায়। ব্রেজিলের উপকূলে, প্যারাগুয়ের সীমান্তে, আমাজনের অববাহিকায় পিল-পিল করছে। মরতে এখানে এল কেন?

বিশু বললে দাঁত কিড়মিড় করে,—বাঁদর নয় বলে।

—ঠিক, ঠিক। বাঁদর হলে তো এদের লম্বা ল্যাজ থাকত। চামড়া আঁশ হয়ে যেত না। তবে এরা কারা?

—সেইটা দেখবার জন্যে আর তার বিহিত করার জন্যেই আপনার আগমন।

—ও...ও...ও। এইজন্যেই আমার আগমন। কিন্তু ওরা অত খুর ঠুকলে কথা বলব কী করে? কপালগুলো তো সবই দেখছি ডানদিকে ফোলা—মারমোসেটরাও অবশ্য রীতিমতো মগজওলা বাঁদর। ওদের ব্রেনের ওয়েট জানিস?

—ব্রে—

—হাঁরে গবেট, হ্যাঁ ব্রেন। ওজন মুখস্থ রাখতে না পারিস মনে রাখিস রেশিওটা।

—রে...রে...।

—রেশিও—মানে অনুপাত। কোন প্রাণী কতটা বুদ্ধিমান তা এই অনুপাত থেকেই জানা যায়। দাঁড়া...দাঁড়া...অত লাফাসনি...ব্রেন-ওয়েটের সঙ্গে স্পাইনাল কর্ডের রেশিও বেড়ালের ক্ষেত্রে চার, বাঁদরের ক্ষেত্রে আট, মানুষের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ, আর...আর মারমোসেটদের ক্ষেত্রে আঠারো। কী বুঝলি?

জবাবটা এল সামুয়েলের মিকি-মাউসের ভয়েস থেকে,—এখন অবশ্য সেটা মাফি ভয়েস বলেই মনে হল।

দরজার আড়াল থেকে সে বললে,—ঘাট।

অ্যাঁ! সত্যি-সত্যি চমকে উঠলাম আমি—মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান, অথচ অমানুষের মতো চেহারা।

—প্রফেসর, চেহারার ঘাটতি আমরা ব্রেন ক্যাপাসিটি দিয়ে পূরণ করে নেব। সেই জন্যেই তো আপনাকে—

—জামাই আদরে রাখা হয়েছে। বৎসা সামুয়েল, সামনে এসো বাবা, আড়ালে থাকলে কি কথা হয়? একটুও রাগিনি আমি...বাঃ-বাঃ, কী সুন্দর দেখতে তোমাকে বলো তো? চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে...বলো, কী করতে হবে আমাকে।

খুরওলা পায়ে জুতো পরার জন্যেই টলে টলে চৌকাঠে এসে দাঁড়ালো স্যামুয়েল।

আমি বললাম,—ওহে গোবিন্দ—

—গোবিন্দ মানে?

—ওটা আদরের নাম। তোমার এই সাঙ্গোপাঙ্গদের বিদেয় হতে বলবে? গন্ধে যে টেকা যাচ্ছে না।

ঘাড় ঘুরিয়ে ঝাঁঝি-নিনাদ ছাড়ল স্যামুয়েল। নিমেষে প্রবল খুরধ্বনি তুলে ঘর ফাঁকা করে দিল আজব প্রাণীর দঙ্গল।

আমি অমায়িক হেসে বললাম,—এসো, এসো, হে উদ্ভট মারমোসেট—বলো এ হাল হল কেন তোমাদের।

টুপ করে লাফ মেরে বিশু-পাজির কোলে উঠে পড়ল স্যামুয়েল। বললে,—প্রথমেই বলে রাখি, সাউথ আমেরিকার মারমোসেটদের সঙ্গে আমাদের পূর্বপুরুষদের কোনও সম্পর্ক আছে বলে আমার জানা নেই। দ্বিতীয় কথাটা এই, দরজাটা দেখেছেন?

—সোনা দিয়ে তৈরি তো?

—খাঁটি সোনা। আমাদের পূর্বপুরুষরা ব্রোঞ্জ আর রূপো দুচক্ষে দেখতে পারত না। সারাজীবন সোনার জিনিস নিয়েই কাটায়—মরার পরেও কাঁড়ি কাঁড়ি সোনা নিয়ে চলে যেত কবরখানায়—

—আস্ত মড়া হয়ে?

—খুব যে ইয়ার্কি মারছেন। দেখবেন সেই সোনার স্তূপ?

দেখব বলেই তো এসেছি এতদূর একগাল—হেসে আমি বললাম, সোনা আমি খুব ভালবাসি।

৭ জানুয়ারি ১৯...

দেখলাম বটে সোনার পাহাড়। মাটির ওপরে নয়—মাটির তলায়। এ খবর যদি সোনালোভী দেশগুলো পায়, ছারখার করে দেবে মর্কটদের এই আস্তানা।

আমাকে ওরা নিয়ে গেল চাকাওলা গাড়িতে চাপিয়ে। দুখানা চাকা লাগানো গাড়ি। গাড়ি টেনে নিয়ে গেল কুকুর সাইজের খুদে প্রাণী। কুকুর তারা নয়—কেন না পায়ে খুর আছে। অতীতে ঘোড়ার ছিল খুব ছোট্ট—তখন তাদের নাম ছিল ইওহিপপাস। এরা কি সেই ইওহিপপাস? এত লক্ষ বছর পরে?

প্রশ্নটা আঁচ করে নিয়ে বললে স্যামুয়েল, (গাড়িতে আমার পাশেই বসেছিল ও আর বিশু)—প্রফেসর, যে ঘটনাটার পর থেকে আমাদের এই হাল হয়েছে, সেই একই কারণে এ তল্লাটে সমস্ত ঘোড়া এই সাইজ নিয়েছে—বংশ পরম্পরায়।

—বাচ্চারা ছোট্ট হয়ে জন্মেছে?

—হ্যাঁ, আর আমরা হয়েছি এইরকম। ঐ উল্কাপাতের ফল।

আমাদের খুদে ঘোড়ায় টানা গাড়ি তখন ছুটে চলেছে অদ্ভুত হলুদ পাথুরে

জমির ওপর দিয়ে। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা—বিলিতি গাড়ির টায়ার ফেটে যাবে বলেই এহেন অশ্ব-শকটের আয়োজন করেছে স্যামুয়েল অ্যান্ড বিগ কোম্পানি (প্রাইভেট লিমিটেড নিশ্চয়!)। হাওয়ায় উড়ছে হলদে বালি উঁচু-নিচু টিলা হলুদ আভা ছড়িয়ে বিস্তৃত দিগন্ত পর্যন্ত। সূর্য এখানে গনগনে সোনার থালা হয়ে ঝুলছে মাথার ওপর।

অনেক দূরে, দিগন্ত জুড়ে, কালো ধোঁয়ার মতো দেখা যাচ্ছে বন-জঙ্গলের মাথা। আমরা চলেছি ওই দিকেই।

বললাম,—ধনখটা-টা কী?

—বাপ-ঠাকুর্দাদের মুখে-মুখে যা শুনেছি, তাই বলছি। ব্যাঙের ছাতার আকারের বিশাল একটা মেঘের পুঞ্জ ভেসে এসে দাঁড়িয়ে গেছিল এখানে এই তল্লাটে।

—ব্যাঙের ছাতার মতো মেঘ! সে তো নিউক্লিয়ার-এক্সপ্লোশানের পর দেখা যায়।

—প্রফেসর, এ-ঘটনা যখন ঘটেছিল, তখন পৃথিবী জানত না অ্যাটমবোমা কাকে বলে।

—তবে সে ছাতা এল কোত্থেকে?

—কেউ জানে না। কেনই বা ভেসে এসে এখানে দাঁড়িয়ে গেল, তাও কেউ জানে না। মেঘলোকে গিয়ে ঠেকে থাকত নাকি ছাতার মাথা। প্রায় পাঁচ মাইল উঁচু।

—পাঁ-চ মাইল!

—বর্ণনা শুনে শুনে আমাদের কল্পনা শক্তিকে আর উন্নত মেধাকে কাজে লাগিয়ে হাইট-টা বের করেছি আমি। প্রফেসর, অদ্ভুত সেই মেঘ মালকছেদ ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল এই অঞ্চল জুড়ে। অন্ধকার হয়ে গেছিল চারদিক, মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ চমকাত, লকলকে শিখা নেমে আসত মাটিতে।

ইলেকট্রিক ট্রিটমেন্ট—বিড়-বিড় করে বললাম আমি।

কেন? —সপেটা প্রশ্ন করে স্যামুয়েল।

—ট্রিটমেন্ট না বলে এক্সপেরিমেন্টও বলতে পারো। ল্যাবরেটরিতে তো তাই হয়।

—ধোঁয়ার থামটা তাহলে ল্যাবরেটরি?

—মনে তো হয়।

—কার?

হয় প্রকৃতির, না হয়...না হয়...—আমতা-আমতা করে গেলাম আমি।

—পাঁচ মাইল উঁচু ব্যাঙের ছাতা একটু-একটু মিলিয়ে গেছিল—এখানেই—তারপর...তারপর...বাচ্চাকাচ্চাদের মধ্যে দেখা গেল অদ্ভুত বিদঘুটে পরিবর্তনগুলো।

মিউটেশন,—আবার বিড়-বিড় করে বলে গেলাম আমি।

—জানি, জানি, মিউটেশন না ঘটলে, কোষ বিকৃতি না ঘটলে এমনটা হবে কেন...রেডিও অ্যাকটিভিটি তো ছিলই সেই মেঘের মধ্যে...ছিল আরও কিছু—

হ্যাঁ, ছিল, আরও কিছু—ফের স্বগতোক্তি করে গেলাম আমি।

মাস্কি-ওয়েস নিনাদিত হতে গিয়েই সংযত হয়ে গেল। মোলায়েম গলায় বলে গেল স্যামুয়েল,—ওই মেঘ আসার আগে বড় দুর্ধর্ষ ছিল আমাদের পূর্বপুরুষরা...যাযাবর যোদ্ধা। ছত্রিশ জাতের মিশেলে—অনেক ধরনের রক্তের সংমিশ্রণে সে এক আশ্চর্য বেপরোয়া প্রকৃতি। অসম্ভব নিষ্ঠুর, অবিশ্বাস্য নির্দয়, অপরিসীম নির্মম। যাযাবর ছিল বলেই কোথাও দুদিনের বেশি মন টিকতো না—বাড়ি ঘরদোর শোবার জায়গা—সব ঘোড়ার পিঠে...বুনো ঘোড়াকে বশ মানিয়ে ছুটে যেত পাহাড় প্রান্তর জঙ্গল পেরিয়ে... দেশের পর দেশ লুঠ করত, জ্বালিয়ে দিত, শ্মশান করে দিত...সোনার ওপর ছিল প্রচণ্ড লোভ...ঘোড়ার পিঠে সোনার পোঁটলা চাপিয়ে ফিরে আসত এই অঞ্চলে। বুনো ঘোড়া গিজগিজ করত এখানে...সংগ্রহ করত নতুন ঘোড়া...আর সোনাদানা লুকিয়ে রাখত-মাটির তলায় কবরখানায়...ওই দেখুন একটা কবরখানা।

পেছনে হাত তুলে যে দিকটা দেখাল স্যামুয়েল, সেদিকে কবরখানার মতো কিছু দেখতে পেলাম না। সাঁচীর স্তূপের মতো একটা গোলাকার টিলা—ছোটখাটো একটা পাহাড় বললেই চলে। পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। হলুদ পাথর দিয়ে তৈরি। ঠিক যেন একটা হলুদ গামলা উপুড় করে রাখা হয়েছে। কিনারা দিয়ে পাথুরে রাস্তা।

এর নাম কবরখানা? —বলেছিলাম আমি।

—এরকম বিস্তর কবরখানা আছে এ তল্লাটে। অবিকল টিলা বা স্বাভাবিক টিলার মতো দেখতে। লুঠের সোনা জমতে-জমতে একটা সময় এল যখন পূর্বপুরুষদের মধ্যে চারটে সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল—মজুর, চাষি, যাযাবর যোদ্ধা আর রাজসম্প্রদায়। শেষের দল বুদ্ধির জোরে অন্যদের রেখে দিল মুঠোর মধ্যে। এরা যখন মারা যেত, রাজ্যের সমস্ত সোনাদানা গলিয়ে তাল পাকিয়ে ঢুকিয়ে রাখা হতো টিলার নিচে পাতালঘরে—যার তলায় শোয়ানো থাকত রাজার মোম-মাখানো দেহ—তার আগে অবশ্য নাড়িভুঁড়ি বের করে মশলা মাখানো নানান গাছগাছড়া ঢুকিয়ে দেওয়া হতো পেটের মধ্যে—যাতে শরীরটা নষ্ট না হয়ে যায়। এইভাবেই দূর-দূর অঞ্চল থেকে সোনার খনি, তোষাখানা, রাজপ্রাসাদ লুঠ করে সোনার পাহাড় বানানো হয়েছে প্রত্যেকটা টিলার তলায়। আসুন, ওই তো ঢোকবার দরজা।

কোথায় দরজা? ছ'চাকার গাড়ি তুড়ুক নাচ নাচতে-নাচতে এসে দাঁড়িয়েছে টিলা থেকে প্রায় একশো গজ তফাতে ফাঁকা জায়গায়। দরজা এখানে কোথায়?

আমি ইতিউতি চেয়ে অদৃশ্য কপাটের ঠিকানা জিগেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময়ে ঠক ঠকাং ঠক ঠকাং আওয়াজ শুনলাম ছ'চাকা গাড়ির তলার দিকে।

শাখামৃগ-লম্ফ দিয়ে গাড়ি থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হল স্যামুয়েল। কিন্তু আমাকে বললে,—নেমে আসুন দাদু।

নেমে এসে জমিতে হাঁটু গেড়ে বসতেই হল—নইলে দেখা দেখতেই পেতাম না কী কাণ্ড চলছে গাড়ির তলায়।

যেন মন্ত্রবলে পাথুরে জমিতে একটা চতুষ্কোণ গর্ত দেখা দিয়েছে। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে ঠিক তার ওপর। গর্তের কিনারায় দেখতে পাচ্ছি নখর যুক্ত পাঁচ-পাঁচ দশটা আঙুল। এরইপরেই টুক করে লাফ দিয়ে নখী-আঙুলের অধিকারী উঠে এল বুঝি পাতাল ফুঁড়ে।

আর এক না-মানুষ! দেড় ফুট চিড়িয়া! আভূমি নত হয়ে গেলাম টুইকল সামুয়েলকে। রাজা-বাদশার মতো সতেজ ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে রইল সামুয়েল। এ সম্মান যেন ওর বাপ-পিতামহ ওর জন্যে গচ্ছিত রেখে গেছে।

বললে আমাকে,—আসুন।

—কোন চুলোয়?

—গর্তের মধ্যে। আঁতকে উঠছেন কেন? চোর-ছ্যাঁচোড়দের ভড়কি দেওয়ার জন্যে কবরখানার গায়ে দরজা রাখা হয়নি। দরজা রয়েছে এতদূরে। ট্র্যাপডোর মাকড়শা যে-রকম সিন্দুকের ডালার মতো দরজা বানিয়ে বিবরে লুকিয়ে শিকার ধরে—আমাদের সান্ত্রি সেইভাবে গর্তে সেঁধিয়ে ধনপতির ধনদৌলত আগলায়, আসুন, ভয় নেই।

ভয় কাউকেই করি না। ভয়ের পাঠশালাতেই পড়িনি। সুতরাং বুকে হেঁটে গাড়ির তলা দিয়ে প্রথমে গর্তের কিনার থেকে ভেতরে উঁকি দিলাম। সিঁড়ির ধাপ নেমে গেছে। এবং কী আশ্চর্য! বিদ্যুৎ বাতি জ্বলছে চাতালে-চাতালে।

—ইলেকট্রিসিটি! এই পাতালে!

আমার বিস্ময়োক্তি শুনে ঈষৎ খেঁকিয়ে বললে সামুয়েল,—ঢুকুন না চটপট, কে কখন এসে যাবে, দেখে ফেলবে।

মরকটের খিঁচুনি শুনলে দীননাথ নির্ঘাত লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ছাড়ত। ভাগ্যিস ওকে আনিনি!

সড়াত করে বুকে হেঁটে গিয়ে প্রবেশ করলাম পাতালপথে। আমার পেছনে সটাসট নেমে এল অন্য তিনমূর্তি। খটাং খট শব্দে বন্ধ হয়ে গেল সিন্দুকের ডালা। আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল চাতালের বিদ্যুৎবাতি।

কিন্তু সত্যিই কি বিদ্যুতের আলো? খটকা লাগল মনে। এরকম দপ-দপ করছে কেন? হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে দেখলাম প্রকৃতির আর-এক বিস্ময়।

গ্যাস-ম্যান্টেলের মতো মস্ত একটা সাদা ফানুসের মধ্যে পিজপিজ করছে আলোর পোকা। জোনাকি জাতীয় পোকা। ফানুসটায় অসংখ্য ফুটো। লালা দিয়ে তৈরি নিশ্চয়।

অধীর সামুয়েল ভালো করে দেখতেও দিল না। তাড়া লাগাল পেছনে। তাড়া খেয়ে দুড়-দুড় করে নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে এঁকেবেঁকে। চাতালের পর চাতাল পেরিয়ে থকথকে আলোর পোকা দেখতে-দেখতে। তারপর এসে পড়লাম টানা লম্বা সুড়ঙ্গপথে। প্রায় দশ ফুট হাইট—চওড়াতেও তাই। নিস্তব্ধ পাতালপথে বিচিত্র পদধ্বনির সঙ্গে আমার আর বিশুর জুতোর মসমসানি মিশে গিয়ে। সুড়ঙ্গ অতিক্রম করে চলে এল মড়াদের থাকার জায়গায়। অক্টোপাস-শুঁড়ে গোলকধাঁধা ছড়িয়ে গেছে

দিকে-দিকে। পায়ের তলায় দুপাশে সোনার তাল যেন ঢেলে রাখা হয়েছে। গর্ত ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হচ্ছে সোনার স্তূপের জন্যে। ফানুস-পোকাদের অবিরাম কেরদানির ফলে হলুদ আলোর আশ্চর্য রোশনাই ছড়িয়ে পড়েছে প্রতিটি সুড়ঙ্গের মধ্যে। পথ-প্রদর্শক চিড়িয়াটা ঠিক পথেই নিয়ে এল আমাদের গমনা-কবরখানায় ঠিক তলায়। এখানে এসে বুঝলাম, বাইরে থেকে যে-টিলা দেখেছি আসলে তা একটা গম্বুজের ছাদ—টিলার গড়নে তৈরি করা—যাতে কেউ সন্দেহ না করতে পারে। গম্বুজের তলায় এখন আমরা পৌঁছেছি। সুবিশাল এই কবরখানার ছাদ ঠেকে রয়েছে অনেকগুলো মোটা-মোটা থামের ওপর। অসংখ্য ফানুস-পোকাদের ঘাঁটি ঝলমল করে রয়েছে গোটা পাতাল-কন্দরে। দেখা যাচ্ছে একটা সোনার পাহাড়, সোনার ঢেলা দিয়ে তৈরি পাহাড় মেঝে থেকে উঠে গিয়ে ঠেকেছে গম্বুজের ছাদ পর্যন্ত। হাজার-হাজার বছর ধরে লুণ্ঠিত হলুদ ধাতুকে গলিয়ে তাল পাকিয়ে জমিয়ে রাখা হয়েছে প্রকাণ্ড এই পাতাল সিন্দুকে।

বিমূঢ় কণ্ঠে বলেছিলাম,—কবরখানায় কবর কোথায়?

ফিসফিস করে সামুয়েল বলেছিল,—সোনার তালের তলায়, তার সারা গায়ে সোনার গয়না। যখ হয়ে সে আগলাচ্ছে এই সোনা। কিন্তু আমরা কাজে লাগাব এই সোনাকে—তাই আপনাকে ছলনা করে নিয়ে এসে দেখলাম—কীভাবে স্বপ্ন সম্ভব করব আমাদের।

ঘুরে দাঁড়ালাম। সামুয়েলের এই ফিসফিসানির মধ্যে চাপা ষড়যন্ত্রের আভাস পেলাম। ওর কালো চশমা পরা চোখদুটো এখন যেন ধক-ধক করে জ্বলছে ফানুস-পোকাদের জ্বলন্ত বাল্বের মতো। ঘাড় হেঁট করে দেড় ফুট চিড়িয়ার চশমার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে দেখলাম,—কী সেই স্বপ্ন?

নারকীয় এই মতলবটা আমাকে বলবার জন্যেই সামুয়েল নিয়ে এসেছিল পাতালপুরীতে। অস্বাভাবিক এই পরিবেশে কল্পনাতীত কুটিল ষড়যন্ত্রটা ততটা অস্বাভাবিক মনে হবে না—যতটা হতো দিনের আলোয় মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে শুনলে। কুচক্রীর প্ল্যানে ফাঁক নেই কোথাও। থমথমে মৃত্যুপুরীতে ঝকমকে হলুদ আলোর মাঝে দাঁড়িয়েও শোনালো ওর পৃথিবীর রাজা হওয়ার স্বপ্ন!

বর্বর ছিল ওর পূর্বপুরুষরা, ছিল লুঠেরা যাযাবর। রক্তের দোষ যাবে কোথায়? অবশ্যম্ভাবী খোঁয়ার ছাড়া কোষে কোষে বিকৃতি এনে ওদের নাটা চিড়িয়া বানিয়ে দিয়ে গেছে, মস্তিষ্কের কোষে-কোষেও এনেছে উন্মাদ কল্পনা আর আকাঙ্ক্ষা। বাদশা হবে গোটা দুনিয়ার। দুরন্ত কল্পনাশক্তি ওদের শক্তি জুগিয়ে যাবে, ইন্ধন জোগাবে এই স্বর্ণস্তূপ। এরকম স্তূপ আরও আছে এই অঞ্চলে। সামুয়েল বনরক্ষক রাজা সম্প্রদায়ের বংশে জন্মেছে বলেই ঠিকানাগুলো শুধু সে-ই জানে। তাতার, মোঙ্গোল, চেঙ্গিস খাঁ, নাদির শা লজ্জা পেয়ে যাবে যখন শুরু হবে তার পৈশাচিক নৃত্য। কুৎসিত বামনিনী হলেও শরীরের অনুপাতে বড় মগজের জন্যে আজ তার সম্প্রদায় এই পৃথিবীর সবচেয়ে বুদ্ধিমান জীব। বুদ্ধি যার, বল তার—এই নীতি অনুসরণ করলে সসাগরা ধরণীরও অধীশ্বর তো সামুয়েলদেরই হতে হবে।

কীভাবে?

অতি সহজে।

পারমাণবিক শক্তি আর তো শুধু রহস্য নয়। প্রকাশ্যে এবং গোপনে প্রলয়ঙ্কর এই মরণ বিদ্যাকে বশ করেছে বহু দেশ এবং বহু বৈজ্ঞানিক। টেররিস্টরা কি বেশ কয়েকটা শহরে নিউক্লিয়ার এক্সপ্লোশন ঘটানোর হুমকি দিয়ে অর্থ রোজগার শুরু করে দেয়নি?

স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানি নেবে সেই একই পথ। বিশ্বভ্রমণ করে এসেছে এই মতলবেই। পৃথিবী-জোড়া হামলা শুরু করবে ওর বর্বর যাযাবর পূর্বপুরুষদের মতো অশ্বপৃষ্ঠে নয়—শুরু এবং শেষ হবে আকাশপথে।

স্টার ওয়ার্স। নক্ষত্র যুদ্ধ। মারণ রশ্মি নেমে আসবে আকাশ থেকে। কে না জানে আজকের স্যাটেলাইটগুলোর সত্তর শতাংশ স্পাইগিরি করে চলেছে? হাবল টেলিস্কোপ শূন্যে উড়ে গিয়ে শুধু কি দূরবিন কষছে অন্য ছায়াপথগুলোর দিকে?

স্যামুয়েলদের হাই-এনার্জি বীম নেমে আসবে আকাশ থেকে। ম্যাপ অনুযায়ী পলকে-পলকে মানুষ-শূন্য হবে এক-একটা শহর। নিউট্রন বম্বটা তো ধ্বংস করবে না—শুধু মানুষ মারবে। কোনও প্রাণীই রেহাই পাবে না।

রেহাই পাবে শুধু স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানি—পঁচিশ ফুট পুরু কংক্রিট আর পাথর দিয়ে তৈরি পাতালপুরে থেকে। নিউট্রন, গামা রে, এক্সট্রা গামা রে ঢুকতে পারবে না সেখানে। ঘন্টাখানেকেই শ্মশান হবে ধরিত্রী।

পূর্বপুরুষদের স্বপ্নকে করাল রূপ দেবে তাদের বেঁটে বংশধররা।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র কি হাত মেলাবেন এই মাস্টার প্ল্যানে?

সব শুনে পুলকিত হেসে বললাম,—ভাববার সময় দাও।

দূরের সেই জঙ্গলের দিকে যেতে-যেতে স্যামুয়েল বললে,—প্রফেসর আপনাকে আর-একটা কথা বলা হয়নি।

কবরখানার সোনার সান্নিধ্য থেকে বেরিয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। নাচিয়ে অশ্ব-শকটের ওপর কোনওমতে বসে থেকে বললাম,—কী কথা?

—সোনা তো দেখলেন। ভূত দেখবেন না?

—ভূতেদের উৎপাতেই তো তোমরা চিমড়ে হয়ে গেছ শুনেছিলাম—এখন তো শুনলাম, ভূত নয়। ভুতুড়ে ধোঁয়ার থাম-ই সে জন্যে দায়ী।

স্যামুয়েল বললে,—ওটা বিগুডাইয়ের মস্করা। ভুতুড়ে ধোঁয়ার থাম এ অঞ্চলের সব প্রাণী দেহেই অরবিন্তর মিউটেশন ঘটিয়েছে—বুনো ঘোড়াদের চেহারা দেখেই বুঝেছেন।

—কিন্তু গাছপালাগুলো দেখছি বেদার লম্বা হয়েছে। জঙ্গলের কিনারায় এসে গেছিলাম বলেই দেখতে পাচ্ছিলাম আকাশ ছোঁয়া গাছের সারি। এত উঁচু আর এত ঝাঁকালো গাছ তো কোনও জঙ্গলেই দেখিনি। প্রাগৈতিহাসিক অরণ্য নাকি?

স্যামুয়েল বললে,—এই জঙ্গলের অধিপতি যারা ছিল তারাও বেধড়ক লম্বা। দৈত্য বললেই চলে।

ঘাড় ফেরালাম,—বলছ কী! একই ভুড়ুড়ে থাম দু-রকম কাজ করে গেল?

—এক্সপেরিমেন্ট...প্রফেসর...এক্সপেরিমেন্ট...ট্রিটমেন্টও বলতে পারেন। বাপ-ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি। ইঞ্চি তিন চার লম্বা খুদে বাঁদর ছেয়েছিল এই জঙ্গল। আজ তাদের হাইট কতটা জানেন?

ওই...ওই...দেখুন...এক ব্যাটা উঁকি মারছে।

অকস্মাৎ স্যামুয়েলের গলা দিয়ে আর্তচিৎকার বেরিয়ে আসতেই চমকে ওর চাহনি অনুসরণ করে তাকিয়েছিলাম ডানদিকের জঙ্গলের দিকে। দেখলাম, সেদিকের আকাশছোঁয়া গাছগুলো খুব নড়ছে আর দুলছে...এর বেশি আর কিছু দেখতে পেলাম না।

মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে স্যামুয়েলের কালো দাঁশ ভরা মুখ। হাতে একটা খুদে পিস্তল—মশার রিভলভারের মতো দেখতে। নলটো যা একটু বেশি লম্বা।

কী এটা?—তারস্বরে শুধিয়েছিলাম আমি—সঙ্গে-সঙ্গে খামচে ধরে ছিলাম স্যামুয়েলের হাত।

আমার শক্ত কবজির সঙ্গে পারবে কেন স্যামুয়েল? আজব হাতিয়ার খসে পড়ল হাত থেকে। কুড়িয়ে নিয়ে আমি বললাম,—কী এটা?

ছিনিয়ে নিতে গেল স্যামুয়েল। হাত উঁচু করে ধরে রাখাম ওর নাগালের বাইরে। বললাম—কী এটা?

দাঁত কিড়মিড় করে স্যামুয়েল বললে,—রে-গান।

—কোত্থেকে পেলে?

—টেরিস্টিলের কাছ থেকে।

—সেজন্যে বন্দি রেখেছো?

—হাঁ।

—কাকে মারতে যাচ্ছিলে?

—ওই দৈত্যটাকে।

—কেন?

—আপনাকে দেখাব বলে...দুদিন ধরে চেষ্টা করেও একটাকেও দেখাতে পাইনি—মেরে খাঁচায় পুরে নিয়ে যেতাম—আপনাকে দেখাতাম...আমাদের পয়লা নম্বর শত্রুর ব্রেন নিয়ে গবেষণা শুরু করতেন।

—শত্রু! কেন?

—ওদের ব্রেন আমাদের চেয়েও বড়।

—কী করে জানলে?

—জানি...জানি...প্রফেসর আমি জানি...ওদের ব্রেনের ক্যাপাসিটি অন্য ধরনের... অদ্ভুত ক্ষমতা...ঠিক বলে বোঝাতে পারব না...দূর থেকে মাথার মধ্যে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে।

—মাথার মধ্যে কথা ছুঁড়ে দিতে পারে! ওরা মুখে কথা বলে না?

—না। মুখের কথা তো বর্বরদের হাতিয়ার—ওরা তার অনেক ঊর্ধ্বে।

—অনেক ঊর্ধ্বে! তবুও তুমি চাও ওদের খতম করতে?

—আমাদের চাইতে বেশি ব্রেন-ওয়েট যাদের, তাদের কাউকে টিকিয়ে রাখব না।

—আমাকে?

—শরীরের অনুপাতে আপনার ব্রেন-ওয়েট কি আমার চাইতে বেশি?

—না, তা অবশ্য নয়, তবে কী জানো, ব্রেন সাইজ আর ইনটেলিজেন্সের মধ্যে কোনও সম্পর্ক নেই—ধারণাটা একেবারে ভুল।

—ভুল!

—পুরুষদের ব্রেন তো সবসময়েই মেয়েদের ব্রেনের চেয়ে বড়।

—শরীরের অনুপাতে তো বড় নয়।

—রাশিয়ান লেখক ইভান তুর্গেনেভ-এর ব্রেনের ওজন ছিল ২.০১ কিলোগ্রাম। ফরাসি লেখক আনাতোল ফ্রাঁস-এর ব্রেনের ওজন ছিল তার অর্ধেকের একটু বেশি—১.০১৭ কিলোগ্রাম। দুজনের মধ্যে প্রতিভার ফারাক কি ছিল? শরীরের ফারাকও কি লক্ষণীয়?

মুখে কথা জোগালো না স্যামুয়েলের। আর ঠিক তখনি লম্বা লাফ মেরে আমি গিয়ে পড়লাম গাড়ি থেকে নিচে এবং টেনে দৌড়লাম জঙ্গলের দিকে—হাতে রইল লেসার রশ্মির বন্দুক।

কিন্তু ব্যাটাচ্ছেলে দৌড়য় ভালো। ধর-ধর তেড়ে এসে আমাকে যেই খপাৎ করে ধরতে যাচ্ছে ঠিক তখনি মাথার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। তারপর আর কিছু মনে নেই।

৭ জানুয়ারি ১৯...

জঙ্গলে বসে এই ডায়েরি লিখছি। স্যামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানি ভেগে পড়েছে। আমাকে পায়নি। আমি তখন জঙ্গলে গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখলাম চোঁ-চাঁ করে ছুটে ঘোড়ায় টানা গাড়ি চেপে পালিয়ে গেল তিনজনে।

আকাশ-ছোঁয়া গাছগুলোর আড়ালে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখা দেবেও না। কথাও বলছে না। কথা বলতে জানে না। অথবা বলতে চায় না। কিন্তু ব্রেন-পাওয়ার বড় রহস্যময়। আমার ব্রেনে ধাক্কা মেরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল—কিন্তু চোট পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছিল। শুধু কিন্তু নয়—মরকুটে দুই স্যাঙাতও।

তবুও ওরা ওদের ক্ষতি করেনি। আমাকে শুধু তুলে এনেছে। প্রাণে বাঁচিয়েছে। দেশে ফিরিয়ে দেবে বলেছে। কীভাবে তা বলছে না। এখানেও একটু রহস্য আছে মনে হচ্ছে।

ব্রেনে-ব্রেনে কথা বলা ভারি মজার ব্যাপার। আমি শুধু ভেবেছি কী বলব, আর ওরা তার জবাব দিয়ে গেছে আমার ব্রেনের মধ্যে কথা ফুটিয়ে দিয়ে।

ওরা বলেছে, সামুয়েল অ্যান্ড কোম্পানির পৈশাচিক পরিকল্পনা ওরা পণ্ড করে দেবেই—স্রেফ দূর থেকে ব্রেন ফোকাস করে। ওদের কুটিল কল্পনা মোড় নেবে অন্যদিকে। পৃথিবী সুন্দর সবুজই থাকবে, বৈচিত্র্যের সমাহার থাকবে—যেমন ছিল, যেমন আছে, তেমনি থাকবে—অমানুষদের নৃত্য এখানে চলবে না। কারণটা আমিও জানতাম। ওরাও জানে। ব্রেনের ওজন কম থাকায় পিগমি সামুয়েলদের মনের জোর অনেক কম, যুক্তি জোরালো নয়। বেশি বেঁটে হওয়ার এইটাই বিপদ।

ওরা ওদের চেহারা দেখাতে চায় না—সহ্য করতে পারবে না বলে। ধোঁয়ার থাম কোত্থেকে এই অঞ্চলে এসেছিল—তা ওরা জানে—কিন্তু বলবে না। কিছু রহস্য পৃথিবীর লোকের অজ্ঞাতেই থাকুক।

যেমন অজ্ঞাত থাকুক এই অঞ্চল—টেরা ইনকগনিটো হয়ে থাকুক বিশ্ববাসীর কাছে।

ঘুম আসছে কেন?...

৭ জানুয়ারি ১৯...

ঠিক একমাস পরে শেষ করছি দিনপঞ্জী। একমাস আগে ডাইরি লিখতে-লিখতে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ওরাই আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপর দীননাথকে এনে দিয়েছিল পাশে।

হতভাগা পয়লা নম্বর টিকটিকি। লুকিয়ে সটকান দিয়েছিলাম কলকাতা থেকে—কিন্তু খুঁজে-খুঁজে চলে এসেছিল সেই জাহাজে চেপেই—যার মধ্যে ছিলাম আমি আর বিশু।

তারপর যেই হারিয়ে ফেলেছিল বেচারি। এই এরা...বিশাল জঙ্গলের অদৃশ্য মহাকায়রা...ব্রেন ফোকাস করে ওকে নিয়ে এসেছিল আমার পাশে।

কাঁকড়া

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র খুব বিরক্ত হলেন।

আমি বললাম,—নিজের চোখে দেখলাম। আমি কি মিথ্যে বলছি?

প্রফেসর বললেন,—আমার মাথায় এখন কুপার বেল্ট ঘুরছে। কাঁকড়া নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই।

রাগ হয়ে গেল আমার,—কুপার বেল্ট রয়েছে প্লুটো গ্রহের ওপাশে—ঠান্ডা বরফের জগৎ; আর, কাঁকড়া ঘুরছে আপনার বাড়ির দেওয়ালে।

—বাড়ির দেওয়ালে কখনও কাঁকড়া ঘোরে না। কাঁকড়া টিকটিকি নয়।

ঠিক এই সময়ে টেলিফোন এল আমেরিকা থেকে। প্রফেসর কিড়মিড় করে কিছুক্ষণ ইংরিজি-টিংরিজি বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। গুম হয়ে রইলেন।

আমি বললাম,—হল কী?

প্রফেসর বললেন,—দেখো, দীননাথ, তোমার এই খ্যাচ হ্যাকিটা আমার মোটেই ভালো লাগে না। যখন চিন্তা করব তখন কথা বলবে না।

চুপ করে রইলাম। ঘড়ির দিকে চেয়ে রইলাম। ঠিক তিন মিনিট তিরিশ সেকেন্ড পরে ধ্যান ভাঙল প্রফেসরের। বললেন,—কাঁকড়া দেখেছ? দেওয়াল বেয়ে উঠছে?

—আপনার বাড়ির পেছন দিকে। যেখানে কেউ থাকে না। শুধু জঙ্গল।

—তুমি ওদিকে গেলে কেন?

—খট-খট-খট-খট আওয়াজ শুনলাম যে। ঠিক যেন তাসার বাজনা। খট-খট-খটাস...খট-খট-খটাস...।

—শুনেছি-শুনেছি, তুমি সেই আওয়াজ শুনে দৌড়লে?

—নিশ্চয়। এত বড় বাড়ি...আপনার ঠাকুর্দার তৈরি...জঙ্গল তো ঘিরে ফেলেছেই...আপনিও ঘরে-ঘরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন...কে কোথায় ঢুকে বসল, দেখতে হবে না?

কাঁকড়া! কাঁকড়া! —বলে চুপ মেরে গেলেন প্রফেসর। মুখ দেখে বেশ বুঝলাম অন্য কথা চিন্তা করছেন। আমিও চুপ করে রইলাম। ঘর নিস্তব্ধ।

খট-খট-খটাস...খট-খট-খটাস শব্দটা তাই স্পষ্ট শুনতে পেলাম। প্রফেসর তখন এতই অন্যমনা যে শুনতেই পেলেন না। আমার কিন্তু স্পষ্ট মনে হল, বন্ধ জানলার সার্সিতে কেউ নক করছে।

ভয়ে-ভয়ে বললাম,—প্রফেসর।

প্রফেসর বললেন,—শুনেছি।

কিন্তু মুখ দেখে তো মনে হল না কিছু শুনতে পেয়েছেন। ঠিক এই সময়ে খট-খট-খটাস শব্দটা আবার শোনা গেল—এবার আরও জোরে। ঝন-ঝন করছে জানলার কাচ। প্রফেসরের চোখ আস্তে-আস্তে ঘুরে গেল জানলার দিকে। শীতের রাত। দোতলার ঘর। বাগানের দিকের জানলা। বিকেলের দিকে যাকে দেখেছিলাম—তার আবির্ভাব ঘটেনি তো?

গা ছম-ছম করে উঠল। কাঁকড়া তো দেওয়াল বেয়ে ওঠে না। তবে এ কে? খট-খট-খটাস...ঝন...ঝন...ঝনাৎ...

সার্সির একটা কাচ ভেঙে ঠিকরে পড়ল মেঝের ওপর। শক্ত হয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া।

ভাঙা কাচের ফুটো দিয়ে প্রথমে গলে এল একটা ভয়াবহ জিনিস। নীল রঙের একটা কাঁকড়ার দাড়া।

ডগায় দুটো ধারালো আঁকশি খাঁজকাটা বাসের মতো নড়ছে। দুমুখ এক হচ্ছে, ফের খুলে যাচ্ছে।

কাঁকড়ার দাড়া এত বড় হয় না। প্রায় এক বোম্বা লম্বা দাড়া জীবনে দেখিনি। বিশেষ করে নীল রঙের কাঁকড়া। কাঁকড়া খেতে আমি ভালোবাসি। কিন্তু এই দাড়া দেখে গলা শুকিয়ে গেল আমার।

খট-খট-ঝন শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে ভাঙা কাচের বাকি অংশটুকুও ভেঙে পড়ল ভেতরে। অন্য দাড়া দিয়ে ঠুকে-ঠুকে গোটা বডিটাকে কাঠের ফ্রেমে টেনে তুলল নীল কাঁকড়া। ইয়া আটেক ব্যাস।

অতিকায় কাঁকড়ার চোখ কিন্তু কাঠির ডগায় নেই। বর্মের গায়ে বসানো মানুষের মতো না হলেও চাহনিটা পাশবিক বা হিংস্র মনে হল না—মানবিক না হলেও কেমন যেন বুদ্ধিদীপ্ত। মায়া-মমতায় স্নিগ্ধ বলেও যেন মনে হল। এমনি মনে হওয়ার কোনও কারণ আমি দর্শাতে পারব না। তবে এটা ঠিক যে, এরকম চারকোণা চকচকে চোখ পৃথিবীর কোনও পশু বা পক্ষীর আছে বলে আমি জানি না।

আড়চোখে দেখলাম, প্রফেসর চোখের পাতা ফেলছেন না। অতিকায় আগন্তুকের দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে আছেন।

ঠকাস করে সিমেন্টের মেঝের ওপর লাফিয়ে পড়ল দানব-কাঁকড়া। বুকটা ধড়াস করে উঠেছিল আমার। নীল আতঙ্ককে আরও মন দিয়ে দেখতে লাগলেন প্রফেসর। তারপর গালে হাত দিয়ে বসলেন।

বললেন,—দীননাথ, একেই দেখেছিলে দেওয়াল বেয়ে উঠতে?

আমার গলা শুকিয়ে গেছিল। তাই ওপর নিচে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

আশ্চর্য। অতিকায় কাঁকড়ার সামনের দাড়াটাও ওপর-নিচে একইভাবে নড়ে যেন সায় দিয়ে গেল। নরম চাহনি মেলে তাকিয়ে রইল প্রফেসরের দিকে। তারপর তাঁর দিকেই এগিয়ে এল কড়মড় আওয়াজ করে।

প্রফেসর বললেন,—তিষ্ঠ।

কাঁকড়া দাঁড়িয়ে গেল।

প্রফেসর বললেন,—তুমি সংস্কৃত জানো?

কাঁকড়ার দাড়া থর-থর করে কাঁপতে লাগল। আবার আমার মনে হল, (কেন মনে হল, তা বলতে পারব না)—কাঁকড়া বুঝতে পারছে না, 'না' বলতে হলে কীভাবে দাড়া নাড়াতে হবে।

মনটা নরম হয়ে গেল আমার। ডাইনে-বাঁয়ে ঘাড় নেড়ে দেখালাম, কীভাবে 'না' বলতে হয়।

আমার ঘাড়নাড়া দেখল অপার্থিব কাঁকড়া। সঙ্গে-সঙ্গে দাড়া নাড়ল ডাইনে আর বাঁয়ে।

বুঝেছি,—বললেন প্রফেসর, তুমি সংস্কৃত জানো না, বাংলাও জানো না—অথচ বুঝতে পারছ কী বলতে চাইছি।

ওপরে-নিচে দাড়া নেড়ে সায় দিল কাঁকড়া।

—বাঃ-বাঃ, তাহলে তো হয়েই গেল। তুমি টেলিপ্যাথি জানো, মানে, আমার মনের কথা তোমার মন ধরে ফেলছে?

দাড়া নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল কাঁকড়া।

—সাবাস, বললেন প্রফেসর, তাহলে বাপু, তোমার মনের কথা আমি কেন ধরতে পারছি না?

অদ্ভুত একটা কাণ্ড করে বসল দানব-কাঁকড়া। কড়মড় করে সিমেন্টের মেঝের ওপর দিয়ে সড়াৎ করে চলে এল প্রফেসরের পায়ের কাছে। প্রফেসর যেই হেঁট হয়ে তাকে দেখতে গেছেন, অমনি টপাং করে লাফ দিয়ে উঠে পড়ল তাঁর মাথায়।

আমি আঁতকে উঠেছিলাম। প্রফেসর কিন্তু নির্বিকার। তাঁর মুন্ডুর চাইতেও বড় একটা বিভীষিকাকে মাথার ডগায় নিয়ে শিরদাঁড়া সিধে করে বসলেন। অমনি কাঁকড়া তার ভয়াবহ দুটো দাড়া দু পাশে নামিয়ে দিয়ে চেপে বসাল দুই রগের ওপর।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। প্রশ্ন যে ফুটো হয়ে যাবে এখুনি। তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম।

প্রফেসর থমকে উঠলেন,—স্থির।

দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখলাম, প্রফেসর শিবনেত্র হয়ে আছেন। সুস্পষ্ট মনে হল, কী যেন শুনছেন। ফিক করে একবার হাসলেন। ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন। তারপর ঘাড়-টাড় না নেড়ে মুচকি-মুচকি হেসেই চললেন।

ব্যাপার কী?

প্রফেসর তাকালেন আমার দিকে। বললেন,—ব্যাপার ভারি মজার। দেখলে তো, তুমি মনে-মনে যা ভাবলে, আমি তা বুঝে গেলাম। ঠিক যেন তুমি আমার মাথার মধ্যে কথা বললে। দীননাথ, আমার ব্রেনে টেলিপ্যাথির ক্ষমতা ঢুকিয়ে দিয়েছে এই কাঁকড়া। ওর সঙ্গে বেশ তো কথা বলছি, কেন বিরক্ত করছ?

যাচ্চলে। ভালো করতে গিয়েও ধমক। প্রফেসর ফের শিবনেত্র হয়ে ফিক-ফিক করে হাসছেন দেখে গুম হয়ে বসে পড়লাম সোফায়।

মিনিট পাঁচেক পরে একলাফে প্রফেসরের মাথা থেকে সিমেন্টের মেঝেতে নামল দানব-কাঁকড়া। খুব যে উৎফুল্ল হয়েছে তা ওর বিরাট লাফ দেখেই বুঝলাম। প্রফেসরের পায়ের কাছ থেকেই একটি মাত্র লাফ মেরে, শূন্যপথে অতবড় দেহটাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে কেমন ভাঙা কাচের ফোকরে। ঘুরে, দাঁড়িয়ে দাঁড়া নেড়ে যেন টা-টা করে পিছু হটেই বেরিয়ে গেল বাইরে।

আর কি আমাকে রোখা যায়। দৌড়ে গেলাম জানলার সামনে। ঝটকা মেরে খুললাম পাল্লা। গরাদ নেই বলেই ঝুঁকে পড়লাম।

দেখলাম, দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মতন নেমে যাচ্ছে অতিকায় কাঁকড়া।

চাঁদের আলো ছিল বলেই দেখেছিলাম এই দৃশ্য—সেইসঙ্গে কাঁকড়ার বাহিনীকে।

বাগানের মাটি থুক-থুক করছে নীল কাঁকড়ায়। অসংখ্য টিবি বললেই চলে। তারা নড়ছে। মাটিও যেন ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

—ঠান্ডা হাওয়া আসছে দীননাথ। জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে আমার পাশে এসে বসো। কাঁকড়া কী বলে গেল, শুনে যাও।

নীল আতঙ্কদের দেখে আমার তখন মাথা ঘুরছে। টলতে-টলতে এসে বসলাম প্রফেসরের পাশে। উনি নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে বললেন, —এরা এসেছে ধূমকেতুদের জন্মভূমি থেকে।

—ধূমকেতুদের জন্মভূমি।

—ইয়েস মাই বয়। সৌরজগতের বাইরেই বরফ-বলয় সেই জন্মভূমি। প্রায় কুড়ি কোটি ধূমকেতু রয়েছে সেখানে, সাইজে তারা দশ থেকে পাঁচশো কিলোমিটার বড়।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে যে বরফরাশি, সেই কক্ষপথ রয়েছে নেপচুন গ্রহের ঠিক পরেই।

—ব-বলেন কী!

—চল্লিশ বছর আগে জেরার্ড কুপার ওই ধূমকেতু বেল্টের কথা বলেছিলেন। হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সবাই। সাড়ে চার বিলিয়ন বছর আগে সৌরজগতের জন্ম থেকেই রয়েছে এই বেল্ট। প্লুটোগ্রহ ওই কুপার বেল্টেরই সবচেয়ে বড় সদস্য। হ্যালির ধূমকেতুও আসছে ওখান থেকে—যার সাইজ মোটে দশ কিলোমিটার।

আমি ঢোক গিললাম।

প্রফেসর বললেন,—কুপার বেল্টের ধূমকেতুরা টহল দিয়ে চলে যায়—আবার আসে। কিন্তু আরও দূরের উর্ট মেঘ থেকে যেগুলো আসে, তারা একবার দেখা দিয়েই চলে যায়—আর ফিরে আসে না।

ধূমকেতু নিয়ে এত লেকচার ভালো লাগছে না। আমি বাড়ি ফিরতে চাই। কিন্তু যাব কী করে? নিচে পিলপিল করছে কাঁকড়া।

—ওরা ভালো কাঁকড়া। কিছু করবে না। ধূমকেতুর ল্যাজে বেঁধে স্পেসশিপ নিয়ে এসেছিল। আর-একটা ধূমকেতু আসছে। তাতেই চেপে চলে যাবে।

—আসছে! আর-একটা ধূমকেতু?

—আমেরিকা থেকে সেই খবরই তো পেলাম। ভড়কে যেও না। পৃথিবীর অনেক দূর দিয়ে চলে যাবে, এরাও ফিরে যাবে—যাবার আগে যে-খবরটা দিয়ে গেল, সেটা শুনলে তোমার রক্ত জমে যাবে।

আমি কান খাড়া করে শুনে গেলাম।

—দীননাথ। উর্ট ক্লাউড থেকে অনেক বছর আগে একটা ধূমকেতু এসেছিল। পৃথিবী ঘুরে চলে গেছিল। তাদের ল্যাজ থেকে স্পেসশিপ নিয়ে পৃথিবীতে নেমেছিল অন্য গ্রহের নৃশংস একদল প্রাণী। তাদেরও দেখতে কাঁকড়ার মতন। সাইজে তারাও অতিকায়। আদের খাদ্য নরমাংস।

—ন-ন-ন-।

—স্টুপিড। মানুষ যদি কাঁকড়া খেতে ভালোবাসে, তাহলে কাঁকড়া কেন মানুষ খাবে না?

—কী...কিন্তু এত বড় কাঁকড়া মানুষ খেলে মানুষ কি আর টিকবে?

—টিকবে না। সেই খবরই দিতে এসেছিল কুপার বেল্ট-এর এই কাঁকড়া। বলে গেল, ঝাড়ে-বংশে উর্ট মেঘের কাঁকড়ারা এখন বড় বেড়ালের সাইজ নিয়েছে। এতদিন লুকিয়েছিল পৃথিবীর বড়-বড় জঙ্গলগুলোয়। সেখানে মানুষের আকাল পড়েছে। তাই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে বড়-বড় শহরগুলোর দিকে। সুন্দরবনের দানব কাঁকড়া কলকাতায় নামবে কাল ভোরে...

—ভো...ভো...ভোরে...।

—ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাবে মানুষ। বাঁচবার পথ একটাই।

কী?—গলা চিরে বেরিয়ে এল 'কী' প্রশ্নটা।

প্রফেসর বলে দিলেন কী করতে হবে।

ভোরের আলো ফোটবার আগেই প্রফেসরের বাগানে যেখানে-যেখানে ফাঁকা জায়গা, সেখানে-সেখানে বড়-বড় উনুন জ্বলতে লাগল। বড়-বড় কড়াইতে রাশি-রাশি কাঁকড়া রান্না হতে লাগল। সারা রাত ধরে কলকাতার বাজারে-বাজারে হানা দিয়ে ঝুড়ি ভর্তি কয়েকশো কাঁকড়া জড়ো করেছিলাম, আমি একাই সাদা সরষে বাটা দিয়ে প্রাণপণে এমন কাঁকড়া রাঁধতে লাগলাম যে সুগন্ধ ভুর-ভুর করতে-করতে উঠে গেল আকাশের দিকে।

সেই গন্ধের টানে নিশ্চয়, উর্ট মেঘের অতিকায় সবুজ কাঁকড়ার দল তাদের অদ্ভুত ব্যোমযানে চেপে প্রথমে উড়ে এল প্রফেসরেরই বাগানের ওপর। চ্যাপ্টা থালার মতন দেখতে ব্যোমযান। একটা থালার ওপর উপুড় করা আর একটা থালা। চারদিকের কিনারায় অজস্র ফুটো। প্রতিটার মধ্যে দিয়ে লিকলিক করছে ভয়ানক ধারাল বাঁকা বল্লমের মতন বাঁকা দাড়া। ঝিলিক দিচ্ছে গনগনে চোখের আভাস।

ব্যোমযানগুলো নিঃশব্দে গাছের মাথায় এসে ভাসতে লাগল। ভয়ে কাঠ হয়ে গেলেও আমি আমার কাজ করে গেলাম—প্রফেসর যেমন শিখিয়ে দিয়েছিলেন—অবিকল সেইভাবে।

বড় থালায় রান্না করা কাঁকড়ার নালচে দাড়া একটার-পর-একটা তুললাম আর মাঝে-মাঝে খোলসমেত কড়মড় করে কামড়ে, চুষে খেতে লাগলাম।

আরও কয়েকটা থালা-ব্যোমযান উড়ে এল গাছেদের মাথায়। চোখ তুলে দেখলাম, থালাদের কিনারা ঘিরে অজস্র অতিকায় দাড়া হিংস্রভাবে আস্ফালন করছে। আমাকে পেলেই যেন ছিঁড়ে খাবে...

কিন্তু সুবুদ্ধি এল তারপরেই। নিমেষে সবক'টা থালা ব্যোমযান একসঙ্গে ছিটকে গেল নীল আকাশের দিকে—মিলিয়ে গেল দেখতে-দেখতে।

বাড়ির মধ্যে থেকে ছুটতে-ছুটতে বেরিয়ে এলেন প্রফেসর—দুহাতে তালি বাজাতে-বাজাতে বললেন,—সাবাস দীননাথ। এই একটা কাজের জন্যে রাষ্ট্রসংঘ তোমাকে বীর-পুরস্কার দেবে বলেছে। এইমাত্র খবর এল, গোটা পৃথিবীর সমস্ত ভিনগ্রহী কাঁকড়া পাঁই-পাঁই করে থালা ব্যোমযানে চেপে উড়ে গেল উর্ট মেঘের আগন্তুক ধূমকেতুর দিকে—ন্যাজে চেপে চম্পট দেবে বলে।

আমি তখন দরদর করে ঘামছি। কাঁকড়ার ঝোলে গোটা মুখ বিশ্রী। খেঁকিয়ে বললাম,—আমাকে দিয়ে এ-কাণ্ডটা না করালেই কি চলত না?

একটা বড় দাড়া তুলে নিয়ে চুষতে-চুষতে প্রফেসর বললেন,—এ-দৃশ্য না দেখালে কাঁকড়ারা ভয় পাবে কেন? একরাতে এত কাঁকড়া জুটিয়ে এমন খুশবুওলা রান্না করতে আর কে পারবে বলো!

চাঁদ ফিরে এল!

প্রথম খবরটি বেরোয় আজ থেকে প্রায় দুবছর আগে। রাশিয়া শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে চাঁদকে তাক করে। একটি নয়। পর-পর কয়েকটি। চাঁদের যেদিকটা চিরকালের জন্য রয়েছে আমাদের চোখের আড়ালে, ঘুরে গিয়ে সেই অঞ্চলেই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে কয়েকটি রকেট এবং রেডিও টেলিস্কোপ মারফত বহু মূল্যবান তথ্যই সংগৃহীত হয়েছে পৃথিবীর বুকে।

দ্বিতীয় খবরটি প্রকাশিত হয় এক বছর আট মাস আগে। খবরের কাগজের এক কোণের সামান্য খবর। অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেল। কিন্তু আমার গেল না এই কারণে যে, মঙ্গলের যমজ চাঁদ ডিমোজ আর ফোবোজ-এর মতো পৃথিবীর বুকেও জোড়া চাঁদ তোলা যায় কি না, এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ জটিল গবেষণা নিয়ে আমি দিবানিশি ব্যস্ত ছিলাম মহীশূরের এই নির্জন দুর্গম অঞ্চলে। তাই খবরটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

আশ্চর্য একটা ব্যাপার দেখা গেছে সূর্য গ্রহণের সময়ে। নির্ধারিত সময়ের চাইতে ৯ সেকেন্ড দেরিতে এসে উপস্থিত হয়েছিল চাঁদ।

খবরটা এমন কিছু চাঞ্চল্যকর নয় যে মনে রাখতে হবে। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী মহলে এই নিয়ে কিছুদিন দারুণ তর্কবিতর্ক চলল। তারপর নিজের গবেষণায় তন্ময় হয়ে যেতে এ ঘটনাও ভুলে গেলাম।

তার ঠিক এক বছর পরেই পয়লা অক্টোবর ব্রিটিশ লুনার সোসাইটি থেকে একটা চিঠি এল আমার নামে।

প্রিয় ডক্টর দত্ত,

গত বছরের সূর্যগ্রহণ লক্ষ করেছিলেন তো? এই সম্পর্কেই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য এখুনি আপনার লন্ডনে আসা দরকার। দেরি করবেন না। মনে রাখবেন, প্রতি মুহূর্তে ভয়ংকর বিপদের দিকে দ্রুত ধেয়ে চলেছে গোটা পৃথিবী। এ চিঠির বিষয়বস্তু গোপন রেখে ৯ই অক্টোবরের আগে লন্ডনে হাজির হবেন।

আপনার

ডক্টর পার্সিভাল

লন্ডনে থাকার সময় আমি যখন চন্দ্র সমিতির সেক্রেটারি ছিলাম, ডক্টর পার্সিভাল ছিলেন আমার অ্যাসিসট্যান্ট। সেই কারণেই জানতাম, অহেতুক উদ্বিগ্ন হবার মানুষ উনি নন।

তাই গবেষণা মুলতুবি রেখে কয়েকদিনের মধ্যেই আকাশপথে রওনা হয়েছিলাম লন্ডন অভিমুখে।

৯ই অক্টোবর তিলধারণের স্থান ছিল না লন্ডনের কনভেন্ট গার্ডেনের ৭৬ নং হারবারা স্ট্রিটের অধিবেশন কক্ষে। নির্দিষ্ট সময়ে রুদ্ধ হয়ে গেল হলের দরজা। মঞ্চের ওপর উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর পার্সিভাল।

ভদ্রমহোদয়গণ,

একটা অত্যন্ত দুঃসংবাদ শোনানোর জন্যই সমিতির সব সদস্যদের আহ্বান জানিয়েছিলাম আমি। আপনারা প্রায় সকলেই আমার সে আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন দেখে খুশি হলাম। মূল বক্তব্য শুরু করার আগে আমি একটি অনুরোধ করব। আজকে যে ভয়ংকর সংবাদ আপনারা শুনবেন, তা একান্তই গোপনীয়। কাজেই, এ প্রসঙ্গে কারওরই সঙ্গে আলোচনা করবেন না—এমনকী স্ত্রীর সঙ্গেও নয়। জনসাধারণকে আতঙ্কমুক্ত রাখার জন্যেই এত সতর্কতা। আমার এ অনুরোধ রক্ষা করা যদি আপনাদের কারওর পক্ষে সম্ভব না হয়, তবে তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করতে পারেন।

চুপ করলেন ডক্টর পার্সিভাল। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন কালো-সাদা অগুন্তি মাথার ওপর দিয়ে ঘরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। কিন্তু অতগুলি নিস্পন্দ দেহের মধ্যে কোথাও এতটুকু চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

বুকভরা শ্বাস নিয়ে শুরু করলেন ডক্টর পার্সিভাল,—ধন্যবাদ। আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত। গত বছর ৯ই আগস্টের সূর্যগ্রহণ আপনাদের মনে আছে কি? বিজ্ঞানী মহলে হই-হই পড়ে গিয়েছিল ছোট্ট একটা খবর নিয়ে—ক্রুস ব্যাক্তি ৯ সেকেন্ড দেরিতে এসে পৌঁছেছিল সেদিন।

রেকর্ড ঘেঁটে বিজ্ঞানীরা আর-এক বছর অপেক্ষা করাই শ্রেয় মনে করলেন। গত মাসের, ১৭ই জুলাই-এর সূর্যগ্রহণ না দেখা পর্যন্ত আলোচনা মুলতুবি রেখেছিলেন তাঁরা।

গত মাসের পর্যবেক্ষণের ফলে তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এখন আর ৯ সেকেন্ড নয়, সতেরো সেকেন্ড দেরিতে এসে পৌঁছেছে চাঁদ।

এই দেরির কারণও তাঁরা স্থির করেছেন এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত এমনই নির্ভুল যে, এ সম্পর্কে সন্দেহের আর এতটুকু অবকাশ নেই।

সৃষ্টির শুরু থেকে যে কক্ষপথে আবর্তিত হয়ে চলেছিল চাঁদ, কী এক অজানা শক্তি জোর করে সেই পথ থেকে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে অন্য এক পথে।

আপনারা জানেন, পৃথিবী থেকে চাঁদের যা দূরত্ব, তা গড়ে দুলক্ষ আটত্রিশ হাজার আটশো সাতান্ন মাইল। ১৭ই জুলাই মধ্যরাত্রে চাঁদ আরও পঁয়ত্রিশ হাজার তিনশো সাতান্ন মাইল কাছে এগিয়ে এসেছে।

হিসেব করে দেখা গেছে, গত প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় প্রায় আটশো মাইল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীর কাছে আসছে চাঁদ। যতই দিন যাচ্ছে ততই দিন পিছু মাইলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আজ মাঝরাতে পৃথিবী থেকে দুলক্ষ তিন হাজার পাঁচশো মাইল কাছে এসে পৌঁছবে। আগামীকাল এই সময়ে সাড়ে আটশো মাইলেরও আরও কিছু বেশি পথ এগিয়ে আসবে সে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে গোপন আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে ভয়ংকর এই সংবাদ আমরা আপাতত সর্বসাধারণের মধ্যে প্রচার করব না।

আজ অক্টোবরের পূর্ণিমা। বিজ্ঞানীর চোখে চাঁদের চেহারায় আকারে অনেক প্রভেদই ধরা পড়বে—কিন্তু সাধারণ মানুষের চোখে নয়।

কিন্তু নভেম্বরের পূর্ণিমায় চাঁদ আরও বিশাল হয়ে উঠবে—কেননা আরও তিরিশ হাজার মাইল কাছে এগিয়ে আসবে সে। তখন সাধারণ লোকের দৃষ্টিকেও আর ফাঁকি দেওয়া যাবে না।

ঠিক এই সময়ে টপ করে দাঁড়িয়ে উঠে সাদাচুল এক ভদ্রলোক শুধোলেন,—দুশো কোটি বছর ধরে চাঁদ যে কক্ষপথে বিচরণ করেছে, আজ হঠাৎ সে পথ পরিবর্তন করার কোনও কারণ কি আপনি জানাতে পারেননি?

দ্বিধায় পড়লেন ডক্টর পার্সিভাল,—দেখুন, অনেকগুলো থিওরি দিয়ে সমাধান করা যায় এ রহস্যের। কিন্তু—

আমি তা বলতে পারি,—উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললাম আমি।

অগণিত চোখের বিস্মিত দৃষ্টি এসে পড়ে আমার উপর। মৃদু গুঞ্জন পাখা মেলে ছড়িয়ে পড়ে ঘরের এ-কোণ থেকে ও-কোণে। একদম পেছনের সারি থেকে চেঁচিয়ে

ওঠে একজন,—আমরা শুনতে চাই—এ মহা দুর্দিনের জন্যে দায়ী কে? প্রকৃতি না পৃথিবী?

দম নিয়ে বললাম,—যদি বলি, পৃথিবী?

—পৃথিবী!

—হ্যাঁ, পৃথিবী। আমাদের চন্দ্র-গবেষণার বৃত্তান্ত নিশ্চয় আপনারা ভুলে যাননি।

বলে সংক্ষেপে বর্ণনা করলাম কীভাবে এক বছর চার মাস আগে পর-পর কয়েকটি রকেটের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল চাঁদের চিররহস্যাবৃত অঞ্চলে।

তা থেকে কী প্রমাণিত হয়? —একগুঁয়ে স্বরে শুধোলেন সাদাচুল ভদ্রলোক।

—সাউথ আমেরিকায় দশ হাজার টনের একটা বিরাট পাথরকে আর-একটা পাথরের ওপর এমন আশ্চর্য ভারসাম্য বজায় রেখে খাড়া থাকতে দেখা গেছে যে আঙুলের সামান্য ঠেলাতেই তা গড়িয়ে পড়তে পারে নিচে। ঠিক এমনিভাবে মহাশূন্যের মধ্যে ঝুলন্ত চাঁদেরও যে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়নি, তার কি কোনও প্রমাণ আছে? বিশেষ করে চাঁদের যে দিকে ফেটে পড়েছে রকেটগুলো, সেদিক থেকে তাকে একরকম জোর করেই ঠেলে বার করে দেওয়া হয়েছে কক্ষপথ থেকে—ঠেলে দেওয়া হয়েছে পৃথিবীরই দিকে।

ডক্টর দত্তর অনুমান অভ্রান্ত বলেই আমার বিশ্বাস,—বললে স্যার হারবার্ট স্বয়ং। ব্রিটিশ অ্যাসট্রনমিক্যাল সোসাইটির চেয়ারম্যান উনি। গুঞ্জনধ্বনির ওপরে নিজের ভরাট গলা তুলে আবার বললেন উনি,—আপনারা তো জানেন, স্যাটেলাইটের ধর্ম অনুযায়ী একদিন না একদিন পৃথিবীর বুকে চাঁদ ফিরে আসবেই আসবে। তবে অন্ততপক্ষে একশো কোটি বছরের আগে যে এ কাণ্ড ঘটবে না, সে বিষয়ে দ্বিমত ছিল না কারও। সম্প্রতি মানুষ তার জ্ঞানের স্পৃহা মেটাতে গিয়ে প্রকৃতির এই বিধানকেই ত্বরান্বিত করে তুলেছে। ম্লান হাসির আভা ছড়িয়ে পড়ে স্যার হারবার্টের সৌম্য মুখের পরতে-পরতে।

সসম্ভ্রম কণ্ঠে সাদাচুল ভদ্রলোক শুধোলেন,—কারণ না হয় বুঝলাম, কিন্তু পৃথিবীর পরিণাম কী? শেষ পর্যন্ত চাঁদ যদি পৃথিবীর বুকেই আছড়ে পড়ে, তবে সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে হয় পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আর না হয় কক্ষপথ থেকে ছিটকে বেরিয়ে খেয়ে যাবে সূর্যের দিকে—তাই নয় কি?

—তা নাও হতে পারে। কমলার গায়ে চেরিফলের ধাক্কায় কমলার কি কোনও ক্ষতি হয়? পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় চাঁদ তো চেরিফল ছাড়া আর কিছু নয়। তবে বন্যা, তুফান, এককথায় মহাপ্রলয়ের সব লক্ষণই দেখা দিতে পারে। আবার কিছু নাও হতে পারে।

—প্রায় একশো বছর আগে Roche একটা থিওরি শুনিয়েছিলেন। পৃথিবী থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে এসে পৌঁছলেই অভিকর্ষ এমনই প্রচণ্ড হয়ে উঠবে যে টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়বে চাঁদ। ফলে, আজকের শনিগ্রহের চারদিকে

যে বলয় দেখি টুকরো চাঁদের হবে সেইরকম একটা বলয় ঘিরে থাকবে পৃথিবীকে। প্রতিরাতে ধূমকেতুর বিশাল পুচ্ছের মতোই এক দিগন্ত থেকে আর-এক দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে দেখা দেবে এই পুচ্ছ।

আসল প্রশ্নটাই, কেউ জিগ্যেস করে না দেখে আবার দাঁড়াতে হল আমাকে। শুধোলাম,—আর, তাও যদি না হয়? সেক্ষেত্রে কবে আন্দাজ পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়বে চাঁদ, সে হিসেব কি করা হয়েছে?

থমথমে স্তব্ধতা নেমে আসে ঘরের মধ্যে। যেন অসহ্য উৎকণ্ঠায় অস্থির হয়ে ওঠে ঘরের বাতাস। অগুন্তি জোড়া-জোড়া চোখের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি এসে পড়ে ডক্টর পার্সিভালের মুখের ওপর।

এতটুকু চঞ্চল হলেন না ডক্টর পার্সিভাল। স্থির হাতে চশমার কাচ মুছে নিয়ে ধীরগম্ভীর স্বরে থেমে-থেমে বললেন,—আগামী ৪ঠা মে রাত ৮-৪০ মিঃ নাগাদ পৃথিবীর বুকে ফিরে আসবে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী—চাঁদ।

এই দীর্ঘ আটটি মাস কীভাবে কেটেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা আর দেব না। নভেম্বর থেকেই কানাঘুসো শুরু হয়। ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘ থেকে ঘোষণা করা হয় পৃথিবীর আসন্ন দুর্যোগের সংবাদ। ভূগর্ভে বহু লৌহ-প্রকোষ্ঠ তৈরি হয়েছিল মহাযুদ্ধের সময়ে। তারই অনুকরণে বিস্তর শেল্টার তৈরি শুরু হয়ে গেল সারা পৃথিবীময়। কিন্তু আতঙ্কের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেল না জনসাধারণ। ৪ঠা মে-ই যখন পৃথিবীর শেষ দিন, তখন ধর্মের নীতি, সমাজের ভুয়ো অনুশাসন মেনে চলে আর কোনও লাভ আছে কি? ভেঙে পড়ল সমাজব্যবস্থা। শুরু হল রাষ্ট্রবিপ্লব। আর পৃথিবীব্যাপী এই অরাজকতার মধ্যে বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে উঠতে লাগল চাঁদ। স্নিগ্ধ আভার বদলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল জ্বলন্ত চোখধাঁধানো দীপ্তি। শুরু হল প্রলয়ঙ্কর তুফান, জোয়ার-ভাঁটার তুমুল বিপর্যয়, প্রকৃতির কল্পনাতীত নির্মম প্রতিহিংসা-পর্ব।

তারপর এল সেই মুহূর্ত—৪ঠা মে-র রাত ৮-৪০ মিনিট। সংঘর্ষের বহুক্ষণ আগেই নিথর হয়ে গিয়েছিল সারা পৃথিবী। ঘনকালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল আকাশ। অসহ্য গুমোটে যেন দম আটকে আসতে চাইছিল।

একপরেই শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। পাহাড়ের একপাশে ছিল আমার গবেষণাগার। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্যে মনে হল যেন ঝুঁটি ধরে গোটা পাহাড়টাকে উপড়ে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দিতে চায় নিষ্ঠুরা প্রকৃতি।

যেমন আচমকা শুরু হয়েছিল, তেমনি অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল ঝড়ের দাপটও। অভিভূতের মতন কতক্ষণ যে বসেছিলাম জানি না, মহাপ্রলয়ের ডমরু সুরকেই স্তব্ধ হয়ে এসেছিল আমার স্নায়ুমণ্ডলী, হারিয়ে ফেলেছিলাম স্থান-কালের হিসাব...

আচমকা ঘরের বাতাস যেন ফেটে পড়ল...বিস্ফোরণটা ঘটল যেন ঘরের মধ্যেই...নিঃশব্দে জানলার কাচ ভেঙে উড়ে গেল বাইরের দিকে...কাচ ভাঙার কোনও

শব্দ শুনলাম না...ভাঙা ফাঁক দিয়ে হু-হু করে স্রোতের মতো বেরিয়ে যাওয়া টেবিলের কাগজপত্রগুলোরও খস-খস আওয়াজ ভেসে এল না কানে...

আর, নিদারুণ শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে লাগলাম আমি। অক্সিজেনের অভাবে যেন ফেটে পড়তে চাইল ফুসফুসটা। কারণ বুঝতে এক সেকেন্ডও গেল না। পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেল বায়ুমণ্ডল। তাই ঘরের বাতাস জানলার কাচ ভেঙে বেরিয়ে গেল বাইরের বায়ুশূন্য পৃথিবীতে। আর বায়ু না থাকার জন্যেই শব্দ না করে ভেঙে পড়ল জানলার কাচ।

দুই চোখে নিঃসীম মৃত্যু-বিভীষিকা নিয়ে কোনও মতে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, ফুসফুসের মধ্যে অবশিষ্ট বাতাসটুকু সম্বল করে অর্ধ-অচেতন দেহটাকে প্রাণপণ চেষ্টায় টানতে-টানতে পাশের ল্যাবরেটরির দরজার সামনে নিয়ে গিয়েছিলাম, তারপর দরজা খুলেই ভেতরের বাতাস-ভরা বিশেষভাবে তৈরি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ার আগে চেতনার আর শক্তির শেষ বিন্দু দিয়ে দরজার নিচের ফাঁকটুকু বন্ধ করে দিয়েছিলাম।

জ্ঞান যখন ফিরে এল, তখনকার সেই অসহ্য নীরবতার সঙ্গে তুলনা হয় না কোনও কিছুরই। দরজার নিচের ফাঁকটুকু সামান্য খুলে ধরলাম—না, ঘরের বাতাস ঘরেই থাকছে, দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে না বাইরে। একটু দ্বিধা করলাম। তারপর সাহসে বুক বেঁধে এক ঝটকায় খুলে ফেললাম দরজাটা।

হ্যাঁ, আবার ফিরে এসেছে পৃথিবীর বাতাস। আগের মতো বিশুদ্ধ নয়, সামান্য গন্ধকের গন্ধ মেশানো, কিন্তু তবুও তা বাতাস। ফুসফুস ভরে লম্বা শ্বাস নিয়ে তাকালাম ঘড়ির দিকে।

নটা তিরিশ মিনিট।

সংঘর্ষের সময় নির্দিষ্ট ছিল আটটা চল্লিশ মিনিটে।

আমি তা হলে মরিনি, পৃথিবী তা হলে শতধাবিদীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে যায়নি মহাশূন্যের দিকে-দিকে, অলৌকিক উপায়ে রক্ষা পেয়ে গেছে সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ পৃথিবী।

উল্লাসে অধীর হয়ে ছুটে এসেছিলাম সামনের দরজায়। এক ঝটকায় পাল্লা খুলেই থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম স্থাণুর মতো।

কানে ভেসে এসেছিল মৃদু-ছলাৎ-ছলাৎ শব্দ আর দৃষ্টির-পর্দায় ভেসে উঠেছিল কালো তমিস্রার মধ্যে এক বিপুল জলরাশির দৃশ্য। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দুহাজার ফুট ওপরে, সমুদ্রকূল থেকে তিনশো মাইল দূরে পাহাড়ের ওপর আমার গবেষণাগার। কিন্তু কী এক জাদু মন্ত্রে এই সমুদ্রই উঠে এসেছে আমার বাড়ির নিচে—প্রান্তরের বড়-বড় গাছগুলিও ঢেকে গেছে কালো জলের তলায়। একটু-একটু করে বৃদ্ধি পাচ্ছে জলের পরিমাণ। খুবজোর আর পাঁচশো ফুট—জল বৃদ্ধি যদি এর মধ্যে না থামে তা হলে পৃথিবীর সলিল সমাধি হয়ে যাবে এই আগন্তুক মহাসমুদ্রের নিচে।

মোমবাতির আলোয় লিখলাম এই কাহিনি। কেন লিখলাম জানি না। বিজ্ঞানের চরম ব্যর্থতার কথা স্মরণ করে আর বিধাতার অমোঘ বিধান প্রত্যক্ষ করেই বোধ করি লিখে রাখলাম এই মর্মন্তুদ ঘটনা। গত আট মাস ধরে পৃথিবীর সর্বত্র নির্মিত অগুন্তি পাতালঘরের মধ্যে যারা আশ্রয় নিয়েছিল, পৃথিবীব্যাপী প্লাবনের জল সরে গেলে তারাও হয়তো প্রত্যক্ষ করবে বসুন্ধরার এই শোচনীয় পরিণতি। এই কাহিনি লিখে গেলাম তাদের জন্যেই। কালো জল যেভাবে উঠে আসছে, তাতে বেশ বুঝছি, আমার আর বেশিক্ষণ নেই।

কোনওদিন কোনও দূর ভবিষ্যতে যদি কেউ জানতে চান, চাঁদের কী হল, তার উত্তরে আমি লিখে যাই, চাঁদ ফিরে এসেছে জননী পৃথিবীর বুকে। ঠাঁই নিয়েছে কোনও মহাসাগরের তলদেশে—এই বিপুল জলরাশিই সেই সংঘর্ষের মিলন-উচ্ছ্বাস। মহাসাগরের বুকে আড়াআড়িভাবে এককোণ থেকে আছড়ে পড়ার সময়ে এই বিপুল জলরাশিই স্প্রিংয়ের মতো শোষণ করে নিয়েছে সংঘর্ষের প্রচণ্ডতা। কিন্তু উথলে ওঠা জলরাশি প্রচণ্ড প্লাবনের আকারে গ্রাস করেছে [illegible] পৃথিবীর সমস্ত ভূখণ্ড।

ইলেকট্রিক মানুষ

সঞ্জয় বিশ্বাসকে দেখেছিলাম বইমেলায়। চারপাশে আলো-ঝলমলে দোকানগুলো থেকে একটু তফাতে মাঠের মাঝে বসে ইজেলটাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ছবি আঁকছিল।

বইমেলায় আমি যাই বই কিনতে নয়—বই দেখতে। আর মানুষ দেখতে। পেশায় আমি সাংবাদিক। চুটকি খবর জোগাড় করি সারাদিন। রাতে অফিসে বসে মজার-মজার খবর লিখে দিই। হ্যাঁ, আমারই নাম কল্পপ্রাজ্ঞ কর। সঞ্জয়কে দেখে থমকে গেছিলাম। ও যেখানে বসেছিল, সেখানে ল্যাম্পপোস্টের জোরালো আলো পৌঁছচ্ছিল না। দোকানগুলোর সামনে ফোকাস করা তীব্র আলোর ছিটেফোঁটাও যাচ্ছিল না। অন্ধকার জায়গাই বলা চলে। অথচ সেখানে বসে একমনে ছবি এঁকে যাচ্ছিল সঞ্জয়। ঘাড় ঝুঁকিয়ে নয়। শিরদাঁড়া সোজা করে। ইজেলটাকে ফুটখানেক তফাতে রেখে।

আমি পায়ে-পায়ে পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সঞ্জয় যা আঁকছিল, তা দেখতে পাচ্ছিলাম না, শুধু দেখছিলাম, খুব দ্রুত পেন্সিল টানছে ও। যেন সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে স্পষ্ট।

কৌতূহল বেড়ে গেল এই কারণেই। আর পাঁচজনে যা দেখেও দেখে না—সাংবাদিকের চোখ দেখতে পায় তার চাইতেও বেশি। সফল সাংবাদিকের মন্ত্রগুপ্তি এইখানেই।

কিন্তু আমার দম্ভকে চুরমার করে দিয়েছে সঞ্জয়। সে যে আমার চেয়ে আরও বেশি দেখতে পায়, সেই মুহূর্তে তা বুঝিনি। এককথায় বলতে পারি, দুনিয়ার কোনও মানুষ যা দেখতে পায় না—ও তাই দেখতে পায়।

তাই পেছন না ফিরেই দেখতে পেয়েছিল আমাকে।

হ্যাঁ। আমি যখন ওর পেছনে দাঁড়িয়ে ওর শক্ত বাঁশের মতো শিরদাঁড়া দেখে অবাক হচ্ছি, ও তখন দেখেছে আমাকে। পেছনে ঘাড় না ঘুরিয়েই দেখেছে। অথচ ছবিও এঁকে যাচ্ছে।

সেটা বুঝলাম ওর টিয়াপাখির মতো কণ্ঠস্বর শুনে। অদ্ভুত গলার আওয়াজ। ট্যাঁ-ট্যাঁ করলে কী হবে, বেশ পরিষ্কার। প্রত্যেকটা শব্দ যান্ত্রিক ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত।

আমাকে বলেছিল,—পেছনে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন? সামনে আসুন।

আমি হতভম্ব হয়ে আমার পেছনেই তাকিয়েছিলাম। কাউকে দেখতে না পেয়ে আবার সামনে তাকিয়ে দেখেছিলাম, শিরদাঁড়া একইভাবে শক্ত করে রেখে ছবি আঁকছে সঞ্জয়।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছিলাম। সঞ্জয় অমনি টিয়াপাখির মতো গলায় বলে উঠল,—আমি কথা বলছি, আমি। শিরদাঁড়াটা একটু স্টিফ হয়ে রয়েছে বলে পেছন না ফিরেই কথা বলছি। আমার নাম সঞ্জয় বিশ্বাস। ভ্যাগাবন্ড দি গ্রেট। আসুন, সামনে আসুন। এমন একটা স্টোরি আপনাকে শোনাব যা রাতারাতি আপনাকে ডাকসাইটে রিপোর্টার বানিয়ে দেবে।

শুনে খাড়া হয়ে গেল আমার মাথার চুল। বইমেলায় লাউডস্পিকারগুলোর হট্টগোল ছাপিয়ে ওর টিয়াপাখির মতো গলার আওয়াজ কেটে-কেটে বসে গেল মগজে।

পেছন না ফিরে শুধু দেখতেই পায়নি আমাকে সঞ্জয় বিশ্বাস নামে ওই ছোকরা—আমি যে সাংবাদিক তাও জানতে পেরেছে! অলৌকিক ব্যাপার নাকি?

সামনে গিয়েছিলাম নিমেষে। হনহন করে পা চালিয়ে সঞ্জয়ের সামনে গিয়ে বসেছিলাম।

ও কিন্তু চোখ তোলেনি। অল্প আলোয় দেখেছিলাম লম্বা-লম্বা চুল কপাল ছাড়িয়ে চোখের ওপর এসে পড়েছে। চোখের চেহারা ভালো দেখা যাচ্ছে না। দাড়ি আর গোঁফের জঙ্গলে মুখখানাও কিম্ভূতকিমাকার। গায়ে খদ্দরের হলদে পাঞ্জাবি। পাজামার নিচে পা দুখানা চটিপরা অবস্থাতেই ছড়িয়ে রেখেছে সামনে।

আমি ওর মুখোমুখি বসলাম। জিগেস করলাম,—আমার পেশা আঁচ করলেন কী করে?

এবার চোখ তুলল সঞ্জয়। এক হাত দিয়ে চুলগুলোকে সরিয়ে দিল চোখ আর কপালের ওপর থেকে। অবাধ্য চুল তাতেও বাগ মানছে না দেখে ঘাসের ওপর থেকে একটা গুজরাটি টুপি তুলে পরে নিল মাথায়।

ফলে, ওকে দেখতে হল আরও অদ্ভুত। একে তো খেতে-না-পাওয়া ওই চেহারা—তার ওপর এই সাজ—হাসব কী কাঁদব ভেবে পেলাম না।

সঞ্জয় চেয়েছিল আমার চোখে-চোখে। ধারাল চাহনি নয়। সারামুখে যেন ওই চোখদুটোই ওর সম্বল। এরকম শান্ত সমাহিত দৃষ্টি চট করে চোখে পড়ে না।

ও বললে,—কল্পজ্ঞাক্ষ কর, শুধু আপনার পেশা নয়—আপনার নামও আমি জানি। আপনার বাবার নাম মৃত্যুঞ্জয় কর, আপনার ঠাকুর্দার নাম—থাকগে, আপনার সমস্ত পূর্বপুরুষদের নাম, চেহারা, পেশা, চরিত্র সব আমি জানি। শুনবেন?

পাগল নাকি? ভাবলাম মনে-মনে।

সঞ্জয় সঙ্গে-সঙ্গে বললে,—লোকে তাই বলবে। পাগলাগারদে ঢুকিয়ে রাখবে। কিন্তু সেই পাগলদের অনেকের অস্বাভাবিক ব্রেন-পাওয়ারের হদিস পায়নি মৃত্যুর পরে ব্রেনে ছুরি চালিয়েও।

সঞ্জয় চুপ করল। আমি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলাম। ও ইজেলটা আমার দিকে ঘুরিয়ে ধরে বললে,—দেখুন কী আঁকছিলাম।

ছবি দেখেই চমকে উঠলাম। কারণ, সে ছবি আমারই ছবি। পেন্সিলে স্কেচ। কয়েকটা টান দিয়ে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছে আমার চোখ-মুখের সমস্ত বৈশিষ্ট্য। নাকের গড়ন আমার কোনওদিনই ভালো নয়। ডগাটা যেন চেপটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ছেলেবেলাতেই। মাথায় চুল নেই একেবারে। চোয়াল বুলডগের মতো। গায়ের রঙ মোষের মতো কালো। কানে লম্বা চুল, ঘাড়-গর্দানে শুয়োরের মতন।

সঞ্জয় অবিকল সেইভাবেই এঁকেছে আমাকে। দেখেই সন্দেহ হল। সাংবাদিকের চোখে ধুলো দেওয়া অত সহজ নয়। ফট করে বলে বসলাম,—আগে থেকে আঁকা ছবি।

সঞ্জয় সেইরকম ট্যাঁ-ট্যাঁ গলায় বললে,—মোটেই নয়। জীবনে আপনাকে দেখিনি। আপনার নামও শুনিনি।

খুব রাগ হয়ে গেল আমার। বইমেলায় বইচোর বেশ কয়েকজন দেখলাম এই কদিনে—এরকম ফোর-টোয়েন্টি তো দেখিনি। কিন্তু ওর মতলবটা কী?

কথাটা মনে ভেবেছি, অমনি সঞ্জয় বলে উঠল,—মতলব খারাপ নয়। আমি একজনকে খুঁজছি। আপনি তো পাঁচ জায়গায় ঘোরেন, অনেক লোককে দেখেন—নিশ্চয় সন্ধান পাবেন। দেখা হলে বলবেন, সঞ্জয় বিশ্বাস আর একবার বেহালা শুনতে চেয়েছে। আর একবার ইলেকট্রিক শক খেতে চেয়েছে। আর বলবেন, সঞ্জয় হাবাগোবা ছিল, হাবাগোবাই থাকতে চায়। অঙ্কের জাদুকর হতে চায় না, তৃতীয় চোখ চায় না।

আমি বললাম,—স্টোরি বলা শুরু করে দিলে মনে হচ্ছে।

সঞ্জয় বললে,—স্টোরির মতন করে লিখবেন, তাতেই সে খুঁজবে। নাম তার কমল ভাদুড়ি। বয়স বলা মুশকিল। দেখতে তাকে জোয়ান ছোকরার মতো—কিন্তু আসলে তার বয়সের গাছ-পাথর নেই। বেহালার মূর্ছনা শুনিয়ে আর ইলেকট্রিক শক

খাইয়ে আমাকে সে যে ক্ষমতা দিয়েছে, তার জোরেই বলতে পারি, বয়স তার একশো পঁয়ত্রিশ বছর। জন্ম এই কলকাতায়।

আমি থ হয়ে বসেই রইলাম। সঞ্জয় একনাগাড়ে তার স্টোরি যেভাবে বলে গেল, ঠিক সেইভাবেই লিখে যাচ্ছি।

—এখন যেখানে সুভাষ সরোবর, আগে সেখানে ছিল জল আর জঙ্গল। পাখি শিকার করতে খাস কলকাতার বাবু আর সাহেবরা যেত। কমল ভাদুড়িও গেছিল। কারণ সে ছিল জমিদার। বেহালা বাজানো ছিল তার একমাত্র কাজ। বন্ধুবান্ধব এলে যেত জঙ্গলে। যদিও চোখ আর কান দুটোরই বারোটা বাজিয়ে বসেছিল প্রৌঢ় বয়সেই।

এইরকম একদিন শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ তার মাথায় বাজ পড়ে। মাথায় মানে গাছের মাথায়। সেদিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল। কমল ভাদুড়ি দাঁড়িয়েছিল গাছের তলায়।

অজ্ঞান হয়ে যায় কমল ভাদুড়ি। বন্ধুরা তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। তারা মনে করেছিল মরেই গেছে ভাদুড়ি মশায়। হার্টবিট বন্ধ হয়ে গেছিল। তারপর তা আপনা থেকেই আবার চলতে আরম্ভ করে।

কিছুদিন পরেই পরিবর্তনগুলো দেখা যায়। অসম্ভব মনে হতে পারে—কিন্তু সত্যি। কমল ভাদুড়ির বয়স তখন পঞ্চাশ। চোখে ভালো দেখতে পেত না। কানেও কম শুনত। মাথায় চুল ছিল না একেবারে।

চকচকে টাকে প্রথমে দেখা গেল রোঁয়ার মতো চুল। তারপর মাথা ভরে গেল ঘন কালো চুলে।

চোখের দৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে এল চুল গজানোর সাথে-সাথে। স্বাভাবিক হয়ে এল কানে শোনার ক্ষমতা।

মুখের চামড়া টান-টান হয়ে এল একই সঙ্গে। সব মিলিয়ে মনে হল যেন জোয়ান ছোকরা হয়ে গেছে পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ়।

ভাগ্যিস ভাদুড়ি মশায়ের গিন্নি মারা গেছিল অনেক আগে—নইলে অশান্তি শুরু হয়ে যেত সংসারে।

অশান্তি ঘনিয়ে এল কিন্তু কমল ভাদুড়ির মনে। বন্ধুবান্ধব একে-একে খসে পড়ল তার পাশ থেকে। তারা ভয় পেয়েছিল। দানোয় পায়নি তো কমল ভাদুড়িকে? হার্টবিট বন্ধ হয়ে যাওয়া মানেই তো মরে যাওয়া। মড়ার মধ্যে প্রাণের সাড়া জাগিয়েছে কে? কোনও অশরীরী?

কমল ভাদুড়ি অশিক্ষিত ছিল না। সে বুঝেছিল বজ্রাঘাত তার প্রাণ হরণ করেনি—তার দেহকাণ্ডে অবিশ্বাস্য পরিবর্তন এনে দিয়েছে। যে গাছে বাজ পড়েছিল—সে গাছ কিন্তু বাঁচেনি।

পনেরো মিলিয়ন ভোল্টেরও বেশি ইলেকট্রিসিটি থাকে বজ্রের মধ্যে। আজকাল তো দেখাই যাচ্ছে, ইলেকট্রিসিটি ভাঙা হার্ট জুড়ে দিচ্ছে, হার্টকে চালু

রাখছে, দুর্বল ফুসফুসে শক্তি জাগিয়ে নিশ্বাস নিতে সাহায্য করছে, অসহ্য যন্ত্রণায় স্বস্তি এনে ছেঁড়া পেশি মেরামত করছে, জখম নার্ভের পুনরুজ্জীবনও বোধহয় আর বেশি দেরি নেই।

বজ্রাহত কমল ভাদুড়ির আমলে,—বিজ্ঞান এতটা এগোয়নি, সে কিন্তু বজ্র তথা বিদ্যুতের মহিমা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিল। বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা শুরু করে তখনি। সেইসঙ্গে ডুবে যায় বেহালার বাজনায়। নিজের প্রাসাদে বানায় ল্যাবরেটরি। ফিজিক্স তার সাধনা হয়ে দাঁড়ায়। বেহালার মধ্যেও যে পদার্থবিদ্যা কাজ করছে, বেহালার সুরের শব্দতরঙ্গ যে ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক শব্দতরঙ্গের মতোই—এ আবিষ্কার সে করে অনেক আগেই।

বেহালার সুর স্নায়ুকোষে আবেশ রচনা করে ব্রেন কেমিক্যালে হেরফের ঘটায়, এমনকী নিউরোট্রান্সমিটার সিরোটোনিন উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে অন্তর্দৃষ্টি জাগ্রত করে যে-কোনও মানুষকে ত্রিকালদর্শী মহামানব করে তুলতে পারে—এ আবিষ্কারও করে কমল ভাদুড়ি প্রায় একশো বছর আগে।

কমল ভাদুড়ি জানত, নিউরোন অর্থাৎ ব্রেন-সেলদের মাঝের ব্যবধান এক সেন্টিমিটারের বিশ-লক্ষ ভাগের একভাগ, কোষ থেকে কোষে চিন্তার গতি নির্ভর করে এই নিউরোট্রান্সমিটারের ওপর।

সঞ্জয় বিশ্বাস ছেলেবেলা থেকেই জড়ভরত। এপিলেপ্সি হয়েছিল মাথায় বলের চোট খাওয়ার পর থেকে। তারপর তার বুদ্ধিবৃত্তি কমে যায়। আই-কিউ এসে দাঁড়ায় ৬০-৭০ রেঞ্জে।

কমল ভাদুড়ি তাকে গায়েব করে নিয়ে যায় এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে। যে ঘরখানায় তাকে আটকে রাখে, সে ঘরের দেওয়ালে আর কড়িকাঠে খাটানো বিভিন্ন সাইজের বেহালা ফিট করা আছে। কোনওটাই ছড়ি টেনে বাজাতে হয় না—ইলেকট্রিক কারেন্ট বেহালা বাজায়। ঘরটাও আসলে একটা বেহালা। লম্বায় বারো ফুট।

এই ঘরের মাঝে হাবাগোবা সঞ্জয় বিশ্বাসকে শেকল বেঁধে শুইয়ে রেখেছিল কমল ভাদুড়ি। বুড়ো বয়সেও তখন তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। সঞ্জয়ের বয়স তখন আঠাশ। লেখাপড়া শেখেনি। কয়লার দোকানে কাজ করত। বাপ-মা কেউ নেই। বাড়ি-বাড়ি কয়লার বস্তা বয়ে নিয়ে যেত। এত শক্তি নিয়েও কমল ভাদুড়ির বাহুবলের কাছে সে হেরে গেছে।

মাসখানেক এই বেহালা-কক্ষে বেহালা শুনেছে সঞ্জয়। বিভিন্ন সুরে। খাওয়া বন্ধ ছিল। কমল ভাদুড়ি ওকে প্রতিদিন একটা করে ইঞ্জেকশন দিয়ে যেত। বলত, এই তোর কেমিক্যাল ফুড। চব্বিশ ঘণ্টা তোর শরীরের পুষ্টি মিটিয়ে তোর ব্রেনের কেমিক্যালকে পালটে দেবে। তুই অন্ধের জাদুকর মুনি ঋষিদের মতো বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু দেখতে পাবি, শুনতে পাবি। তোর তৃতীয় চোখ খুলে যাবে। অসাধারণ প্রতিভা পাবি।

আজকের নিউরোসায়েন্স যা জানে না, আমি তা জানি। টিউবারকিউলোসিস, এপিলেপ্সি আর কুৎসিত রোগাক্রান্ত ব্রেন-এর কেমিস্ট্রির সঙ্গে ইন্টার-অ্যাক্ট করে জিনিয়াস বানানো যায়—তা তারা জানে না। লিও টলস্টয় কুৎসিত রোগ আর মনের নেশায় কষ্ট পেয়েছে। ভিনসেন্ট ভ্যানগগ বিষাদ রোগ আর এপিলেপ্সিতে ভুগে পাগলাগারদে দিন কাটিয়েছে। লর্ড বায়রন বংশগত ম্যানডুলার ইমব্যালেন্স ছাড়াও এপিলেপ্সিতে কষ্ট পেয়েছে। পিয়ানিস্ট ফ্রেডরিক চোপিন টিউবারকিউলোসিস রোগে মাথা ঠিক রাখতে পারত না। অ্যালডাস হাক্সলি, প্রথম সূত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সব মানুষই ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু দেখতে পারে, সবকিছু জানতে পারে। কিন্তু তাহলে তার সব গুলিয়ে যাবে। সে পাগল হয়ে যাবে। তাই সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে ব্রেন আর নার্ভাস সিস্টেমের মধ্যে থাকে ডার্ক-গ্লাসের মতো ফিলটার। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতিবোধকে কমিয়ে দেওয়ার জন্যে।

কমল ভাদুড়ি অ্যালডাস হাক্সলির উপমা দিয়ে যা বুঝিয়েছিলেন, আসলে তা ব্রেন-সেলদের মধ্যে কেমিক্যাল জংশন সুইচ।

—তোর ব্রেনের হিপোক্যাম্পাস অঞ্চলের সিরোটোনিন-এর ঘাটতি ঘটিয়ে দিলেই উদ্দীপ্ত হবে তোর মগজ। তুই অবতার হয়ে যাবি। জিনিয়াস হয়ে যাবি। ভিনসেন্ট ভ্যানগগ হয়ে যাবি। বছর বছর ধ্যান আর তপস্যা করে সাধুরা যে ক্ষমতা পায়, সিরোটোনিন-এর ঘাটতি ঘটিয়ে সেই ক্ষমতা আমি তোর মধ্যে এনে দেব। বিদ্যুৎ, যন্ত্রণা আর কেমিক্যাল দিয়ে।

একমাস ধরে এমনি আবোল-তাবোল অনেক বকুনি শুনেছে সঞ্জয়। শুয়ে-শুয়ে শিরদাঁড়া শক্ত হয়ে গেছিল। ইলেকট্রিক শক মেরুদণ্ডের হাড়ে কিছু পরিবর্তনও এনেছিল। আজও তার মেরুদণ্ড বাঁশের মতো শক্ত। কিন্তু মগজে এসেছে অবিশ্বাস্য ক্ষমতা।

এক মাস পর আশ্চর্য মানুষ কমল ভাদুড়ি তার পরীক্ষা নিয়েছিল। বলেছিল, ঠিক এক মিনিট সময় দিচ্ছি। একটা গুণফল বল। ৩৬৫, ৩৬৫, ৩৬৫, ৩৬৫, ৩৬৫, ৩৬৫—গুণ করলে কত হবে?

সঞ্জয় গুণফলটা জেনে নিয়েছিল মনে-মনেই। আধ মিনিটের মধ্যে। বলেছিল, ১৩৩, ৪৯১, ৮৫০, ২০৮, ৫৬৬, ৯২৫, ০১৬, ৬৫৮, ২৯৯, ৯৪১, ৫৮৩, ২২৫।

হেসে বলেছিল কমল ভাদুড়ি,—পাশ করে গেলি। আজ থেকে তুই ম্যাথ-ম্যাজিশিয়ান। তোর মতো ইডিয়ট জিনিয়াস এই পৃথিবীতে অনেক এসেছে আর গেছে, কিন্তু আমিই প্রথম তোর নার্ভসেলগুলোকে কম্পিউটারের ক্ষমতা দিলাম বিদ্যুৎ, যন্ত্রণা আর প্রোটিন কেমিস্ট্রির দৌলতে। সঞ্জয় বিশ্বাস, তোকে ভ্যানগগ বানাব ভেবেছিলাম। আজ থেকে তুই বড় শিল্পী। মনের চোখ দিয়ে তুই দেখতে পাবি। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ তোর কাছে ছবির মতো সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বলতো আমি কে? কোথায় আমার জন্ম? কী ঘটেছিল আমার জীবনে?

সঞ্জয় বিশ্বাস সঙ্গে-সঙ্গে বলে গেছিল কমল ভাদুড়ির সমস্ত কাহিনি। চোখ বন্ধ করেই সে দেখতে পেয়েছিল অতীতের পুরো ছবিটা।

হাতে একটা ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ নিয়ে কমল ভাদুড়ি তার কাছে দাঁড়িয়ে শেষ কথাটা বলেছিল।

—সঞ্জয়, তুই এখন ঘুমিয়ে পড়বি। ঘুম ভাঙলে নিজেকে দেখবি এই ল্যাবরেটরির বাইরে। স্বাধীন। প্রচণ্ড ক্ষমতা তোর মগজে। ইচ্ছে করলে এই ক্ষমতার জোরে তুই পৃথিবীর সবচেয়ে বড়লোক হতে পারিস, পৃথিবীর নেতা হতে পারিস, অথবা অবতার হয়ে মানুষের মঙ্গল করতে পারিস। আর যদি এই জীবন সহ্য করতে না পারিস—খবরের কাগজে তা জানাবি। আমি তোকে তুলে নিয়ে গিয়ে ফিরিয়ে দেব তোর আগের মগজ।

আমি কোথায় আছি তা কিন্তু তোর এই ক্ষমতা নিয়েও জানতে পারবি না। তোর নিজের ভবিষ্যৎও কোনওদিন জানতে পারবি না। এই দুটো ব্যাপারে তোর ব্রেনকে আমি ভোঁতা করে রেখেছি।

কাহিনি শেষ করে সঞ্জয় বললে,—কনগ্রাচ্ছ কর, ছাপবেন স্টোরিটা?

আমি বললাম,—হ্যাঁ, ছাপব।

যন্ত্রের যন্ত্রণা

মানুষ বলতে পারো আমার কী অপরাধ? আমি একটা যন্ত্র, ধাতুর তৈরি যন্ত্র, তোমাদের মতো রক্তমাংস মেদমজ্জা দিয়ে তৈরি যন্ত্র নই, এই তো?

যন্ত্র তো বটে। মানুষ-যন্ত্র না হলেও একটা যন্ত্র এবং অনেক নিখুঁত, অনেক উন্নত যন্ত্র। আমিও সঙ্গী চাই, আমিও ভালবাসতে পারি।

হাঁ, হাঁ, হাঁ, ভালবাসতে পারি। অনুভূতিটা আমার যান্ত্রিক সত্তায় একেবারেই নতুন। তোমাদের এই রহস্যময় সবুজ গ্রহে আসার পর অনেক নতুন অনুভূতিই আমার সত্তায় এসে মিশেছে। সেটাই একটা রহস্য। বিরাট রহস্য।

অনেক অনুভূতি।

তার মধ্যে সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল কমলার কাছে থাকার ইচ্ছে। একটা আকর্ষণ। একটা ভাললাগা।

তোমাদের পার্থিব ভাষায় তারই নাম—ভালবাসা।

কিন্তু কমলা তা বোঝেনি।

বোঝেনি বলেই আজ আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে।

তার আগে বলে যাই আমার কাহিনি।

আমি এসেছি লাল গ্রহ থেকে। আমার সঙ্গে ছিল বিক্রো। আমার মনিব।

দূর থেকে সবুজ গ্রহের উজ্জ্বল সবুজ চেহারা দেখে আনন্দে আটখানা হয়ে বিক্রো বলেছিল,—সিরু, সবুজ গ্রহ তাহলে এসে গেল!

আমার কিন্তু তোমাদের এই সবুজ চেহারা ভাললাগেনি। লাল গ্রহের লালচে গাছপালা মাটি পাথরের মধ্যে একটা নিশ্চিন্দি ভাব ছিল। কিন্তু তোমাদের গাঢ় সবুজ রূপটাই যেন কেমনতর। তার ওপর শুধু জল আর জল। অনেক বড় তোমাদের গ্রহ—আমাদের লাল গ্রহের চাইতে বেশ বড়। কিন্তু এত জল? তখনি বোঝা উচিত ছিল তোমরা এখনও আদিম অবস্থা কাটিয়ে ওঠনি।

সবুজ গ্রহকে কয়েক পাক ঘুরে এল আমাদের স্পেসশিপ। তাজ্জব চেহারাও দেখলাম। কোথাও ধূ-ধূ মরুভূমি। কোথাও উঁচু-উঁচু প্রায় চৌকোণা পাথরের তৈরি শহর। পাথরগুলোয় ছোট-ছোট বিস্তর ছ্যাঁদা।

বিকো বললে,—এই হল সবুজ গ্রহের শহর। ওইগুলো ওদের ঘরবাড়ি।

আমি বললাম,—সে কী! ওদের কি গুহার অভাব ঘটেছে?

বিকো বললে,—লোক বেড়েছে বলেই হয়তো গুহা ছেড়ে পাথুরে গুহা বানিয়ে নিয়েছে। চলো, নামা যাক।

আমি বললাম,—কিন্তু ওদের মধ্যে নয়।

কেন? —বললে বিকো।

—কী দরকার? এসেছি জল মাটি গাছপালার নমুনা নিতে। সেই সব যেখানে আছে, সেইখানে নামি চল।

বিকো রাজি হল। তাই তোমাদের শহর থেকে অনেকদূরে একটা পাহাড় জঙ্গল-ঘেরা জায়গায় গিয়ে নামলাম। সাবধানের মার নেই বলে আমাকে নামিয়ে দিয়েই বিকো স্পেসশিপ নিয়ে উঠে গেল ওপর দিকে। আমি নমুনা সংগ্রহ করে সিগন্যাল পাঠালেই আবার নিয়ে যাবে আমাকে।

পাহাড়টার দিকে এগোচ্ছি, এমনসময়ে একটা প্রচণ্ড শব্দ শুনলাম পেছনে—মাথার ওপর। সেই শব্দে আমার সেনসিটিভ প্লেট যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

পেছন ফিরে দেখলাম, স্পেসশিপের চিহ্ন নেই কোথাও। ভাঙাচোরা ধাতু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে।

স্পেসশিপ ফেটে উড়ে গেল কেন, এ রহস্য পরে সমাধান করেছিলাম।

বিকোর পিণ্ডিপাকানো মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলাম কিছু দূরে। অত উঁচু থেকে আছড়ে পড়ায় একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে—চেনা যায় না। আমি এগিয়ে গিয়ে আমার সামনের দুটো ডাণ্ডার ওপর তুলে নিলাম ওকে। দুঃখ হল থপথপে দেহটার জন্যে। আমার মতো যন্ত্র হলে নিজেই নিজেকে সারিয়ে নিতে পারত। পার্টস পালটে নতুন হয়ে যেতে পারত। আমরা মেশিনরা এই সুবিধে—তোমরা নয়।

এমনসময়ে একটা হই-হই আওয়াজ শুনলাম পেছনে।

বিকোকে ডাণ্ডায় শুইয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম। জঙ্গলের মধ্যে থেকে দুপেয়ে কতকগুলো প্রাণী ছুটে আসছে আমার দিকে। মানুষ, সেই তোমাদের প্রথম দেখলাম।

তোমাদের দুটো মাত্র পা দেখে অবাক হলাম। তোমাদের সারা শরীর অদ্ভুত ঢাকনায় ঢাকা দেখে তাজ্জব হলাম। এরই নাম পোশাক। সত্যিই তোমরা একেবারেই আদিম।

তোমাদের হাতে সরু-সরু ডান্ডা দেখে একটু ভয় পেলাম। ডান্ডাগুলো তোমরা আমার দিকে উঁচিয়ে ধরে এগিয়ে এলে।

আমার চিন্তা-দর্পণে তোমাদের উচ্চ কণ্ঠের কথাগুলো ছবি হয়ে এসে ভেসে উঠেছিল বলেই বুঝলাম তোমরাও আমাকে দেখে ভয় পেয়েছ। আমার আটটা পা, চারটে হাত, আর আলমারির মতো ধড় দেখে তাজ্জব হয়ে গিয়েছ।

আমি এক-পা এগোতেই মানুষগুলো দশ-পা পেছিয়ে গেল। ভয় পেয়েছে। চিন্তার ছবি এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আমি চিন্তার কথা পাঠালাম আমার ট্রান্সমিটার থেকে—ওরা ধরতে পারল না।

তখনি আরও ভালো করে বুঝলাম—চিন্তার ঢেউ ধরার মতো মগজ তোমাদের নেই। তোমরা অত্যন্ত আদিম। তাই মুখ নেড়ে-নেড়ে অত কথা বলছ। বিকো যদি বেঁচে থাকত, দেখতে পেতে লাল গ্রহের প্রাণী কত উন্নত, কত সভ্য।

আমি বিকোর তালগোল পাকানো জেলির মতো থলথলে দেহটা আস্তে-আস্তে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে আমার ট্রান্সমিটার থেকে চিন্তার কথা পাঠালাম। বললাম,—আমি বন্ধু। একটা ডান্ডা আকাশের দিকে তুলে বললাম,—লাল গ্রহ থেকে এসেছি।

সূর্যের আলো ঝলসে গেল আমার চকচকে ডান্ডা থেকে। মানুষগুলো ভাবল আমি বুঝি ওদের ক্ষতি করতে যাচ্ছি। আচমকা একজনের হাতের সরু ডান্ডা থেকে এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল।

ঠক্যাং করে শব্দ হল আমার বুকের প্লেটে। ক্ষতি কিছু হল না। তবে আবার যদি আক্রমণ চালায় লেন্স ভেঙে যেতে পারে। তাই আটখানা পা একসঙ্গে চালিয়ে ছুটে গেলাম জঙ্গল আর পাহাড়ের দিকে। চক্ষের নিমেষে হারিয়ে গেলাম জঙ্গলে।

আমি ছুটে চললাম। আটখানা পায়ের গতিবেগ যে কতখানি, তা তোমরা দুপেয়ে মানুষরা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। প্রায় সারাদিন ধরে বাতাসের বেগে জঙ্গল তছনছ করে ছুটে একটা গুহা দেখতে পেলাম পাহাড়ের গায়ে। ঠাঁই নিলাম সেইখানে।

তখন সন্ধে হচ্ছে। লাল সূর্য ডুবে যাচ্ছে। চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম। অনেকক্ষণ পরে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল। লাল গ্রহকে দেখতে পেলাম আমার শক্তিশালী টেলিস্কোপিক লেন্সের মধ্যে দিয়ে। ওই আমার দেশ। ওদেশে আর কোনওদিন ফিরতে পারব না।

আশ্চর্য, এই সবুজ গ্রহে আমার প্রথম অভিজ্ঞতা হল তোমাদের হিংসাবৃত্তি। আমি কোনও ক্ষতি করিনি—কিন্তু আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করলে তোমরা মানুষরা। তোমরা সভ্য নও। অনেক লক্ষ বছর লাগবে লাল গ্রহের প্রাণীদের পর্যায়ে আসতে।

আমি একা। বড় একা। মানুষ আমার বন্ধু হতে পারে না—পারবে না।

তোমাদের চিন্তা নেই, মগজ থেকেও নেই, তোমরা হিংস্র, তোমরা আদিম। আমার বন্ধু হতে পারে একমাত্র মেশিনরা। আমার মতো যন্ত্ররা। যারা হিংস্র নয়, যাদের বুদ্ধির শক্তি তোমাদের চাইতে ঢের-ঢের বেশি।

আচমকা একটা আওয়াজ ভেসে এল কানে। মেশিনের আওয়াজ না?

দৌড়ে নেমে গেলাম পাহাড় বেয়ে নিচে। আঁকাবাঁকা রাস্তা বেয়ে আসছে একটা অদ্ভুত যন্ত্র। লেন্স ফোকাস করে হতাশ হলাম যন্ত্রের চেহারা দেখে। চাকাওয়ালা যন্ত্র। চারটে চাকার ওপর গড়গড়িয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। আমার মতো আট পায়ের যন্ত্র হলে পাহাড়-পর্বত, জল-জঙ্গল সবরকম জায়গায় যেতে পারত—কিন্তু চাকা থাকার ফলে এ যন্ত্র সমতল পথ ছাড়া যেতে অক্ষম।

তোমাদের সবুজ গ্রহের অমানুষদের দেখে যে রকম হতাশ হয়েছিলাম, ঠিক সেই রকমই কুণ্ঠা দমে গেল প্রথম যন্ত্রের চেহারা দেখে। এখানেও সেই আদিমতা।

আমি গিয়ে দাঁড়ালাম পথ জুড়ে। সঙ্গে-সঙ্গে আর্তনাদ করে উঠে যন্ত্রটা টলমল করে উঠল—ছিটকে গিয়ে রাস্তার পাশে পাথরে লেগে উলটে গেল। ভেতর থেকে হিড়বিড়িয়ে বেরিয়ে এল একটা মানুষ। অদ্ভুত ঢাকনা দিয়ে সারা শরীর ঢাকা। প্রথম যে অমানুষদের দেখেছিলাম, তাদের মতো দেখতে নয়।

মানুষটা বিষম ভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে প্রায় লেপটে গিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখে আর এগোলাম না। দূর থেকেই লেন্স ফোকাস করে দেখলাম নতুন মানুষের চেহারাটা। তখন অন্ধকার। কিন্তু ইনফ্রা-রেড রশ্মি দিয়ে দেখি বলেই অন্ধকারেও দেখতে পেলাম তার ভয়ে সিঁটিয়ে থাকা মুখখানা।

এবার বুঝলাম। একটা মেয়ে। পুরুষ নয়। প্রথম যাদের দেখেছিলাম তারা পুরুষ।

মেয়েটা তখনও ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছে দেখে ওর দিকে না এগিয়ে উলটোনো যন্ত্রটার দিকে এগিয়ে গেলাম। সবুজ গ্রহের প্রথম যন্ত্রের সঙ্গে আলাপটা সেরে নেওয়া যাক। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম—কিন্তু নিজে থেকে সিধে হল না সে।

সামনের জাঁড়া দিয়ে চার চাকার ওপর দাঁড় করিয়ে দিলাম বিদ্যুতে যন্ত্রটাকে। কিন্তু পয়লা নম্বরের অকৃতজ্ঞ বলেই ধন্যবাদ পর্যন্ত জানাল না।

তারপর বুঝলাম, এরকম নিকৃষ্ট শ্রেণীর যন্ত্র লাল গ্রহে আমরা বাচ্চাদের খেলনা হিসেবেও দিই না। এ যন্ত্র নিজে থেকে সিধে হতে জানে না, নিজেকে নিজে মেরামত করতে পারে না, এমনকী নিজের অবস্থা ভাষায় বা চিন্তা প্রকাশ করবার ক্ষমতাও রাখে না।

বেশ কয়েকবার ট্রান্সমিটার দিয়ে চিন্তার ঢেউ পাঠিয়েও যখন কোনও সাড়া পেলাম না—তখন আকাশের লাল গ্রহের পানে তাকিয়ে আপন বললাম মনে-মনে,—একা। আমি বড় একা।

আমার তখনকার নিদেন অবস্থা তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। তোমরা,

মানুষরা দল বেঁধে থাকো। তোমাদের মেশিনরা আজ কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তি কাকে বলে জানেনি। কিন্তু আমি মেশিন হলেও বুদ্ধি ধরি, কৃত্রিম হলেও চেতনা বলে একটা বস্তু আমার আমার আছে—তাই বড় একা লাগল নিজেকে—বড় একা।

মনটা হু-হু করে উঠল। লাল গ্রহে এতকাল কাটিয়েছি, কখনও মনে এরকম বিচিত্র যন্ত্রণা অনুভব করিনি।

অদ্ভুত পোশাক পরা মেয়েটা গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে তখনও চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। আমি একটু তফাতে সরে গেলাম। মেয়েটা ভয়ে-ভয়ে চেয়ে রইল। আরও দূরে সরে গেলাম। মেয়েটা গুঁড়ির আড়াল থেকে আস্তে-আস্তে বেরিয়ে এল। চার চাকার যন্ত্রে উঠে বসল। এটা, টিপল, ওটা নাড়ল—আচমকা যন্ত্রটা ককিয়ে উঠল—তারপর একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ করে চুপ মেরে গেল।

বুঝলাম যন্ত্র বিগড়েছে। বাজে যন্ত্র বলেই নিজেকে সারাতেও পারছে না। শুনেছি, লক্ষ-লক্ষ বছর আগে লাল গ্রহের যন্ত্ররা নিজেদের মেরামত করতে পারত না। এখানেও সেই অবস্থা।

আমি পায়ে-পায়ে বেরিয়ে এলাম। এই সময়ে আকাশে চাঁদ উঠল। চাঁদের আলোয় আমার চকমকে দেহ ঝলমল করে উঠল। মেয়েটা চারচাকার যন্ত্র থেকে নেমে ছুটে পালিয়ে গেল গাছের আড়ালে।

আমি যন্ত্র। সেবা করাই আমার কাজ। কিন্তু সেদিন শুধু সেবা করার জন্যে আমি এগোইনি—মেয়েটার জন্যে মায়া হচ্ছিল। মন কেমন করছিল। তোমাদের সবুজ গ্রহে এসে মায়া কাকে বলে, সেই প্রথম জানলাম। অনেক আশ্চর্য অনুভূতির মধ্যে—মন কেমন করা কাকে বলে, সেই প্রথম শিখলাম।

আমি গিয়ে বিদঘুটে যন্ত্রটার বনেট খুলে যন্ত্রপাতি, নাড়াচাড়া করলাম। একেবারেই সেকেলে মেশিন। কিছুক্ষণ পরেই মেশিন চালু করে দিয়ে সামনের চকচকে ডান্ডা থেকে ঘন তেল-কালি মুছতে-মুছতে উঠে দাঁড়ালাম। একটু সরে গিয়ে ডান্ডা নেড়ে মেয়েটিকে গাড়িতে উঠতে বললাম। আরও সরে গেলাম। মেয়েটা এসে গাড়িতে বসে গড়গড়িয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল দূর হতে দূরে।

আমি আবার একা হলাম। একাই তো ছিলাম। মাঝে কিছুক্ষণের জন্যে ওই মেয়েটার সেবা করতে পেরে একলা ভাবটা ছিল না। আবার সেটা চেপে বসল মনের মধ্যে। তোমরা হাসছ? যন্ত্রের আবার মন কী? তোমাদের তৈরি যন্ত্রের মন থাকে না—আমাদের থাকে। কৃত্রিম মন হলেও সেটা মন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে লাল গ্রহকে দেখছি আর এই সব ভাবছি, এমন সময়ে একটা গর্জন ভেসে এল দূর থেকে। সঙ্গে-সঙ্গে আমার সূক্ষ্ম যন্ত্রের পর্দায় ভেসে উঠল একটা উড়ন্ত যন্ত্রের ছবি। দুপাশে ডানা। সামনে বনবন করে চাকা ঘুরছে। দূর থেকে যন্ত্রটা এসে মাথার ওপর দিয়ে চলে গেল। আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। লাল গ্রহে উড়ন্ত যন্ত্র এত শব্দ করে আকাশে ওড়ে না। সেখানে সব কিছুই হয়

নিঃশব্দে—গতিবেগও প্রচণ্ড। সবুজ গ্রহের উড়ন্ত যন্ত্র দেখে বুঝলাম, লাল গ্রহে আর ফেরা হবে না। এই আদিম যন্ত্র নিয়ে কোনওদিনই লাল গ্রহে ফিরতে পারব না।

দিনকয়েক পরে আমি গুহা থেকে দেখলাম কতকগুলো একরঙের পোশাক পরা মানুষ সরু-সরু আগুনলাঠি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ওরা যেন কাকে খুঁজছে। আমি আমার চিন্তাদর্পণ সজাগ করলাম। ওদের চিন্তা ফুটে উঠল। ওরা আমাকে খুঁজছে। স্পেসশিপকে এরাই ধ্বংস করেছে। লড়াই করা এদের কাজ। জীবন আর যন্ত্রকে খতম করে দেওয়াই এদের পেশা। তাই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। অদ্ভুত একটা অনুভূতি ক্ষণেকের জন্যে আমাকে যেন উন্মাদ করে তুলল। পরে জেনেছিলাম এর নাম প্রতিহিংসাবোধ। তোমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিলাম। গুহার গভীরে ঢুকে গেলাম। ওরা খুঁজে পেল না। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে গাছতলায় বসল।

এমন সময়ে দূরে আবার একটা চেনা যন্ত্রের আওয়াজ পেলাম। একটু পরেই পথ বেয়ে এগিয়ে এল চার চাকার সেই যন্ত্রটা—যাকে আমি মেরামত করে দিয়েছিলাম। একরকম পোশাক পরা লড়াইবাজ মানুষগুলোর সামনে দাঁড়াল যন্ত্র। ভেতর থেকে নামল সেই মেয়েটা। পেছনে আর-একটা পুরুষ মানুষ। খুব লম্বা চেহারা। মেয়েমানুষটার হাত ধরে চেয়ে দেখল পাহাড়ের দিকে। মেয়েটাও হাত তুলে দেখাল। বুঝলাম আমার কথা বলছে।

ইচ্ছে হল নেমে যাই। কিন্তু ভরসা হল না লড়াইবাজ মানুষগুলোর জন্যে।

এই সময়ে একটা কাণ্ড ঘটল।

মেয়েটা নেমে দাঁড়ানোর পর থেকে লড়াইবাজ লোকগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। বারবার ওর দিকে চাইছিল। হঠাৎ ওরা ওদের দুজনকে ঘিরে ধরল। মেয়েটার মুখ শুকিয়ে গিয়েছে দেখলাম। সঙ্গের পুরুষ মানুষটাও ঘাবড়ে গিয়েছে।

লড়াইবাজ লোকগুলো আরও কাছে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে হাত ধরে একদিকে টেনে নিয়ে গেল। চেঁচাতে লাগল মেয়েটা। ছটফট করতে লাগল। সঙ্গের পুরুষ মানুষটা ওর দিকে ছুটে যেতেই একটা লড়াইবাজ লোক তার মাথায় ডাণ্ডা দিয়ে মারল পেছন থেকে। ধড়াম করে সে মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠল না। মেয়েটাকে নিয়ে বাকি সবাই তখন জঙ্গলে ঢুকে পড়েছে।

আমি আর চুপ করে থাকতে পারলাম না। মেয়েটার ক্ষতি হতে চলেছে বুঝতে পেরে আটখানা পা চালিয়ে ঝড়ের মতো ওদের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। চারখানা শুঁড় ঘুরিয়ে লড়াইবাজদের চক্ষের নিমেষে শুইয়ে দিলাম। একজন আমার দেখে টিপ করে আগুন লাঠি তুলেছে দেখে তার পা ধরে ঘুরিয়ে গাছের মাথার ওপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে ছুঁড়ে দিলাম। আমার শক্তি যে কী বিপুল, তা সেদিন তোমরা, মানুষরা টের পেয়েছিলে হাড়ে-হাড়ে।

মেয়েটা নিঝুম হয়ে পড়েছিল। অদ্ভুত পোশাক ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার। আমি ওকে

আমার সামনের ডাঙায় শুইয়ে ওর চার চাকার যন্ত্রের মধ্যে রেখে এলাম। তারপর পুরুষ মানুষটাকে এনে শোয়ালাম ওর পাশে। এরপর চার চাকার যন্ত্র নিজেই চালু করলাম। আমরা লাল গ্রহে যন্ত্র বানাই—যন্ত্রই যন্ত্র সৃষ্টি করে—এরকম একটা বাজে যন্ত্রকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়।

কিন্তু যাব কোথায়? চিন্তা-দর্পণকে প্রখর করলাম। মেয়েটা জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। কিন্তু ঝিমিয়ে আছে। ওর মগজের চিন্তাকে ধরে নিলাম প্লেটের ওপর। সেই চিন্তা অনুযায়ী যন্ত্র হাঁকিয়ে ছুটে চললাম ঝড়ের বেগে। ওদের ঘাড়ে করে নিয়ে গেলে আরও জোরে যেতে পারতাম। কিন্তু ওরা ভয় পেত।

অনেকক্ষণ পর পাহাড়ের গায়ে একটা বাড়ি দেখলাম। মেয়েটার চিন্তার শেষ সেইখানে—পথেরও শেষ বাড়ির সামনে। যন্ত্র থামিয়ে ওদের দুজনকে তুলে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকলাম। সামনের ঘরে একজন সাদা চুলওয়ালা মানুষ হেঁট হয়ে বসেছিল। আমার চারটে হাতের ওপর শোয়ানো ওদের দুজনকে দেখে লাফিয়ে উঠল। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। চমকে উঠল না। ভয় পেল না। সেই প্রথম একজনকে দেখলাম সহজভাবে গ্রহণ করল আমাকে।

মেয়েটিকে শুইয়ে দিলাম। ওর সেবার দরকার। জ্ঞান এখনও পুরোপুরি ফেরেনি। পুরুষ মানুষটা কি নড়ছে না? মরে গেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

সাদা চুলওয়ালা লোকটা আগে সেবা করল মেয়েটার। পুরো জ্ঞান ফিরে পেয়ে সে অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তার ভাষা আমি বুঝি না। কিন্তু তার মনের কথা আমার মনের প্লেটে ফুটে উঠল। সে কৃতজ্ঞ। সবুজ গ্রহে এই আর একটা অনুভূতি শিখলাম। সেবা করলে যে কৃতজ্ঞ থাকতে হয়, তা জানলাম। লাল গ্রহে আমরা সেবা করেছি করতে হয় বলে, সেবা যারা নিয়েছে তারা তা প্রাপ্য বলেই নিয়েছে। কৃতজ্ঞ থাকেনি।

সবুজ গ্রহে তোমরা থাকো। তোমাদের ধন্যবাদ।

সবুজ গ্রহের এই রহস্যগুলো কিন্তু আজও আমার কৃত্রিম বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বুঝতে পারলাম না। এখানকার জল হাওয়া মাটি বিশ্লেষণ করেও এ রহস্য ভেদ করতে পারিনি। মায়া, কৃতজ্ঞতা, ভয়, বিস্ময় হিংসা—এগুলো লাল গ্রহে টের পাইনি। এখানে পেয়েছি। লড়াইবাজ লোকগুলোকে দেখে আচমকা একটা ক্রুর ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিলাম। প্রতিহিংসা নিতে চেয়েছিলাম। লাল গ্রহে কিন্তু আমি কখনও প্রতিহিংসা কী জিনিস জানতাম না। আমরা যন্ত্রেরা, প্রতিহিংসা নিতে শিখিনি। কিন্তু তোমাদের এই সবুজ গ্রহের আকাশে বাতাসে এমন অদৃশ্য কিছু একটা আছে যা বিশ্লেষণে ধরা পড়ে না, অথচ যার খপ্পর থেকে কেউ রেহাই পায় না। আমার মতো মেশিনও পায়নি।

তাই একলা থাকার জ্বালা জুড়োতে চলেছি যে পথে, তাও তোমাদের এই সবুজ গ্রহের নিজস্ব।

মেয়েটার কৃতজ্ঞতা আমাকে খুব নাড়া দিয়ে গিয়েছিল। তাই ওদের বাড়ি ছেড়ে

কোথাও আর গেলাম না। সাদা চুলওয়ালা মানুষটা ওর বাবা। হিরন্ময়বাবু তার নাম। মেয়েটার নাম কমলা। আর যে পুরুষ মানুষটা লড়াইবাজদের হাতে মার খেয়ে মরতে চলেছিল তার নাম মলয়। কমলার সঙ্গে তার বিয়ে হবে।

বিয়ে কথাটার মানে কিছুতেই আমার চিন্তা-দর্পণে ফুটিয়ে তুলতে পারলাম না। অনেক পরে জেনেছিলাম মানুষরা একলা থাকতে পারে না। একজন মেয়ে আর-একজন পুরুষের সঙ্গে এক ঘরে থাকে। তার নাম বিয়ে। লাল গ্রহে এ প্রথা চালু নেই। সেখানে সবাই একলসে থাকে।

মলয়ের মৃত্যু হবেই বোঝা গেল। হিরন্ময়বাবু নিজে রোগ সারাতে পারেন। ওঁর ঘরে তোমাদের দেহের অনেক ছবি ঝোলানো আছে দেখলাম। তোমাদের মগজের ছবিও দেখলাম। তোমাদের শরীরের নাড়ি নক্ষত্র আমার জানা হয়ে গিয়েছিল দু-একদিনের মধ্যেই। কী উপায়ে জেনেছিলাম, তা ঠিক বলে তোমাদের বোঝাতে পারব না—তোমরা বুঝতে পারবে আরও কয়েক লক্ষ বছর পরে।

হিরন্ময়বাবু আরও অনেককে এনে দেখালেন মলয়কে, কিন্তু তার জ্ঞান ফেরানো গেল না। সবাই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আমি কারও সামনে বেরতাম না ভয় পাবে বলে। যে ঘরে অনেক বই আছে, সেই ঘরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতাম।

এই ঘরেই একদিন কমলা ঢুকে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সবাই চলে যাওয়ার পর। আমি মেশিন বলেই আমার সামনে লজ্জা পেল না। আমার ভেতরটা কীরকম করে উঠল। মানুষ, আমি মেশিন হয়েও কমলার জন্যে বিচলিত হলাম। ওর কান্নার কারণটা চিন্তা হয়ে ফুটে উঠল আমার স্ক্রিনে। মলয় মরতে চলেছে। ওদের আর বিয়ে হবে না। ওদের এত ভালবাসার সব শেষ। ভালবাসা। কমলাই আমায় ভালবাসা শব্দটা হৃদয়ের তীব্র অনুভূতি দিয়ে শেখাল। তিল-তিল করে সেই অনুভূতি একটু একটু করে সঞ্চারিত হয়েছে আমার যান্ত্রিক সত্তায়। আমিও একটু-একটু করে ভালবেসে ফেলেছি কমলাকে। কোনওদিন সে বুঝতে পারেনি। সবুজ গ্রহের এই একজনই আমার সান্নিধ্যে সহজ হতে পেরেছিল বলেই কি সব সময়ে তাকে কাছে পেতে চেয়েছিলাম? এরই নাম কি ভালবাসা? মানুষ, মানেটা আরও ভালো করে বোঝাবার আর সময় নেই। বড় যন্ত্রণা, বড় যন্ত্রণা—একলা থাকার এ যন্ত্রণা আর সইতে পারছি না।

কমলার কান্না দেখে আমার ওই আলমারির মতো ধড়ের প্রাণকেন্দ্র আকুল হয়ে উঠল। আমি বেরিয়ে এলাম। যে ঘরে মলয় মড়ার মতো শুয়েছিল, সেই ঘরে ঢুকলাম। আমার এক্স-রে লেন্স দিয়ে মলয়ের খুলির মধ্যে কোথায় কী চোট লেগেছে, নিমেষে বুঝে নিলাম।

এমন সময়ে ঘরে ঢুকলেন হিরন্ময়বাবু। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি ওঁকে সামনের ডান্ডা দিয়ে আস্তে করে ঠেলে ঘরের বাইরে বের করে দিলাম। দরজা বন্ধ করে দিলাম। ফিরে এসে হেঁট হলাম মলয়ের মাথার ওপর।

মেকানিক বিদ্যেটা গোড়া থেকেই জানা আছে বলেই তোমাদের শরীরের

ভেতরের কলকব্জা দেখেই বুঝেছিলাম—তোমরা, মানুষরাও, মেশিন ছাড়া কিছু নয়। সব যন্ত্রের মতো তোমাদের দেহযন্ত্রের মেরামতও সম্ভব—আমার দ্বারাই সম্ভব। তাই মলয়ের মাথার খুলি খুলে ফেলে ভেতরের চোট মেরামত করে দিয়ে খুলে দিলাম দরজা।

সাতদিন পর কমলাকে নিয়ে বেড়াতে গেল মলয়। আমি একা বসে রইলাম ঘরে।

এই সময় থেকেই একা থাকার যন্ত্রণাটা বড় বেশি করে বাজতে লাগল আমার মধ্যে। এ কী যন্ত্রণা। এ যন্ত্রণা তো কোনওদিন লাল গ্রহে টের পাইনি। কমলা আর মলয়কে একসঙ্গে দেখলেই আর একটা নতুন অনুভূতি কুরে-কুরে খেত ভেতরটা। আমার যন্ত্র যেন বিকল হয়ে যেত একটা আশ্চর্য জ্বালায়। এরই নাম ঈর্ষার জ্বালা—তোমরা, মানুষরা, একেই বলো ঈর্ষার বিষ—কিন্তু আমি যন্ত্র হয়ে সেই বিষে কেন বিষিয়ে গেলাম বলতে পার?

সবুজ গ্রহের মানুষদের কাছ থেকেই তাই শেষ বিদায় নিচ্ছি। হিরন্ময়বাবু আমাকে বৈজ্ঞানিকদের কাছে পাঠাবেন মনে-মনে ভাবছেন। আমার মতো যন্ত্র বানাবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু সে স্বপ্ন আর বাস্তব হবে না।

আমার সামনেই এক জার অ্যাসিড রয়েছে। সামান্য অ্যাসিড। কিন্তু আমার এই খোলস আর যন্ত্রপাতি যে বিচিত্র ধাতু দিয়ে তৈরি, তা এই অ্যাসিডের ছোঁয়া পেলেই ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাবে বাতাসে।

সেই অ্যাসিড এবার আমি ঢালব আমার গায়ে।

এরই নাম আত্মহত্যা।

এই আমার শেষ নতুন অনুভূতি—রহস্যময় এই গ্রহে।

বিদায়।

ভার্গব বসুর হারানো মাথা

আমার বন্ধু চাণক্য চাকলাদার-এর কিছু খ্যাতি আছে আজগুবি গল্প বলার জন্যে।

সেদিন সন্ধেবেলা হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে ফাইভ ফিফটি ফাইভের টিনখানা তুলে নিয়ে বলল,—পানুদা শুনেছ?

টিনটার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে বললাম,—কী?

—মাকড়শার ঘাড়ে মানুষের মগজ।

—আবার গাঁজা খেয়েছিস?

—তোমাদের সঙ্গে ইংরেজদের তফাত তো এইখানেই। ইংল্যান্ডে জন্মালে রাতারাতি ওরা আমাকে H. G. Wells-এর মতো বিখ্যাত করে তুলত। আর তোমরা কিনা—বলে হুস করে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সোফার হাতলে বসে পড়ে শুরু করল,—ঢুকে গেছিলাম। শিলংয়ে নেমে ডাক্তার বন্ধু বিরিঞ্চি সান্যালের সঙ্গে দেখা করতেই লাফিয়ে উঠে বলল সে,—এই যে চাণক্য, তোর জন্যেই অপেক্ষা করছি।

সন্দেহ হল। বললাম,—ডাক্তারেরা তো আমার অপেক্ষা করে না। করে আমার শ্যাম্পেনের।

কথাটা গায়ে না মেখে বিরিঞ্চি বলল,—ভার্গব বসুর নাম শুনেছিস?

—কোন ভার্গব? সায়েন্টিস্ট?

—হ্যাঁ। সে একটা আশ্চর্য আবিষ্কার করেছে।

—আশ্চর্য কথা। দশ বছর আগে ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণা করে ডক্টরেট

পাওয়ার পর থেকে তাঁকে রিসার্চ করতেই শুনেছি। একটা নতুন ধরনের ইঁদুর-মারা কলও তো আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারেননি।

—এতদিন পারেনি, কিন্তু এবার পেরেছে। এবং তা শুনলে তোর মতো গুলবাজ লোকেরও মুন্ডু ঘুরে যাবে।

এ সব রিমার্ককে আমি আমল দিই না কোনওদিন। তাই শুধু শুধোলাম,—ব্যাপারটা কী?

—ভার্গব এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা দিয়ে জলজ্যান্ত মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলতে পারে।

—আচ্ছা?

—শুধু তাই নয়। মানুষটাকে অদৃশ্য করার সঙ্গে-সঙ্গে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় তৎক্ষণাৎ তাকে দৃশ্যমান করে তুলতে পারে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম,—দ্যাখ বিরিঞ্চি—।

—কথায় কী-বা কাজ। চল দেখে আসি। একা যেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। তুই আসায়—

ভার্গব বসু ল্যাবরেটরিতেই ছিলেন। আমার সঙ্গে বিরিঞ্চি তাঁর আলাপ করিয়ে দিয়ে আসার উদ্দেশ্য বলল।

বিরক্ত না হয়ে খুশি হলেন ভার্গব বসু। হাতের গিনিপিগটা খাঁচায় রেখে বললেন,—আসুন।

বড়-বড় কয়েকটি হলঘরে দামি-দামি যন্ত্রপাতি ঠাসা। সে সব তারের গোলকধাঁধার ব্যাখ্যা না শুনিয়ে ডঃ বসু আমাদের নিয়ে গেলেন একেবারে কোণের একটা হলঘরে।

ঘরটা বলতে গেলে একদম ফাঁকা। কিন্তু যেন একটা বিচ্ছিন্ন জগত। পুরু কাঠের দরজা। জানলাগুলো বন্ধ। শুধু সিলিংয়ের কাছে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে আলো আসছিল।

সুইচ টিপতেই ফ্লুরসেন্ট ল্যাম্পের আলোয় ঝলমল করে উঠল ঘরটা। দেখলাম, দুই বিপরীত কোণে বসানো দুটো ছফুট উঁচু আগাগোড়া কাচের মতো পদার্থের তৈরি স্বচ্ছ আলমারি ছাড়া ঘরে আর কিছু নেই। মধ্যে প্রায় বিশ ফুটের ব্যবধান।

ভার্গব বসু বললেন,—এই আমার মডেল-মেশিন। আরও বড় সাইজের একটা করার ইচ্ছে আছে। তা দিয়ে শুধু মানুষ কেন, যে-কোনও জিনিস, তা সে যতই বড় হোক আর ভারী হোক না কেন, অদৃশ্য করে দিয়ে নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর যে-কোনও জায়গায় পাঠিয়ে দিতে পারব আমি। আমার এ আবিষ্কার সমস্ত পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেবে—বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ঘটাবে। মিঃ চক্রবর্তী, প্রথমে শুরু করি আপনার ব্যাগ দিয়ে।

বলে, আমার হাত থেকে কোম্পানির ছাপমারা ব্যাগখানা নিয়ে রাখলেন এ

দিককার আলমারির মধ্যে। তারপর বেশ করে পাল্লাটা এঁটে দিয়ে পিছিয়ে এলেন। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটা সুইচের ওপর হাত রেখে বললেন,—দুটো আলমারির ওপরেই ভালো করে নজর রাখুন।

খটাখট করে কয়েকটা সুইচ টেপার শব্দ হল। আধমিনিটটাক কোনও পরিবর্তন দেখলাম না। তারপর ধীরে-ধীরে কুয়াশার মতো অস্পষ্ট হয়ে এল ব্যাগটা। চকিতে ওদিককার আলমারিতে তাকিয়ে দেখলাম ফাঁকা আলমারির মেঝেতে খানিকটা কুয়াশা জমে উঠেছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই কুয়াশাটা জমাট হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই দেখলাম আমার ব্যাগখানা।

এদিককার আলমারিতে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আলমরি বিলকুল ফাঁকা। বিশফুট ব্যবধানের মধ্যে দিয়ে ব্যাগখানা অদৃশ্য হয়ে চলে গেছে ওদিককার আলমারিতে।

চোখ রগড়াব কি না ভাবছিলাম, ভার্গব বসু হেসে বললেন,—এ তো গেল জড়বস্তুর উধাও হওয়া, এবার দেখুন জ্যান্ত প্রাণীর খেলা। —বলে পাশের ঘর থেকে একটা বেড়ালকে এনে ঢুকিয়ে দিলেন এদিককার আলমারিতে। ওদিক থেকে ব্যাগখানা সরিয়ে আনলাম আমি। খটাখট সুইচ টিপলেন ডঃ বসু। বেড়ালটা সমানে মিউ-মিউ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। আধমিনিটের মধ্যে গলে-গলে সে কুয়াশার মতো অস্পষ্ট হয়ে উঠল। কিন্তু মিউ-মিউ চিৎকার থামল না। দেখতে-দেখতে ওদিককার ফাঁকা আলমারিতে আবির্ভূত হল খানিকটা কুয়াশা। ক্রমে তা জমাট বেঁধে রূপ নিল একটা বেড়ালের।

এদিককার আলমারির কুয়াশাও দেখলাম মিলিয়ে গেছে—বেড়ালও হয়েছে অদৃশ্য!

এরপর যখন ভার্গব বসু ডাঃ বিরিঞ্চি সান্যালকেই অদৃশ্য করে এ আলমারি থেকে ও আলমারিতে নিয়ে গেলেন, তখন আমার লোম-টোম এমন খাড়া হয়ে উঠল যে আর ল্যাবরেটরির মধ্যে থাকতে পারলাম না।

ক-দিন পর বিরিঞ্চির ওখানে যেতেই বড়-বড় চোখ করে ফিস-ফিস করে ও বলল,—চাণক্য শুনেছিস?

—কী?

—ভার্গব বসু আত্মহত্যা করেছে।

—অ্যাঁ?

—হ্যাঁ। দু-দিন ল্যাবরেটরির দরজা বন্ধ ছিল। ওর স্ত্রীও ঢুকতে পারেননি। তৃতীয় দিন সকালে দরজা খোলা দেখে উনি ঢোকেন। ঢুকে দেখেন যে হাইড্রলিক প্রেসারের নিচে ভার্গব বসুর মাথাটা একেবারে পিষে গেছে—চেনা যায় না। দেহটা বাইরে ঝুলছিল, তাই দেখেই শনাক্ত করা হয় ওকে। যে ইলেকট্রনিক থিওরির ভিত্তিতে সে যে-কোনও বস্তুকে অণু-পরমাণুতে বিশ্লিষ্ট করে রেডিও ওয়েভের মতো ইথারের মধ্যে

দিয়ে যেখানে খুশি নিয়ে যেত—সে সম্পর্কে যাবতীয় কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে উড়ছে ঘরে। আর, একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি ছিল। খুবই ভয়ানক সে চিঠি।

—কী?

—অটোমেটিক একটা যন্ত্রের সাহায্যে নিজের ওপর প্রায় এক্সপেরিমেন্ট করেছে ভার্গব। আমরা চলে আসার পর—সে-রাত্রে এ আলমারি থেকে ও আলমারিতে এইভাবে নিজেকে আনার পরেই বুঝল সর্বনাশ হয়ে গেছে তার।

—কী রকম?

—প্রথম আলমারিতে আগে থেকেই একটা মাকড়শা ঢুকে বসেছিল। নিজেকে ডিজলভ করার সঙ্গে-সঙ্গে মাকড়াশাটাও অণু-পরমাণুতে ভেঙে অদৃশ্য হয়ে যায়। দ্বিতীয় আলমারিতেও দুজনের দেহেতে অণু-পরমাণু একসাথে মিশে রইল। কিন্তু নিজের-নিজের রূপ ধারণ করার সময়ে হল বিপদ!

—কী হল তাই শুনি না!

—মাকড়াশার মাথাটা চলে এল ভার্গব বসুর মাথায়—আর ভার্গবের মাথাটা চলে গেল মাকড়শার মাথায়।

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

বিরিঞ্চি বলে চলল,—প্রথমে ভার্গব মাথায় দারুণ যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারেনি। মিনিট কয়েক পরে যখন বুঝল, তখন মাকড়শার অক্ষিপুঞ্জ দিয়েই মাকড়শাটাকে আর খুঁজে পেল না। দুদিন অকথ্য দৈহিক যন্ত্রণা সহ্য করে অনাহারে থেকেও মাকড়শাটার কোনও হদিশ পেল না। তৃতীয় দিনে তাই আত্মহত্যা করল আর কোনও উপায় না দেখে।

একটু চুপ করে ফাইভ ফিফটি ফাইভের টিনখানা নির্বিকারভাবে নিজের ব্যাগে রেখে বলল চাণক্য,—ভাবছ বুঝি গুল মারলাম। কিন্তু এই দেখো! —বলে আনন্দবাজার পত্রিকার একটা কাটিং আমার হাতে তুলে দিল। কাটিংটায় এই খবরটা ছিল—৫ই আগস্ট : ক্ষুদ্র একটি মাকড়শা গত দুইদিন যাবত শিলং শহরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। মাকড়শাটি দেখিতে অদ্ভুত ধরনের। ইহার রং সবুজ। মাথায় গোলাপি রঙয়ের মুখ আঁকা। এই মাকড়শার চিত্র ৫০ নয়া পয়সা করিয়া বিক্রয় হইতেছে।

খবরে প্রকাশ, এক ভদ্রলোক এই অদ্ভুত দর্শন মাকড়শাটিকে তাঁর হাতে উঠিতে দেখেন। প্রথমে তিনি উহাকে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দেন, কিন্তু পুনরায় উহা উঠিতে আরম্ভ করে এবং সেই সময়ে তিনি উহার অদ্ভুত আকৃতি লক্ষ করেন। *

* একটি বিদেশি ছায়াচিত্র অনুসরণে
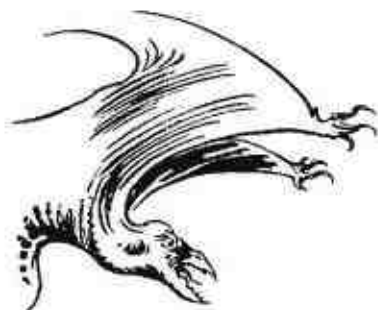
আতঙ্ক-গ্রহ

২০০১ সালের গল্প।

মহাশূন্য। ছায়াপথ। অগুন্তি তারার ঝিকিমিকি। আলোর বেগে উড়ে যাচ্ছে একটা ব্যোমযান। পৃথিবীর ব্যোমযান।

ব্যোমযানের ভেতর বিচিত্র কলকব্জা। কল্পনায় আসে না। একটা ঘরে দেওয়ালজোড়া কাচের পর্দা। মহাশূন্যের রঙিন ছবি ভাসছে সেখানে। দূরের তারা, গ্রহ, নীহারিকা—সব দেখা যাচ্ছে।

অনেক দূরে একটা সবুজ গ্রহ। কাছে এগিয়ে এল। আশ্চর্য সুন্দর। যেন অনন্ত শূন্যের মাঝে কাশ্মীর মরুদ্যান।

ব্যোমযানের কন্ট্রোল-কেবিন। এখান থেকেই অতিকায় ফানুসের মতো মহাকাশপোতকে চালানো হচ্ছে। কমান্ডার ঝুঁকে পড়ল কি-বোর্ডের ওপর। একটার পর একটা সুইচ টিপল। নানা রঙের আলো জ্বলল। নিভল। রেখাচিত্র ভেসে উঠল কাচের পর্দায়।

কলের মগজ অঙ্ক কষল। উত্তর জানিয়ে দিল।

সবুজ গ্রহ পৃথিবীর মতোই।

মানুষ এখানে ঘর বাঁধতে পারবে। পৃথিবীতে আর জায়গা নেই। তাই তো হিল্লি-দিল্লি ঘুরছে অগুন্তি ব্যোমযান। জায়গা চাই, জায়গা। মাথা গোঁজবার জায়গা।

সবুজ গ্রহে সমস্যার খানিকটা মিটবে।

ব্যোমযান ভাসতে-ভাসতে নেমে এল সবুজ গ্রহের বুকে।

তারপরেই দেখা গেল এক ভয়াবহ দৃশ্য।

বরফ প্রান্তর। দিগন্ত পর্যন্ত বরফ। ঝোড়োহাওয়া গোঁ-গোঁ করছে, দাপাদাপি করছে।

কমান্ডারের মুখ শুকিয়ে গেল। বলল,—আশ্চর্য! কলের হিসেব বলল,—এখানে মানুষ থাকতে পারবে। কিন্তু যা দেখছি, মানুষ কেন, বনমানুষেও টিকতে পারবে না। তবে কি কল বিগড়োল? ভুল খবর দিল?

শেষের কথাগুলো ঝড়ের হুংকারে ডুবে গেল।

কিন্তু ডানপিটে অভিযাত্রীরা এত কাছে এসে ফিরে যাবার পাত্র নয়। বরফের মধ্যেই তারা নামবে ঠিক করল। মাথা গোঁজবার মতো ছোট্ট একটা ছাউনি খুঁজে বার করতেই হবে।

তিনজনে নামল ব্যোমযান থেকে। আগুন, পিয়েত্রভ আর পিটার। আগুন বাংলাদেশের ছেলে, পিয়েত্রভ রাশিয়ার, আর পিটার আমেরিকার।

তিনজনেরই মাথা-মুখ কাচের ফানুসে ঢাকা। গলা থেকে নখের ডগা পর্যন্ত ভারী স্পেসস্যুট। তা সত্ত্বেও ঠান্ডায় হি-হি করে কাঁপতে লাগল তিনজনে। বরফ ছুঁচের মতো বিঁধতে লাগল স্পেসস্যুটে।

পিয়েত্রভ বলল,—আমি বরফের দেশে মানুষ। কিন্তু এখানকার বরফ আমিও সইতে পারছি না। এ গ্রহে মানুষ কেন, জানোয়ারও থাকতে পারবে না।

ঝড় গজরাচ্ছে, ফুঁসছে। তা সত্ত্বেও পিয়েত্রভের কথাগুলো পৌঁছল বহুদূরে এক বিচিত্র মূর্তির মগজে। অদ্ভুতগড়নের একটা বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়েছিল সে। বিরাট মাথা। বাকি দেহটা গিরগিটির মতো। চোখ বোজা। কিন্তু চোখ না চেয়েই মনের চোখে সে দেখতে পায় বহুদূরের জিনিস।

তাই তুষার-ঝটিকায় নাজেহাল তিন অভিযাত্রীকে সে স্পষ্ট দেখতে পেল। পিয়েত্রভের কথা তার মাথায় পৌঁছল—কানে নয়। আশ্চর্য ক্ষমতা এই গিরগিটি-জীবের। কান দিয়ে শোনে না। মনের ভাবনা মাথা দিয়ে শোনে।

পিয়েত্রভের ভাবনা তাই সে মাথা দিয়ে জানল। হাসল। দুর্বোধ্য হাসি।

আচম্বিতে থমকে দাঁড়াল আগুন। পিয়েত্রভ বলল,—কী হল?

আগুন দিগরেখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বলল,—বিশাল বাড়ির মতো কী যেন দেখা যাচ্ছে।

মরীচিকা,—হাসল পিয়েত্রভ। —তুষার-ঝড়ে মরীচিকা দেখছ।

—মরীচিকা নয়, পিয়েত্রভ।

—বরফ-গ্রহে বাড়ি? ঠান্ডায় মাথা খারাপ হল নাকি?

—পিয়েত্রভ, তোমার মাথা তো [illegible] হয়নি? তুমি দেখো।

অগত্যা পিয়েরত চাইল সেইদিকে। ভালো করে কিছু দেখবার আগেই এল তারা।

এল উড়ন্ত বিভীষিকারা। যেন নরক থেকে যমদূতরা উড়ে এল।

বাদুড়ের মতো ডানার গড়ন। কিন্তু আকারে একশোটা বাদুড়ের সমান প্রাগৈতিহাসিক টেরোডাকটিল এদের তুলনায় সুশ্রী।

বাদুড়-বিভীষিকারা হলুদ ধাতুর মতো ঝকমকে—গনগনে রাঙা চোখে যেন মালসা বসানো। হাঁ করা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চকচক করছে করাতের মতো সারি-সারি দাঁত। থাবায় ধারালো হুকের মতো সর্বনাশা নখ।

দানব-পাখি। কল্পনাতীত ভয়ংকর। গায়ের রক্ত হিম করে দেয়—এই কুৎসিত বাতাস তোলপাড় করে তারা ধেয়ে এল তিন অভিযাত্রীর দিকে।

পিয়েরত সবার আগে দেখল। দেখল, অনেক উঁচু থেকে যেন কতকগুলো উল্কা খসে পড়ছে। কাছে আসতেই পিছিয়ে উঠল। ঝড়ের ঝাপটায় লক্ষ্যভ্রষ্ট হল দানোরা। একচুলের জন্য অভিযাত্রীরা বেঁচে গেল।

আগুন চেঁচিয়ে উঠল,—হুঁশিয়ার। ঠোঁট আর নখ সামলে! বলতে না বলতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল উড়ন্ত-দানোরা। সটান বরফের ওপর শুয়ে পড়ল অভিযাত্রীরা। অল্পের জন্যে বেঁচে গেল।

শুয়ে-শুয়েই অ্যাটমিক-পিস্তল বার করল আগুন। ঘোড়া টিপল। যেন আকাশের বিদ্যুৎ লকলক করে উঠল পিস্তলের মুখে। কিন্তু আশ্চর্য কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেল একটা দানো। সাঁ করে নেমে এল আগুনের ওপর। চোখ বুজল আগুন। এই বুঝি শেষ।

আশ্চর্য অনুভূতিটা জাগল ঠিক তখনি। কে যেন আগুনের মগজের মধ্যে কথা কইছে। দানো পাখিকে হুকুম দিচ্ছে,—সাবধান। গায়ে আঁচড় না লাগে। জ্যান্ত চাই।

তারপরেই আর কিছু মনে নেই আগুনের।

পিয়েরত দেখল ঝপাং করে আগুনের ওপর লাফিয়ে পড়ল একটা দানো পাখি। থাবার মধ্যে বেড়াল-ছানার মতো ধরল আগুনকে। পরক্ষণেই উধাও শূন্যে। অবিশ্বাস্য বেগে মিলিয়ে গেল তুষার-ঝড়ের মধ্যে।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিল পিটার। বলল,—শুনেছ?

পিয়েরত বলল,—তুমিও শুনেছ?

তিনজনেই শুনেছিল সেই একই মগজ-বাণী। টেলিপ্যাথি। চিন্তার ভাষায় কে যেন কথা বলছে। মগজের মধ্যে কথা বলছে,—সাবধান। গায়ে আঁচড় না লাগে। জ্যান্ত চাই!

এ কী কাণ্ড রে বাবা! ভড়কে গেল পিয়েরত আর পিটারও। দুমদাম করে অ্যাটমিক-পিস্তল দিয়ে বিদ্যুৎ ছুড়তে লাগল। আর পিছু হটতে হটতে স্পেসশিপের

দিকে। দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক তখনি। পিটারের অ্যাটমিক-পিস্তল দিয়ে বিদ্যুৎ বেরিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করল একটা দানো-পাখিকে। প্রাণহীন দানবটা দমাস করে আছড়ে পড়ল ব্যোমযানের ওপর। ব্যোমযানের পাখা ভেঙে গেল। হেলে পড়ল বরফের ওপর।
পিয়েত্রো আর পিটার ফিরে এসে শুনল সর্বনাশ হয়েছে। ব্যোমযান আর আকাশে উড়বে না। পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া যাবে না।

মুখ শুকিয়ে গেল সকলের।

কিন্তু আগুনের কথা কেউ ভাবল না। অথচ ওর ওপরেই নির্ভর করছিল অভিযাত্রীদের ভবিষ্যত।

বরফ-প্রান্তর পেরিয়ে দানো-পাখি আগুনকে নিয়ে নামল এক আশ্চর্য বাগানে। লতাপাতাকুঞ্জ দেখে মনে হয় বুঝি নন্দনকানন। অদ্ভুত প্রাসাদ দেখে মনে হয় বুঝি ইন্দ্রপুরী। বরফের ঝড়ের চিহ্ন নেই সেখানে। দূরে দূরে তুষার-ঝড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আগুন জ্ঞান ফিরে পেল। সব দেখল। তাজ্জব হয়ে গেল।

তারপরেই চমকে উঠল। মগজের মধ্যে আবার সেই আশ্চর্য বাণী। কে যেন মাথার মধ্যে কথা কইছে। বলছে,—আমার সামনে আন। গায়ে আঁচড়টুকু লাগলে ডানা ছিঁড়ে ফেলব।

দানো-পাখিও সেই হুকুম শুনল। থাবার নখে আগুনকে খপ করে ধরে শূন্যে উড়ল। নামল একটা টলটলে দীঘির ধারে। সেখানে ঘাসের ওপর বসে একটা বিচিত্র জীব। দেখতে অবিকল গিরগিটির মতো। আকারে পেল্লায়। মাথাটা বিশাল।

আগুন হাঁ হয়ে গিয়েছিল কিম্ভূতকিমাকার জীবটা দেখে। সম্বিত ফিরতে দেখল আরও গোটাদশেক গিরগিটি-জীব ওকে ঘিরে ফেলেছে পেছন থেকে। সবারই চোখ বন্ধ।

কোমরের অ্যাটমিক-পিস্তলে হাত দিল আগুন। সঙ্গে-সঙ্গে মাথার মধ্যে কে যেন কথা কয়ে উঠল,—ও পিস্তল ছুঁড়ে আমাদের মারতে পারবে না ভাই।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল আগুন। বিড়বিড় করে বলল,—ভূতুড়ে ব্যাপার নাকি?

না,—মাথার মধ্যে জবাব ভেসে এল।

তবে কী? —সাহস করে শুধোলো আগুন।

—টেলিপ্যাথি।

—মানে, চিন্তা দিয়ে বোঝানো?

—হ্যাঁ। আদিম অবস্থায় আমরাও কথা বলতুম। এখন বলি না।

—তার মানে? আমরা আদিম? বর্বর?

—রাগ কোরো না। কিন্তু কথাটা সত্যি। ইতর জীবেরাই মুখ দিয়ে ভাবের

আদান-প্রদান করে। উন্নত জীবরা করে না। তোমাদের দেশের মুনি-ঋষিরা টেলিপ্যাথি জানত। কথা বলত না। কিন্তু একে অপরের মন বুঝত।

আমাদের দেশের খবর তোমরা জানলে কী করে? —আগুন স্তম্ভিত।

—তোমার মগজে সব লেখা রয়েছে। তোমার পুরো স্মৃতি আমরা মন দিয়ে পড়ে নিয়েছি।

—অসম্ভব।

—আমাদের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়।

—কিন্তু তোমাদের চেহারা গিরগিটির মতো। পৃথিবীতে গিরগিটিরা ইতর প্রাণী।

—ঠিক। কিন্তু আমাদের মাথা তোমাদের মাথাকেও ছাড়িয়ে যায়। চেহারায় কী আসে-যায়। আমাদের মতো দূরদৃষ্টি তোমাদের আছে? আমরা চোখ বন্ধ করে এখান থেকে দেখছি, তোমাদের ব্যোমযান খারাপ হয়ে গেছে। আর উড়বে না।

—অ্যাঁ!

—ভয় কী? তোমরা তো থাকবার জন্য নতুন গ্রহ খুঁজতে বেরিয়েছ।

—সে খবরও পেয়েছ?

—হ্যাঁ। তোমাদের উদ্দেশ্য সাধু। কিন্তু তোমরা যদি পৃথিবীতে এ গ্রহের খবর নিয়ে যাও, তাহলে পালে-পালে লোক আসবে। অশান্তি হবে।

এ গ্রহে কেউ আসবে না। যা বরফ-ঝড় দেখলাম,—মুখ বেঁকিয়ে বলল আগুন।

—বরফ-ঝড়? ও তো আমরাই তৈরি করেছি।

—তার মানে? নতুন মানুষ পেয়ে দিব্যি গাল-গল্প ঝাড়ছ? বরফ-ঝড় কি কেউ তৈরি করতে পারে?

—বিশ্বাস হল না? তবে দেখো।

পেছন ফিরল আগুন। হতভম্ব হয়ে গেল। যাদুমন্ত্র বলে যেন মিলিয়ে গেল তুষার-ঝড়। চোখের সামনেই মিলিয়ে গেল। দেখতে-দেখতে তুষার অদৃশ্য হল। সে জায়গায় ঝলমল করে উঠল সবুজ গ্রহ—যেমনটি ব্যোমযানে বসে মহাশূন্যে জানা গিয়েছিল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় আগুনকে বলল গিরগিটি জীবরা,—বিশ্বাস হল?

—কিন্তু কী দরকার ছিল এই ছলনার?

—তোমাদের পরখ করলাম। মহাকাশ থেকে শত্রু আসছে কী মিত্র আসছে—তা জানার জন্যে বরফ-ঝড় বানিয়ে তোমাদের ব্যোমযান বিকল করলাম। তবুও বিদায় হলে না। তখন তোমাকে ধরে আনলাম। তোমার মগজের লুকোনো স্মৃতিকে উদ্ধার করলাম। জানলাম, তোমরা লোক ভালো।

—ধন্যবাদ।

—তোমরা এ গ্রহে থাকো। বন্ধুর মতো, অতিথির মতো থাকো। শুধু একটি শর্ত রইল। পৃথিবীতে আর ফিরে যাবে না। এখানকার খবর সেখানে পাঠাবে না। পৃথিবীর লোক বড় লোভী। স্বার্থপর।

—রেডিওতে খবর পাঠাব। ব্যোমযান খারাপ হল তো বয়ে গেল।

—বন্ধু, সে গুড়েও বালি। বরফের ওপর ধাৎ হয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তোমাদের রেডিও-ও বিগড়েছে।

মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে রইল আগুন। বাংলাদেশের কথা মনে পড়ল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। পৃথিবীকে ইহজীবনে আর দেখতে পাবে না। পিরপিটি-জীবগুলোকে চোখে পড়ল। এরা কুৎসিত। কিন্তু চোখ থাকতে চোখ দিয়ে দেখে না, মন দিয়ে দেখে। মুখ থাকতে মুখ দিয়ে কথা বলে না, মন দিয়ে বলে।

মঙ্গল-বাসী বলল,—মন খারাপ কোরো না বন্ধু। তোমার সঙ্গীদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি। পৃথিবীর মতো এ গ্রহে হানাহানি নেই, বিদ্বেষ-হিংসা নেই। এখানে তোমরা সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে। বলো ভাই, আমাদের অতিথি হবে? আমাদের বন্ধু হবে?

চোখ তুলল আগুন। চোখে জল। ধরা গলায় বলল,—হব।

তেজস্ক্রিয় মণিক

পরশুদিন প্রফেসর নটবল্টু চক্র বায়না ধরেছিলেন, তাঁকে একটা বেড়াল এনে দিতে হবে।

আমি খেপে গেছিলাম। কুকুর ধরা সহজ, কিন্তু বেড়াল ধরা চাট্টিখানি কথা নয়। ওদের জাতটাই খারাপ, ঘরেও থাকবে, বনেও ঘুরে বেড়াবে। খাটেও শোবে, আবার চালে উঠেও বসে থাকবে। আদর করে মাছের মুড়ো খাওয়ানোর পরও দেখা যাবে চুপিসাড়ে কখন গোটা মাছটাই খেয়ে চলে গেছে। কায়দা-টায়দা করে থলির মধ্যে ভরে গঙ্গার ধারে ফেলে এলেও দেখা যায়, কী এক অলৌকিক ক্ষমতা বলে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে। হারামজাদাদের তিনতলার ছাদ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেও একতলায় আছড়ে পড়ার আগেই শিরদাঁড়া আর খুলি বাঁচিয়ে নেয়। বেড়ালের নাকি নটা প্রাণ। মরেও মরে না। কথাটা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি। এডগার অ্যালান পো'র 'ব্ল্যাকক্যাট' গল্পটা পড়বার পর থেকে বেড়ালদের আমি একটু ভয়ও পাই। বেড়াল যে রঙেরই হোক না কেন, বেড়াল বেড়ালই, তাদের দূরে রাখাই ভালো।

প্রফেসর আমার এই বেড়াল-ভীতি কি জানতেন না? তা সত্ত্বেও আমাকেই কিনা বললেন,—ও হে দীননাথ, মস্তানি-টস্তানি তো অনেক দেখিয়েছ, একটা বেড়াল এনে দিতে পারো?

হ্যাঁ, আমি মানছি, আমি একটু রগচটা মানুষ। কথার চেয়ে আমার হাত চলে বেশি। কিন্তু আমার এই বদ অভ্যাসটার উপকার কি প্রফেসর পাননি? তা সত্ত্বেও মস্তান বলে আমাকে টিটকিরি দেওয়ার দরকার ছিল কি?

রগচটা হই আর যাই হই, মনটা কিন্তু আমার খুব নরম। সে কথা আমরা শত্রুরাও স্বীকার করে। বিশেষ করে প্রফেসর নাটবল্টু চক্র যদি আমাকে বলেন,—ওহে খেকরা, যাও তো ওষধি পর্বতে, দক্ষিণ শিখর থেকে নিয়ে এসো বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সঞ্জীবকরণী আর সন্ধানী—এই চারটে মহৌষধ।

অন্য কেউ হলে এই অর্ডার শুনলে তক্ষুনি সেইখানেই মাথা ঘুরে বসে পড়বে। হনুমান ছাড়া এহেন অসম্ভব কর্ম কেউ করতে পারে? ময়দানবের তৈরি রাবণের হাত দিয়ে নিক্ষিপ্ত শক্তিশেল খেয়ে লক্ষ্মণের চোখ যখন উল্টে গেছে, তখন অর্ডার তামিল করতে লম্ফ দিয়ে হনুমান চলে গেছিল ওষধি পর্বতে। ওষধি খুঁজে না পেয়ে চুড়ো পাকড়ে পুরো পাহাড়টাকেই উপড়ে নিয়ে এসেছিল বায়ুপথে।

আমি কিন্তু শুধু হিমালয় কেন, ত্রিভুবনও চক্কর মেরে আসতে পারি প্রফেসরের অর্ডার বা আব্দার শুনলেই। কিন্তু মস্তান বলবার কি দরকার ছিল?

মুখ গোঁজ করে হুকুম তামিল করতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আজকালকার ছোকরারা বুড়ো মানুষদের সম্মান দেয় না—আমি কিন্তু দিই। পাড়ার ছোকরারা সেই কারণে আমাকে দুচক্ষে দেখতেও পারে না—তাও আমি জানি। আড়ালে আমাকে দীননাথ-পাননাথ ঘাটের মড়া-চালাকাঠ বলে। হারামজাদারা উঠতি-মস্তান, ফুঁ দিলে উড়ে যাবে বলে কিছু বলি না। রেগে গেলে তো আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, তখন আমি চণ্ডাল।

যাই হোক, যা বলছিলাম। প্রফেসরের আজব আবদার শুনে ভাবলাম, নিশ্চয় আবার একটা বিষম এক্সপেরিমেন্টের প্ল্যান করেছেন। অতএব, মহেশ্বন-নীলমণি এই সহকরীকেই তো কোমরে গামছা বেঁধে আসরে নামতে হবে।

সেই হল আমার বেড়াল-খোঁজার অভিযান। খুঁজতে গিয়ে প্রথমেই আবিষ্কার করলাম একটা আশ্চর্য তথ্য। আমাদের এই বিখ্যাত বনেদি পাড়ার কোথাও একটা বেড়াল রাখা হয়নি।

কী আশ্চর্য। বেড়াল নেই এমন জায়গা এই পৃথিবীতে কোথাও যে আছে, এবং সেই পাড়াটা আমার পাড়া, তা তো জানা ছিল না!

খুবই পুলকিত হলাম। যুগপৎ খুবই বিমর্ষ। কেননা, আমার অসাধ্য কিছু নেই—প্রফেসর তা জানেন। সামান্য একটা বেড়াল ধরে দিতে পারলাম না—এ খবর শুনলে যে বাস-বচনের ঝড় তুলে আমার পিলু পর্যন্ত নড়িয়ে ছাড়বেন।

বেড়াল খোঁজার জন্যে পাড়া ছেড়ে বেপাড়া যাওয়াটাও খুব সমীচীন বোধ করলাম না। আত্মসম্মানে লাগল। বেড়াল এমন একটা কেষ্টবিষ্টু জীব নয় যে তাকে দেশ-দেশান্তরে খুঁজে-করতে হবে। বেড়াল হল গিয়ে গৃহপালিত পশু এবং খুবই বিশ্বাসঘাতক প্রাণী। তার চোরের মতন আনাগোনা এবং স্থানবিশেষে আত্মগোপন করে থাকার কু-অভ্যেসটিও আমার অবিদিত নয়। অতি নিরীহ-দর্শন এই জীবটিকে অকারণে বাঘের মাসি বলা হয়নি। তার চোখ দুটোর প্রদীপের মতন রাতে জ্বলে এবং

কোনও এক অজানা ইন্দ্রিয় শক্তির দৌলতে অদৃশ্য বিভীষিকাদের অস্তিত্ব টের পায়। তখন ল্যাজ গুটিয়ে তল্লাট ছেড়ে লম্বা দেয়, যার দুধ-মাছ খেয়ে গতর ফোলানো হয়েছে তাকেই বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়ে।

সুতরাং শরীর নিয়েও যারা প্রায় অশরীরী, সেই বেড়ালদের এই পাড়াতেই খুঁজতে হবে—তার জন্যে দরকার হলে গোয়েন্দা পর্যন্ত লাগাব। দরকার হলে থানায় গিয়েও বলে আসব—বদমাশ বেড়াল যদি কোথাও থাকে, সন্ধান দিন। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তার ব্রেনের নাট-বল্টু টাইট মেরে দেবে।

এই সব সাত-পাঁচ যখন ভাবছি শিবমন্দিরের বটগাছতলায় বসে, আর পাড়ার ছ্যাভাগুলো অস্ফুট আওয়াজ দিচ্ছে আশেপাশে, ঠিক তখন ধূমকেতুর মতন সাঁ করে আমার সামনে চলে এল গ্রেট গুলবাজ চাণক্য চাকলাদার।

উটের মতন লম্বা-লম্বা ঠ্যাং ফেলে দুলে-দুলে সামনে এসে দাঁড়িয়ে মুখ থেকে এক বেগদা লম্বা ইয়ামোটা জ্বলন্ত চুরুটটাকে সরিয়ে বললে,—মুখটা এত শুকনো কেন?

এদিক-সেদিক চেয়ে দেখলাম, ছ্যাভাগুলো আমাদের দেখছে। বিশেষ করে চাণক্যকে। এরকম আখাম্বা লম্বা বিদঘুটে ঠ্যাঙলা মানুষ তো চট করে চোখে পড়ে না!

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেল ছেলেগুলোর চাহনি দেখে। আমারও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নামে একটা ইন্দ্রিয় আছে—যাকে বলা হয়, হর্স সেন্স। সেই 'সেন্স' দিয়ে কেন জানি আমার মনে হল, ছোঁড়াগুলো অনেক কিছু জানে। আমার কাছে চেপে যাচ্ছে।

রোখ চেপে গেল, চাণক্যকে নিয়ে তফাতে চলে গেলাম। বললাম,—একটা বেড়াল খুঁজছি।

আমি ভেবেছিলাম, এই কথা শুনে চোখ-টোখ কপালে তুলে হ্যা-হ্যা করে হেসে উঠবে চাণক্য। কিন্তু লোকটা সে-সবের ধার দিয়েও গেল না। বরং আমায় পিলে চমকে দিয়ে বললে,—আমিও তো খুঁজছি।

এইবার যাকে বলে আকাশ থেকে পড়া, আমার হল সেই অবস্থা। কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে, চাণক্যর পিটপিটে চোখদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকবার পর আচমকা খেয়াল হল—কী আশ্চর্য! চাণক্য হঠাৎ এ পাড়ায় কেন? যে কিনা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে টহল দিয়ে ফেরে যতো সব অদ্ভুত আজগুবি ব্যাপার-স্যাপারের খোঁজে, এবং তাই নিয়ে এনতার গুল মেরে যায়—সে হঠাৎ এই পাড়ায় আমাকে অথবা প্রফেসরকে আগেভাগে না জানিয়ে হুট করে চলে এল কেন?

আশ্চর্য মানুষ চাণক্যর কিছু-কিছু কাণ্ডকারখানা এর আগে লিখেছি। অতীন্দ্রিয় অতি-অনুভূতি বোধ ওর মধ্যে বেশায় মাত্রায় আছে। তাই আমার হাঁ-মুখের দিকে অপলকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললে,—মুখটা বন্ধ করুন। বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

হাঁ বন্ধ করলাম। ফলে, কথাও বলতে পারলাম না।

কিন্তু কথার ফুলঝুরি চাণকা কথা চালিয়ে গেল বটে। যার সারমর্ম এই : চাণকা এমন একটা বেড়াল খুঁজতে বেরিয়েছে, যে বেড়াল যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যায়।

আমার মুখটা আবার হাঁ হয়ে গেছিল। বজ্জাত বেড়ালদের অনেক বজ্জাতির ব্যাপার শুনেছি, কিন্তু মা ষষ্ঠী তাঁর এই বিশেষ বাহনটিকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিয়ে গেলেন কেন? আরও অঘটন ঘটানোর জন্যে?

চাণক্য বললে,—ঠিক তাই। হাড়বজ্জাত— এক ভাড়াটে, তার বাড়িওয়ালাকেই বাড়ি ছাড়া করবার জন্যে পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ-কে দিয়ে তৈরি বিশেষ বটিকা খাইয়ে এই বেড়ালকে আনিয়েছে কামাখ্যা থেকে। খবরটা পেয়েই আমি দৌড়তে-দৌড়তে আসছি। ত্রিভুবনে যা নেই, আমার তা চাই। এই বেড়ালটাকেই চাই।

শুনেই, ঘোর সন্দেহ হল আমার। প্রফেসর কি সব জেনেশুনেই আমার কাছে বেমালুম চেপে গিয়ে এই বেড়ালটাকেই খুঁজে আনতে অর্ডার দিয়েছেন?

চাণক্য আমার সন্দেহের কথা শুনেই আবার খানিকটা হা-হা করে হেসে বললে,—প্রফেসর মাঝেমাঝে তাজ্জব বগড় করেন ঠিকই। তবে অদৃশ্য বেড়াল খুঁজতে আপনাকে পাঠাবেন কেন? নিশ্চয় অন্য কোনও মতলব আছে। চলুন তো যাই—।

প্রফেসর চাণক্যকে দেখেই কিন্তু কুচ-কুচে কালো মুখখানাকে ভয়াল ভয়ংকর বিকট বদনখান করবার চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন,—আবার কী ফিকিরে আসা হয়েছে এ-তল্লাটে?

এবার কিন্তু হা-হা করে না হেসে মিঠে মিঠে হাসি ছড়িয়ে চাণক্য বললে,—আরেব্বাস, কী যে বলেন? এই ব্রেনে ফিকির গজায় কখনও? ফিকির তো কিলবিল করছে আপনার ব্রেনে।

তার মানে? তার মানে? তার মানে? —উৎকট গম্ভীর হয়ে গেলেন প্রফেসর।

—বলব? বলব? তাহলে বলেই ফেলি। —প্রশান্ত মহাসাগরের একটা দ্বীপপুঞ্জে তেজস্ক্রিয় মণিক খুঁজতে গেছিলাম।

তেজস্ক্রিয় মণিক! —চোখ দুটো প্রায় ছানাবড়া হয়ে এল প্রফেসরের।

—যে মণিকচূর্ণ দিয়ে বটিকা বানিয়ে গিলিয়ে দিলে শরীরের লক্ষ জিন এমন পালটে যায় যে অদৃশ্য হয়ে যেতেই হয়।

জুলজুল করে তাকিয়েই রইলেন প্রফেসর। স্পষ্ট বুঝলাম, মনের ম্যাপকাঠি দিয়ে মেপে-মেপে দেখছেন, চাণক্য আর কতটা জানে।

কথার তলোয়ার চালিয়ে গেল বটে চাণক্য,—সেইখানেই খবর পেলাম কামাখ্যার পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ বেশ কয়েকটা তেজস্ক্রিয় মণিক পাহাড়-পর্বত খুঁজে নিয়ে গেছেন অদৃশ্য করার এক্সপেরিমেন্ট করবার জন্যে।

প্রফেসরের চোখের পাতাও আর পড়ছে না।

চাণক্য বলছে,—কাজে লাগিয়ে দিলাম ফেরেব্বাজ গোয়েন্দা গ্যাঙ্গকে। এককাঁড়ি টাকা খরচ হয়ে গেল বটে, কিন্তু খবর হেঁটে হেঁটে চলে এল আমার কাছে।

কী খবর? —এতক্ষণে মুখ খুললেন প্রফেসর।

—পণ্ডিত পুণ্ডরীক্ষ—

—মূর্খ। ওঁর নাম পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ।

তাহলে জানেন দেখছি। বাজিয়ে নিলাম। —বলে, আমার দিকে চেয়ে অদৃশ্য হাসির বিস্ফুরণ ঘটিয়ে চাণক্য বললে, পণ্ডিত পুণ্ড...পুণ্ড...পুণ্ডরীকাক্ষ এক্সপেরিমেন্ট করে হয়েছি সাকসেসফুল। একটা বেড়ালকে অদৃশ্য করে দিয়েছেন। এখন ঘুরঘুর করছেন আপনার বাড়ির চারপাশে আপনাকে অদৃশ্য করে দেওয়ার জন্যে।

খবরটা আর চাপা নেই দেখছি। —স্বগতোক্তি করলেন প্রফেসর।

আমাকে বলেননি কেন? —রাগের চোটে গলা চড়ে গেল আমার, ঠেঙিয়ে বৃন্দাবন পাঠিয়ে দেব।

তাকে দেখতে পেলে তো। —বেশ মিষ্টি গলায় বললেন প্রফেসর, বুঝলে না? ওই মোটা মাথাটা এত আস্তে চলে...চাণক্য, মোটামাথাকে বুঝিয়ে দাও তো কেন দেখা যাচ্ছে না পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষকে।

তিনি নিজেই অদৃশ্য হয়ে আছেন যে। —চাণক্য প্রাঞ্জল করে দিল রহস্যটা।

আমি তো থ।

মিষ্টি-মিষ্টি করে বলে গেলেন প্রফেসর,—সেই জন্যেই তোমাকে একটা বেড়াল ধরে আনতে বলেছিলাম।

—কী করবেন বেড়াল নিয়ে?

—অদৃশ্য করে দেব।

—তেতক্রিয় মণিক-চূর্ণ তো আপনার কাছে নেই?

ওই তো রয়েছে। —টেবিলের দিকে আঙুল তুলে একটা কৌটো দেখালেন প্রফেসর। কাচের কৌটো। ভেতরের নীল মখমলের ওপর একটা রামধনু রঙিন পাথর জেল্লা মারছে, আমাকে উপহার দিয়ে গেছেন পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষ—খেলেই নাকি আমি তাঁর অদৃশ্য বৈজ্ঞানিকদের ক্লাবে মেম্বার হতে পারব।

—নিজে না খেয়ে বেড়ালকে খাওয়াতে চান?

—এই তো ঘটের বুদ্ধি খুলেছে। বেড়ালকে খাইয়ে তার ওপর এক্সপেরিমেন্ট চালাতে চাই। আগামী শতাব্দীটা হচ্ছে বায়োটেক শতাব্দী। আমার এই বায়োটেক এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল হলে সেটাই হবে বায়োটেক সেঞ্চুরির সেরা আবিষ্কার।

—বেড়ালের ওপর এক্সপেরিমেন্ট কেন?

—এই পাড়ার এক ভদ্রলোকের একটা মস্ত উপকার করার জন্যে।

—কোন ভদ্রলোক বলুন তো?

—বিদ্যাসাগর বিদ্যার্থী।

—ঝামেলার সূত্রে? যিনি পৈত্রিক ভিটের একতলায় থাকেন? দোতলার ভাড়াটে ভাড়া দেয় না? একতলার কলতলায় বিদ্যার্থী-মশায় ঢুকলে দোতলার কলঘর থেকে মাথায় নোংরা জল ফেলেন ফাটা মেঝের মধ্যে দিয়ে।

—যখন শোবার ঘরে শুয়ে থাকেন, তখনও ফাটা কড়িকাঠ দিয়ে গায়ে জল ঢালেন—জানো না?

—জানি...জানি...বিদ্যার্থী-মশায়কে বাড়ি ছাড়া করার মতলবে আছে ভাড়াটে—পাড়ার ছেলেদের হাত করে। কিন্তু বেড়াল ধরে আনতে বললেন কেন?

—পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষর অদৃশ্য বেড়ালটাকে এনে ভাড়াটে ভদ্রলোক বিদ্যার্থী মশায়ের ঘরে ছেড়ে দিয়েছেন। ঘরদোর নোংরা করে সে যা করছে, বলবার নয়। বিদ্যার্থী মশায় সেদিন এসে এর একটা বিহিত করতে বললেন বৈজ্ঞানিক উপায়ে। তাই তোমাকে একটা বেড়াল ধরে আনতে বলেছিলাম।

—তাকে তেজস্ক্রিয় মণিক-চূর্ণ খাইয়ে অদৃশ্য করবেন না হয়। —কিন্তু তারপর? চোখের ইশারা করে প্রফেসর বললেন,—পণ্ডিত নিশ্চয় অদৃশ্য হয়ে সব শুনছে। দেখতেই পাবে কী করব।

এরপর যা ঘটল, তা এক তাজ্জব ব্যাপার। আমি আর চাপকা দুজনে মিলে একটা বেড়াল ধরে এনেছিলাম। প্রফেসর তাকে তেজস্ক্রিয় মণিক-চূর্ণ খাইয়ে আমাদের চোখের সামনেই অদৃশ্য করে দিলেন। গলায় দড়ি বেঁধে রেখেছিলেন আগে থেকেই—সেই দড়ি ধরে অদৃশ্য বেড়ালকে টেনে নিয়ে গেলেন ল্যাবরেটরির মধ্যে।

তারপর, তার ওপর চালালেন বায়োটেক এক্সপেরিমেন্ট। গাছের জিন নিয়ে বেড়ালটার শরীরে ঢুকিয়ে অনেক হুশি-টুশি ফেলে তাকে একটা গাছ বানিয়ে দিলেন।

অদৃশ্য বেড়াল আর অদৃশ্য রইল না। কাঠের বেড়াল হয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল আমাদের সামনে। তারপর তাকে রেখে এলাম ভাড়াটের ঘরে। সেই সঙ্গে একটা চিরকুট : 'বাড়ির মালিকের ওপর উপদ্রব বন্ধ না হলে ভাড়াটেকে বানিয়ে দেওয়া হবে কাঠের ভাড়াটে। ইতি প্রঃ না-ব-চ।'

আমার আর চাপকার ওপর এবার ভার পড়েছে বিদ্যার্থী-মশায়ের বাড়ি থেকে অদৃশ্য বেড়ালটাকে ধরে আনার। তাকে কাঠের বেড়াল বানিয়েই যেন পণ্ডিত পুণ্ডরীকাক্ষকে কাঠের মূর্তি বানাবেন প্রফেসর।

কিন্তু তিনি কি আর এ তল্লাটে আছেন? পাজি ভাড়াটেও তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে। বিদ্যার্থী-মশায় এখন তোফা আছেন।
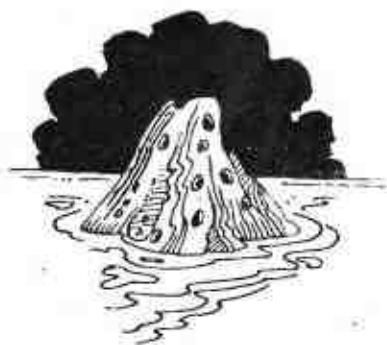
আশ্চর্য রশ্মি

চিমড়ে চেহারা। রোদে কালো মুখ। সরু নাকের নিচে মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ। বিলকুল টেকো মাথা, তাতে বিলক্ষণ তেল দেওয়াও হয়েছে। গায়ে ফতুয়া প্যাটার্নের বুশ শার্ট আর ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট, পায়ে রবারের হাওয়াই চটি। সবচেয়ে অদ্ভুত, তার ভুরু নেই। বিলকুল নির্লোম। ন্যাকপেকে হোক আর যাই হোক, লোকটার চোখে কিন্তু তেজ আছে। চেহারাখানার মধ্যেও চাবুক-চাবুক ভাব। মেরুদণ্ড সিধে—নোয়াতে গেলেই বুঝি ভেঙে যাবে।

টিপ করে প্রফেসরকে পেন্নাম ঠুকে নির্লোম ভুরু বেঁকিয়ে সে বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই রাখালরাজা গুরুফদার।

বসা হোক,—বসা হোক, বললেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক,—তুমিই সেই ভূপর্যটক?

—আজ্ঞে।

—পায়ে হেঁটে বিশ্ব প্রদক্ষিণ করেছ?

—আজ্ঞে।

—তুমি বাংলার গৌরব।

—আজ্ঞে না, বাঙালিরা যে কাজটা ভালো পারে, আমি তাই করেছি। তাতে কোনও গৌরব নেই।

—বাঙালি কোন কাজটা ভালো পারে [illegible]?

—পায়ের কাজ।

—সেকি! বাঙালি তো মাথার কাজেই বিশ্ববিখ্যাত।

—সেটা ব্যতিক্রম। পনেরো-আনা বাঙালি পায়ের কাজটাই ভালো পারে।

—রাখালরাজ, তোমার হেঁয়ালি কথার মানে বুঝতে গেলে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যাবে। পায়ের প্রহেলিকা প্রাঞ্জল করে দিলে ভালো হয়।

রাখালরাজ তখন ভারি সুন্দর ঝকঝকে সাদা দাঁত দেখিয়ে হেসে বললে,—বাঙালি ভালো পালাতে পারে। রণাঙ্গন থেকে পালিয়ে যেতে পারে। পায়ের কাজে তাই সে বড় পটু।

—জীবনযুদ্ধে তাই সে পরাজিত। ব্যবসা-বাণিজ্যে ল্যাজে-গোবরে। ঠিক, ঠিক, ঠিক। বৎসা পদসম্রাট, আমার কাছে কী অভিপ্রায়ে আগমন?

—সমুদ্র-সৈকতের কাহিনিটা শুনবেন বলেই তো চিঠি লিখে পাঠালেন। ভুলে গেলেন?

—মনে পড়েছে। ভূপর্যটনে বেরিয়ে তুমি গেছিলে পাহাড়ঘেরা নিরালা এক সমুদ্র সৈকতে। কেউ সেখানে যায় না পাহাড় টপকাতে হবে বলে, কিন্তু তুমি গেছিলে পা সুড়সুড় করছিল বলে—

—তা তো সব সময়েই করে। কিন্তু আসলে গেছিলাম খবরটা যাচাই করতে।

—সমুদ্রের ধারে নাকি এক আশ্চর্য দুনিয়া গজিয়ে উঠছে?

—আজ্ঞে। পাহাড়ি মানুষরা মিথ্যে কথা বলে না। তারা যখনি বললে, গেঁড়ি-গেঁড়ি মানুষে ছেয়ে যায় বালির তীর, গভীর রাতে অদ্ভুত আলোর ঝলক ধেয়ে যায় আকাশ লক্ষ্য করে—আশ্চর্য সেই মানুষরা কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়—কেউ তা জানে না। পাহাড় ডিঙিয়ে কেউ সে যায় না, এটা ঠিক। তার চাইতেও ভয়ংকর হল, তাদের চোখের দেখা দেখলেও পাগল হয়ে যেতে হয়।

—কেউ হয়েছিল?

—পাহাড়িদের একটা ছেলে হয়ে গেছিল। পাগল হয়েই সে পাহাড় থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরে যায়। যে কদিন বেঁচে ছিল ঘ্যানর-ঘ্যানর করে গেছে শুধু একটা কথা নিয়ে।

—কী কথা রাখালরাজ?

—যেও না যেও না কভু সাগরের ধারে,

সেথা আছে বেঁটে মানুষ।

তার আজব আলো—মারিবে তোমারে।

—তুমি গিয়ে তাদের দেখেছিলে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—মরোনি কেন?

—পায়ের জোর বেশি ছিল বলে!..

—পালিয়ে এসেছিলে?

—আজ্ঞে।

—কী দেখেছিলে?

—জায়গাটা খাঁ-খাঁ করছে বুঝি পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই। চারদিকে চোখা-চোখা গ্রানাইটের পাথর আর একদম ন্যাড়া পাহাড়। সে পাহাড় এমনই খাড়াই আর দুর্গম যে দুর্দান্ত পাহাড়িরাও পাহাড় টপকে সাগরের চেহারা দেখতে যায় না। যাবেই বা কেন? ন্যাড়া পাহাড়ে না আছে গাছপালা, না আছে জীবজন্তু। খাড়াই পাঁচিলের মতো পাহাড় টপকে লাভ কী? তাই কস্মিনকালেও কেউ ওদিকে যায় না।

কিন্তু কয়েক বছর ধরেই গভীর রাতে আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল পাহাড়ের মাথায়। তারপর মাঝে-মাঝেই শোনা যেতে লাগল গুমগুম শব্দ। কুসংস্কারের-জাহাজ পাহাড়িরা ভাবলে নিশ্চয় ভূতপ্রেত দখল নিয়েছে নিরালা পাহাড়গুলোয়। ফাঁকা জায়গাই তো বেশি পছন্দ অশরীরীদের।

এই যে গা-ছমছমে গুজবের শুরু হল, তা বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই ডালপালা মেলে ছড়িয়ে পড়ল আওয়াজগুলো দিনের বেলাতেও শোনা যাওয়ার পর থেকে। কায়াহীনদের কাণ্ডকারখানা রাতের বেলাতেই ঘটে, দিনের বেলা তো নয়।

দিন-দুপুরে একী আওয়াজ! গোটা তল্লাটটা যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। আলো ঝলকায় কি না, তা অবশ্য বোঝা যায় না মাথার ওপর সূর্য থাকে বলে।

কিন্তু নিশুতি রাতে দেখা যায় আলোর ঝলকানি। অনেক রঙের খেলা থাকে সেই আলোর মধ্যে। আকাশের মেঘের চেহারাও যেন পালটে যায় আলোর ঝলক গগন লক্ষ্য করে ছুটে গেলে।

এক ডাকাবুকো পাহাড়িয়া অজানাকে জানার নেশায় পাহাড় টপকে গেছিল সেখানে। ফিরে এসেছিল বদ্ধ পাগল হয়ে গিয়ে।

রাখালরাজ গুরুদাসের নিজেও এক পাগল। পা-পাগল। পা দুটোকে খামোকা টনটন করালে তবে তার মাথা ঠিক থাকে—দুদিন জিরেন দিলেই মাথায় পোকা নড়ে ওঠে। পায়ে হেঁটে পৃথিবী দেখতে বেরিয়ে তাই সে বড়-বড় শহর এড়িয়ে গেছে, অজানা অচেনা জায়গাগুলোতেই বেশি গেছে—পায়ের জোরের চরম পরীক্ষা দিয়েছে। চিতাবাঘের পায়ের মাসল-এও এত জোর নেই—যা তার পায়ে আছে।

পাহাড়িদের এই গণ্ডগ্রামে গিয়ে তাই দুদিন জিরোতেই মাথার পোকা নড়ে উঠেছিল। ভূত-প্রেতের গালগল্প শুনে আর গভীর রাতে আশ্চর্য আলোর ঝলক নিজের চোখে দেখে, বড় ইচ্ছে হয়েছিল ভূত দেখবে। বাংলার ছেলে সে। ছোটবেলা থেকে অনেক রকম ভূতের গল্প শুনে এসেছে। মামদো, বেম্মদত্তি, কন্ধকাটা প্রমুখ উঁচু জাতের ভূতেদের শরীরের বর্ণনা তার জানা আছে। কিন্তু বেঁটে ভূতেদের গল্প সে কখনও শোনেনি। তাই বড় ইচ্ছে হয়েছিল, গেঁড়ি ভূত দেখবে। ফটো তুলে রাখবে।

পাগল হয়ে যাওয়ার ভয় দেখিয়েছিল গাঁয়ের মানুষরা। হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিল রাখালরাজ। বলেছিল,—তাতেই আমার পাগলামি সারবে বোধ।

এই বলে একটা বোঁচকা কাঁধে করে হনহনিয়ে পাড়ি দিয়েছিল ভূত দেখতে।

যদিও সেই দুর্গম পাহাড় খোদ পাহাড়ি মানুষদের কাছেও বিভীষিকা—কিন্তু রাখালরাজের কাছে নয়। পা যার চিতাবাঘের চাইতেও শক্ত মাসল দিয়ে তৈরি, গোটা পৃথিবী যার পায়ের পেশির কাছে পরাজিত—তাকে কি খাড়াই পাহাড় আটকাতে পারে?

খুঁজে পেতে তাই শর্টকাট বের করে ফেলেছিল রাখালরাজ। ভূমিকম্পের ফলে একটা পাহাড় চড়-চড় করে ফেটে দুভাগ হয়ে গিয়ে রাস্তা বানিয়ে রেখেছিল। বড় খারাপ সেই পথ। রাখালরাজ কিন্তু এই খারাপ পথেই শিস দিতে-দিতে চলে গেছিল সমুদ্র-সৈকতের অনেক আগে। খুব কাছে যেতে পারেনি। খুব উঁচু একটা পাহাড়ের ডগায় হাঁচড়-পাঁচড় করে উঠেই দেখেছিল বহু দূরে আর বহু নিচে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে।

তখন দিনের বেলা। মাথার ওপর সাতঘোড়ার টানা রথ নিয়ে বিষম বেগে ধেয়ে চলেছেন সূর্যদেব। অনেক দূর পর্যন্ত তাই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। খালি চোখেই সেই দৃশ্য দেখে বিলকুল তাজ্জব হয়ে গেছিল রাখালরাজ।

তারপর চোখে লাগিয়েছিল বাইনোকুলার। মাথার চুল খাড়া হয়ে গেছিল সঙ্গে-সঙ্গে। রাখালরাজের তখন মাথা ভর্তি চুল ছিল। কিন্তু এখন নেই। অবিশ্বাস্য সেই ঘটনাটার পর থেকে সে পাগল হয়ে যায়নি বটে—কিন্তু মাথার সমস্ত চুল উধাও হয়েছে।

ঘটনাটা এই :

বাইনোকুলার দিয়ে সমুদ্র সৈকতে অদ্ভুত চলমান জীব দেখেছিল রাখালরাজ। কোনও জীবকেই তাজ্জব জীব বলে মনে হয়নি। শুশুক বা তিমি এত ছোট হয় না—দুপায়ে হেঁটে বেড়ায় না—অর্থাৎ তাদের গায়ের চামড়া গাঢ় রঙের শুশুক আর তিমির চামড়ার মতো। রোদ ঠিকরে যাচ্ছিল সেই চামড়া থেকে। দিব্যি দুপায়ে তারা হেলেদুলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বালির ওপর দিয়ে। আকৃতি তাদের অবিকল মানুষের মতোই—শুধু ওই গায়ের চামড়া ছাড়া। তাদের অনেকেই ঠ্যাং ছড়িয়ে বালির ওপর বসে পিঠ ফিরিয়েছিল সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়েছিল না কেউই। দেখবার জিনিস যেন এই পাহাড়ের রাজ্য। ঠিক যেন জল থেকে উঠে এসে বসে রয়েছে জলের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। হতভম্ব হয়ে যখন তাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রাখালরাজ, ঠিক তখনই সমুদ্রের জল তোলপাড় করে উঠে এসেছিল আর একটা পাহাড়। তর-তর করে জল কেটে ডাঙার কাছে এসে সটান উঠে গেছিল বালির ওপর। তলায় চাকা ছিল কি না বলতে পারবে না রাখালরাজ। চাকা থাকলে অত স্পিডে বালির ওপর দিয়ে যাওয়া যায় না। চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সমুদ্রের ধার থেকে অনেকটা ভেতরে এসে বালির ওপরেই দাঁড়িয়ে গেছিল চলমান পাহাড়।

আর অনেকগুলো ফুটো দেখা দিয়েছিল পাহাড়ের গায়ে। পিলপিল করে বেরিয়ে এসেছিল গাঢ় রঙের তেল-তেলে চামড়ার মানুষ। একটা শক্ত ফুটো দিয়ে টেনে এনেছিল একটা অদ্ভুত যন্ত্র। বালির ওপর সেটাকে রেখে দিয়ে দাঁড়িয়েছিল বিচিত্র জীবগুলো।

তারপরেই ভেলকি দেখাতে শুরু করেছিল আজব যন্ত্রটা। গুমগুম শব্দ বেরোচ্ছিল তার ভেতর থেকে। ঠিকরে যাচ্ছিল আলোর ঝলক। একটা আলো সটান এসে পড়ল পাশের পাহাড়ের চুড়োয়। সঙ্গে-সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে গেল চুড়োটা। আওয়াজ-টাওয়াজ কিছুই হল না। বিস্ফোরণ-টিস্ফোরণ দেখা গেল না। স্রেফ শূন্যে মিলিয়ে গেল পাহাড়ের চুড়ো।

চোখ বড়-বড় করে সেই দিকেই চেয়েছিল রাখালরাজ। আলোর রশ্মিটা কিন্তু সরে যায়নি। পাহাড়ের চুড়ো যেখানে ছিল—ঠিক সেই জায়গা ফুঁড়ে অনেক দূরে আকাশের দিকে ছুটে যাচ্ছিল।

হাঁ করে চেয়েছিল বলেই এর পরের অসম্ভব কাণ্ডটা দেখতে পেয়েছিল ভূপর্যটক।

খুব আবছাভাবে ফের দেখা গেছিল চুড়োটাকে। যেন জমাট কুয়াশা দিয়ে তৈরি। আলোর রশ্মি তখনও তাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটু-একটু করে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল চুড়োর চেহারা। একটু পরেই আগের মতোই পরিষ্কার দেখা গেছিল পর্বত শিখরকে। এখন আর আলোর রশ্মি তাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে যেতে পারছে না। একটু পরেই নিভে গেছিল আশ্চর্য রশ্মি।

সঙ্গে-সঙ্গে ব্যাপারটা বুঝে গেছিল রাখালরাজ।

আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও বৈজ্ঞানিক যা করতে পারেনি—এই মাত্র সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে গেল আশ্চর্য আলোর রশ্মি।

নিরেট জিনিসকে অদৃশ্য করে দিল চোখের সামনেই। দৃশ্যমানও করে তুলল চোখের সামনে।

কিন্তু কেন?

জবাবটা পেয়েছিল রাখালরাজ একটু পরেই। কিন্তু তার দাম দিতে হয়েছিল অনেক।

বলি দিতে হয়েছিল সাধের মাথার চুলগুলোকে। ধনুকের মতো বাঁকানো ভুরু জোড়াকে, আহারে! অমন লম্বা ঢেউখেলানো চুল—সব গেল।

কিন্তু আশ্চর্য মাহাত্ম্য তো টের পাওয়া গেল।

রাখালরাজের বউ নেই, ছেলেপুলে নেই—তাই প্রাণের মায়াও নেই। ও ঠিক করেছিল, কিম্ভূত জীবদের কাছ থেকে গিয়ে দেখতে হবে। ওই যে পাহাড়টা জল ঠেলে উঠে এসে ডাঙায় দাঁড়িয়ে আছে—ওটাকেও কাছ থেকে দেখতে হবে। কেনই বা তার গা থেকে রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে, সেটাও তো জানা দরকার। ধাতু দিয়ে তৈরি নাকি? তাহলে তো পাথরের পাহাড় নয়—ধাতু দিয়ে তৈরি জলযান। গড়নটা পাহাড়ের মতো। কিন্তু কেন?

গুটি-গুটি নিচে নেমেছিল রাখালরাজ। দিন গড়িয়ে তখন সন্ধে হয়-হয়। বালির ওপর বসে থাকা প্রাণিগুলো একে-একে পাহাড় জলযানের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। অদ্ভুত আলোর সেই যন্ত্রটা কিন্তু তখনও বালির ওপর বসানো রয়েছে।

একটা ভুল করেছিল রাখালরাজ। ক্যামেরায় ছবি তুলে রাখার লোভটা সামলাতে পারেনি। কিন্তু শাটার টেপার সঙ্গে-সঙ্গে পড়ন্ত রোদের আলো লেন্স থেকে অমনভাবে ঠিকরে যাবে কে জানত!

সঙ্গে-সঙ্গে ফের জীবন্ত হয়ে গেছিল অদ্ভুত আলোর সেই মেশিন। রশ্মি ঠিকরে এসেছিল ওর ক্যামেরা লক্ষ্য করে।

ক্যামেরায় অদৃশ্য হয়েছিল রাখালরাজের দুখানা হাত। কব্জির পর থেকে হাত আর নেই। ইতস্ততঃ রশ্মি শুধু ক্যামেরাই অদৃশ্য করেনি, দুহাত দিয়ে ক্যামেরা ধরা ছিল বলে, হাত দুটোকেও অদৃশ্য করে দিয়েছিল।

বিতিকিচ্ছিরি এই কাণ্ড দেখে ভয় পায়নি রাখালরাজ। রেগে গেছিল। স্পষ্ট বুঝতে পারছে, হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে ক্যামেরা—কিন্তু তা অদৃশ্য। ক্যামেরা যখন ধরে রয়েছে—হাত দুটোও নিশ্চয় আছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং রাখালরাজের রাগ হওয়া স্বাভাবিক। রেগে গিয়ে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে কী যে বলেছিল, তা ঠিক মনে নেই।

তবে চেঁচানি শেষ হতে না হতেই পায়ের কাছে কী একটা নড়ে উঠতেই ও চোখ নামিয়ে দেখেছিল বিচিত্র মানুষদের একজনকে।

অবাক হয়ে লোকটা তাকিয়েছিল রাখালরাজের দিকে। খুবই বেঁটে সে—একহাতও লম্বা নয়। গায়ে লোম নেই। গায়ে জামাকাপড়ের বালাই নেই। চোখ দুটো কিন্তু অবিকল মানুষের চোখের মতো। বরং আরও বেশি উজ্জ্বল, আরও বেশি বুদ্ধিদীপ্ত।

এই পর্যন্ত দেখার পর আর কিছুই দেখতে পায়নি রাখালরাজ। চোখের সামনে থেকে সব কিছু মিলিয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে শুধু মনে হয়েছিল—আলোর রশ্মিটা ওর মুখে এসে পড়েছে।

আবার যখন সব দেখা গেছিল, তখন সমুদ্র সৈকত বিলকুল ফাঁকা। মাথার ওপর তারা ঝকমক করছে। নেই পাহাড়-জলযান, সেই খুদে মানবও নেই—

আর নেই রাখালরাজের মাথার চুল আর চোখের ভুরু।

হতভম্ব হয়ে মাথা চুলকোনো তার পুরনো স্বভাব। তাই হাতদুখানাকে আর ক্যামেরাটাকে ফের দেখা যাচ্ছে দেখে মাথা চুলকোতে গেছিল।

তখনই টের পেয়েছিল, মাথায় একগাছি চুলও নেই। বিলকুল টাক।

প্রফেসর শুনে-টুনে নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন,—বুঝেছি। ওরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের রহস্য জানাজে। তোমার চোখের রেটিনা অদৃশ্য হয়ে গেছিল বলে অন্ধ হয়ে গেছিলে। অদৃশ্য মানুষ দেখতে পায় না—ওয়েলস আজ্ঞিক ভুল লিখেছিলেন তাঁর উপন্যাসে।

ম্যাগনেটিক ফিল্ড! —রাখালরাজ কেলো মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়েছিল।

—ফিলাডেলফিয়া এক্সপেরিমেন্ট এখন একটা মিথ্যে গুজব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

অথচ বৈজ্ঞানিক মহলের সবাই এ ব্যাপারটা নিয়ে গোপনে ভেবে চলেছে। গোটা জাহাজকে অদৃশ্য করে দেওয়া হয়েছিল ম্যাগনেটিক ফিল্ড দিয়ে—অদৃশ্য জাহাজকে লোকজন সমেত দৃশ্যমান করা হয়েছিল আর-এক জায়গায়। কিন্তু পাগল হয়ে গেছিল বেশ কিছু লোক। অর্থাৎ ম্যাগনেটিক ফিল্ড পরমাণুদের ছত্রাখান করে দিয়ে অদৃশ্য করে দিচ্ছে বটে, কিন্তু দৃশ্যমান করে তোলার পর অবিকল আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারছে না। পাহাড়ি ছেলেটা পাগল হয়ে গেছিল এই কারণেই।

হাঁদার মতো চেয়েই রইল বাঘালরাজ। প্রফেসর বলে গেলেন,—তোমার বেলা ঘটল অন্য বিপর্যয়। মগজের কোষগুলো ঠিকঠাক থাকলেও চুলগুলো গেল গুঁড়িয়ে। খুব অন্যায়। খুব অন্যায়। ক্যামেরার ফিল্মটা ঠিক আছে?

—আজ্ঞে না। বিলকুল সাদা হয়ে গেছে। কোনও ছবিই ওঠেনি।

—অর্থাৎ ওরা ভ্যানিশ করার ডিগ্রি একটু-একটু করে আয়ত্ত করে আনছে। ঠিকমতো ডোজ ছাড়ছে। পাহাড়ি ছেলেটার বেলায় ডোজ বেশি হয়ে গেছিল বলে মাথা বিগড়েছিল। ক্যামেরার বেলায় শুধু ফিল্মের ছবি অদৃশ্য করে দিয়েছে—আর তোমার বেলায় পারমানেন্টলি অদৃশ্য করেছে তোমার মাথার আর ভুরুর চুল। তোমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যে—যাতে আর ও-মুখো না হও। ম্যাগনেটিক ফিল্ডের টাইম-লিমিট বেঁধে দিয়েছিল বলেই ওরা চলে যাওয়ার পর চুল বাদে মুণ্ডুটা দৃশ্যমান হয়েছিল। তোমার ভাগ্য ভালো, রেটিনাকে স্থায়ীভাবে অদৃশ্য করে দিয়ে যায়নি। তাহলে অন্ধই থেকে যেতে।

লাফিয়ে উঠে বলেছিল বাঘালরাজ,—চুল তাহলে আছে। ফিরে পেতে পারি? আবার ভুরু নাচাতে পারব?

ঠোঁট উলটে বলেছিলেন প্রফেসর,—সেটা ওদের দয়া। কলকাতায় খুব শিগগিরই ম্যাগনেটিক ফিল্ডকে কাজে লাগিয়ে মানুষের শরীরের ভেতরের সবকিছু দেখার এক যন্ত্র আসছে। সেখানে এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারো। তবে সে মেশিনের ক্যাপাসিটি তো মোটে ষাট হাজার গুণ।

—কীসের ষাট হাজার গুণ?

—পৃথিবীর ম্যাগনেটিক ফিল্ডের।

—তাহলে ওদের কাছেই যাই।

—যাও।

—কিন্তু ওরা কারা প্রফেসর?

খুব সম্ভব ডুবে যাওয়া অ্যাটলান্টিস মহাদেশের বংশধর—ঠাট্টার সুরে বললেন প্রফেসর, ফিরে এসে আসল খবরটা দিও।

দজ্জাল দর্পণ

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র আর ডক্টর গোপাল গোলদার দুজনে দুজনকে ঘুসি দেখিয়ে বললেন,—জোচ্চোর! চারশো বিশ! ঠগ! প্রবঞ্চক!

চারটে বিশেষণ একই সঙ্গে দুই বৈজ্ঞানিকের মুখ দিয়ে বেরোয়নি। প্রথমে তেড়ে এসেছিলেন ডক্টর গোলদার। তিনি ঘুসি উঁচিয়ে বলেছিলেন,—'জোচ্চোর! চারশো বিশ!

দপ করে জ্বলে উঠেছিলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র। ঘুসি মারার বিদ্যেটা উনি আমার কাছ থেকেই রপ্ত করেছেন মনে হল। দ্বিগুণ বেগে তেড়ে গিয়ে ঘুসি তুললেন,—ঠগ! প্রবঞ্চক!

উলবা স্পিডে আমি মাঝে চলে গেলাম। ফলে, দমাদম ঘুসি খেয়ে গেলাম। বিদ্যাসাগর ঠিকই বলেছেন, কারও উপকার করতে নেই।

অথচ ঘুসোঘুসির মূল কারণটা নিতান্তই তুচ্ছ। ডক্টর গোপাল গোলদারের নামকরণ করার সময়ে তাঁর বাবা আর মা কেউই ভাবেননি, তাঁদের পুত্ররত্ন বাস্তবিকই গোলবলের মতন হবেন বড় হলেই—মুখখানাও হবে গরুর মতন বোকা-বোকা আর নিরীহ।

খানাপিনাও হবে গরুর মতন—সব সময়ে জাবর কেটেই চলবেন। ভুঁড়ি ঝুলতে-ঝুলতে মাটিছোঁয়া হয়ে যাবে, চোখ দুটোও গরুর মতন—নিস্পৃহতায় সদা উদাসী হয়ে থাকবে।

স্কুল-লাইফে দুই কিশোর (একজন ভবিষ্যতের নাটবল্টু চক্র, অপরজন ভবিষ্যতের গোপাল গোলদার) হরিহর আত্মা বন্ধু বিশেষ ছিলেন। নাটবল্টু চক্রর নতুন নাম দেন গোপাল গোলদার। ফুটবল মাঠে খেলোয়াড় গোলদারের এই বন্ধুটি (প্রফেসর নাটবল্টু চক্র) যখন পাঁই-পাঁই করে দৌড়তেন, তখন মনে হতো যেন তাঁর পায়ে

ঢাকা লাগানো আছে, যখন চার্জ করার নামে ল্যাং মারতেন—তখন ধরাশায়ী প্রতিপক্ষ গলার শির তুলে চেঁচাত—তোর পায়ে লোহার নাট, লোহার বল্টু আছে নাকি? ওই তো কঙ্কালের মতন হাড্ডিসার চেহারা—উফ। গেল বুঝি পা-খানা ভেঙে!

গোপাল গোলদার গরুর মতন ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে গোলগাল বপু নিয়ে গোলকিপারের কাজটা ভালোই করতেন। গোলপোস্টে দাঁড়িয়েই চেঁচিয়ে উঠতেন,—নাট বল্টু...নাট বল্টু...চক্র...চক্র (চক্রবর্তীর, অপভ্রংশ চক্র—!) মাঠসুদ্ধু ছেলেরা চেঁচিয়ে বলেছিল,—ফাউল...ফাউল...নাটবল্টু চক্রর ফাউল।

রেগে টং হয়ে গিয়ে নতুন নামপ্রাপ্ত নাটবল্টু চক্র বন্ধুবর গোপাল গোলদারকে বললেন,—তুই...তুই একটা গোগো। এমনভাবে বললেন যাতে মনে হয়, গোগো এক শ্রেণীর ছুচুন্দর (ছুঁচো) জাতীয় জীব। যদিও গোপাল গোলদারের অপভ্রংশ হল গোগো।

রেগে কাঁই হলেন গোগো। আজও রেগে কাঁই হয়ে ঘরে ঢুকেই প্রফেসরকে বলেছিলেন,—কীরে নাটবল্টু, আর কত ফোর-টোয়েন্টি কারবার চালাবি?

রেগে টং হয়ে প্রফেসরও তখুনি বলেছিলেন,—লোক ঠকিয়ে জাবর কেটেছিস না, গোগো—ঢুকে থাক গর্তে—তোর দ্বারা কিস্সু হবে না।

ব্যস, তারপরেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের সূচনা এবং আমার মধ্যস্থতা।

উত্তাপ প্রশমনের পর গলাবন্ধ কোটের পকেট থেকে খোসা ছাড়ানো চিনেবাদাম বের করে চিবোতে লাগলেন ডক্টর গোগো। খাচ্ছেন তো খাচ্ছেনই—সত্যিই যেন জাবর কাটছেন।

বিরসবদনে তাকিয়ে থেকে প্রফেসর বললেন,—আসা হয়েছে কী জন্যে?

তখুনি জবাব দিলেন না ডক্টর গোগো। পরপর আরও তিনমুঠো চিনেবাদাম খেলেন। চোখ দুটো সত্যিই গরুর মতন। যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানেন না। খুব ধড়িবাজেরা বাইরে বোকা সেজে থাকে। এদেরকে সাবধান। আমিও সাবধান হলাম।

ঘাগুরাকাঠি প্রফেসরও কাঠ হয়ে রইলেন।

সমস্ত বাদাম ভুঁড়িতে চালান করার পর বললেন ডক্টর গোগো,—ইপাটি লোক লাগিয়েছে।

এইবার যে কথাটা বললেন প্রফেসর, তা শুনেই বুঝলাম, উনি ডক্টর গোগোর হাঁড়ির খবরও রাখেন। চেপে রেখেছেন আমার কাছেও।

বললেন,—তোর দজ্জাল দর্পণের জন্যে?

হ্যাঁ।

আমি আর বোবা হয়ে বসে থাকতে পারলাম না। সঁটুটে কথাগুলো আমার সামনে? আমি কি গোপন কথা ফাঁস করে দিই? একটু আধটু গপ্পো লিখি ঠিকই—তাই বলে আমাকে অবিশ্বাস করা?

মুখখানা নিশ্চয় তোলা উনুনের মতন করে ফেলেছিলাম। প্রফেসর তা দেখেই প্রমাদ গুণলেন। সাত তাড়াতাড়ি বললেন,—আরে শোনো, শোনো।

শুনে তো আমি থ। এরকম একটা তাজ্জব আয়না আবিষ্কার করে বসে আছেন ডক্টর গোগো, কাকপক্ষীও তা জানে না।

না, না, জানে। জেনে ফেলেছে। গর্তে ঢুকে, মানে গোপন আস্তানায় ঘাপটি মেরে থেকে বৈজ্ঞানিক গোগো শুধু বিজ্ঞানের সাধনাই করেননি—দেশ-বিদেশের ম্যাজিক আর কিংবদন্তি, মারণ-উচাটনের তন্ত্রমন্ত্র থেকে শুরু করে ভুডুইজম, জ্যান্ত মানুষকে জ্যান্ত মড়া বানানো ইত্যাদি উদ্ভট অবিশ্বাস্য ব্যাপার নিয়ে বছরের পর বছর গবেষণা করে গেছেন বস্তা-বস্তা চিনেবাদাম খেয়ে। আর কিছু খাননি। শুধু চিনেবাদাম আর পিপে-পিপে জল।

ফল যা হয়েছে, তা একই সঙ্গে অত্যাশ্চর্য আর মারাত্মক। ওঁর আশ্চর্য আবিষ্কার জানাজানি হয়ে গেলেই পৃথিবী কেঁপে উঠবে, তার পরেই পৃথিবীর সর্বনাশ হওয়া শুরু হবে। মহাবিপদটা হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর চাইতেও ভয়ানক।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাই ওঁকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন,—চেপে যা, গোগো, চেপে যা, তুইও ওর সামনে যাসনি।

ওর সামনে, মানে, গোগো-র তৈরি আয়নার সামনে।

গেলেই আয়না কায়াকে টেনে নেবে নিজের বুকে। পেছন দিয়ে বেরিয়ে যাবে ছায়া।

প্রথম-প্রথম কুকুর বেড়াল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন গোগো, সবকটা তাদের খেয়ে নিয়ে শুধু ছায়াকে বের করে দিল আয়না, সে ছায়াদের কোনও শক্তি নেই। না পারে মিউ-মিউ করতে, না পারে ঘেউ-ঘেউ করতে। চুরি করে খায়ও না। ছায়াভূত হয়ে ম্লান মুখে ঘুরে বেড়ায় বাড়িময়।

তারপর একটা স্পাই ঢুকল গোপন গবেষণাগারে। ডক্টর গোগো তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আয়নার সামনে নিয়ে গেলেন। আয়না সঙ্গে-সঙ্গে তার কেরামতি দেখিয়ে দিল। কায়া লুফে নিয়ে ছায়াকে বের করে দিল। সে এখন ছায়াভূত হয়ে বিষণ্ণ বদনে ঘুরঘুর করছে।

প্রফেসর আমাকে বুঝিয়ে দিলেন,—বুঝলে দীননাথ? এই হচ্ছে ছায়া-বিশ্ব। যাকে অনেকেই বলছে প্রতি-বিশ্ব। ঠিক এইরকম বিশ্ব-র পাল্টা বিশ্ব কোথাও-না-কোথাও আছে। সেখানে ঠিক তোমার মতন একটা দীননাথ। এই পৃথিবীর মতন একটা পৃথিবী। এমনকী এই গোগো-র মতন একটা গরুও আছে।

খ্যাঁক করে উঠলেন ডক্টর গোগো,—তোর মতন একটা চিংড়িও আছে।

কর্ণপাত না করে বলে গেলেন প্রফেসর,—গোগো কিন্তু স্রেফ চিনেবাদাম খেয়ে আর সাধনভজন করে আর একটা বিশ্ব আবিষ্কার করে ফেলেছে। ওর থিওরি অনুযায়ী, প্রত্যেকটা ব্ল্যাকহোলের মধ্যে এই রকম একটা ছায়া-বিশ্ব রয়েছে। মানুষ মরে সেখানে গিয়ে ছায়া হয়ে যায়। পৃথিবীটাকে যাদের বেশি ভালো লাগে, তারা ছায়া-শরীরী হয়ে ফিরে আসে। আমরা তাদের ভূত বলি।

ডক্টর গোগো আর-একমুঠো চিনেবাদাম মুখে পুরে বললেন,—থানাই-পানাই ছাড়ো, ইয়ার। কাজের কথায় এসো।

প্রফেসর কটমট করে তাকালেন,—গর্তে থেকে থেকে তোর ল্যাঙ্গুয়েজটা খারাপ করে ফেলেছিস। ওই জন্যে খারাপ লোক তোর কাছে ঘুরঘুর করছে।

গরু-গরু চোখে তাকিয়ে কচর-মচর করে চিনেবাদাম চিবিয়ে গেলেন ডক্টর গোগো।

প্রফেসর বললেন,—ইপাচি জেনে গেছে আমাদের খবর।

এই প্রথম কথা বললাম আমি,—ইপাচি কে?

সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন—গপ্পো-টপ্পো লেখা হবে না তো? যদিও ব্যাপারটা গল্পের মতন আজগুবি।

সখেদে আমি বললাম,—সব গপ্পো আজগুবি নয়। আপনার কাণ্ডকারখানা কি আজগুবি? আমার গপ্পো তো আপনাকে নিয়ে।

বাবা দীননাথ, গোগো-কে পাবলিসিটি দিতে যেও না। মারা পড়বে।

ইপাচি কে?

ঠিক সাড়ে সাত সেকেন্ড মুখে কুলুপ এঁটে রইলেন প্রফেসর।

তারপর বললেন,—ইন্ডিয়া—পাকিস্তান—চীন—সন্ধি করো। শুধু প্রথম অক্ষরগুলো নাও। কী হল? ইপাচি।

হাঁ, হাঁ—ঘন-ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলাম আমি।

ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, চীনদেশের গুঁতোগুঁতি দেখে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন বেশ কিছু শক্তিমান পুরুষ গোপনে একটা দল পাকিয়েছে। তারা চায়—ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, চীন জুড়ে গিয়ে একটা দেশ হোক। তার নাম হোক—ইপাচি।

আমি খাবি খেলাম।

প্রফেসর চালিয়ে গেলেন,—ইপাচি-র মারদাঙ্গা এজেন্টরা দজ্জাল দর্পণের কথাও জেনে ফেলেছে। তারা এই দর্পণ নিয়ে গিয়ে ফেলবে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-চীনের রথী-মহারথী রাষ্ট্রনায়কদের সামনে। একে-একে তারা মিলিয়ে গিয়ে মহাশূন্য, মানে, ছায়াশরীর নিয়ে নিজের নিজের দেশে বিচরণ করবে। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান-চীনের লাগাম ধরবে ইপাচি-র কর্তারা।

সবেগে বললাম,—সে তো ভালোই।

সখেদে বললেন প্রফেসর,—স্টুপিড। আমরা বৈজ্ঞানিক, আমাদের আবিষ্কার নিয়ে রাজনীতি চলবে না...চলবে না।

কোরাস গাইলেন ডক্টর গোগো,—চলবে না...চলবে না।

অগত্যা আমাকে আসরে নামতে হয়েছিল। ইপাচি-র প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিয়েছি। দজ্জাল দর্পণ কিন্তু এখন আমার দখলে।

এই কাহিনি যারা অবিশ্বাস করবে, তারা ইচ্ছে করলে এসে দর্পণের সামনে দাঁড়াতে পারে।

মেহগনি জঙ্গলের বিস্ময়

যথারীতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছিলেন প্রফেসর। তারপরেই এল তাঁর চিরকুট—চলে এসো, চলে এসো, বিস্ময় প্রিয় খোকা দীননাথ। এসে ভাব, অ্যাডভেঞ্চার করবে কি না।

গালে হাত দিয়ে বসে গেছিলাম। এ আবার কি হেঁয়ালি। অ্যাডভেঞ্চারের পোকা আমি। বিপদের গন্ধ পেলেই আমার শরীরের প্রতিটি অণু-পরমাণু মহানন্দে ধেই-ধেই করে নাচে আর গলা ছেড়ে গান ধরে,—জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।

প্রফেসর তো এসব জানেন। গন্ডারের গোঁ নিয়ে যদি অ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়ে পাছে অক্কা পাই—তাই সব জায়গায় আমাকে নিয়ে যান না। নিজে গা-ঢাকা দেন। এরকম অনেকবার হয়েছে। খুঁজে-খুঁজে তাঁকে বের করতে হয়েছে। অথবা এই খোকা দীননাথের জন্যে মন কেমন করায় নিজেই ঠিকানা পাঠিয়ে ডেকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কখনও লেখেননি, এসে ভাব, অ্যাডভেঞ্চার করবে কিনা।

ধাঁধায় পড়লাম সে-কারণেই।

অ্যাডভেঞ্চার তো করবই—পেলেই ঝাঁপ দেব। কিন্তু একথা উঠছে কেন? আমাকে রুখতে চান বলে?

তাহলে আবার ডাকছেন কেন? বিপদে পড়েছেন বলে?

এক লাইনের নেমন্তন্নপত্রে দুটো শব্দ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। বিস্ময় আর প্রিয়। হাইফেন দিয়ে জুড়ে নিয়েছেন বটে। কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ আলাদা মানে নিয়ে আমার মনের কোণে খোঁচা মেরে চলেছে চিঠি পড়া ইস্তক।

বিস্ময় আমার প্রিয় সন্দেহ নেই। প্রফেসর যেখানে আছেন, নিশ্চয় সেখানে

সৃষ্টিছাড়া কোনও বিস্ময় রয়েছে। সে বিস্ময় এমনই বিস্ময় যে দেখলে পিলে আমার চমকাবেই। অথচ সেই বিস্ময় নির্ঘাত প্রবল হাতছানি দেবে অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধের যোগান দিয়ে। সেই গন্ধে পাগল আমি হবই।

কিন্তু সে অ্যাডভেঞ্চার নিশ্চয় ভয়ানক বিপদে ভরা। প্রফেসর নাটবল্টু চক্র তাই ঘর ছেড়ে বেরনোর আগেই আমাকে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছেন।

মানেটা পরিষ্কার হয়ে যেতেই আমি গম্ভীর হয়ে গেলাম। শির উঁচিয়ে তেড়ে গেলাম প্রফেসরের পাশে।

প্রফেসর বসেছিলেন একটা প্রকাণ্ড মেহগনি গাছের তলায়। জায়গাটা কলকাতা থেকে অনেক দূরে। ক্যারিবিয়ান সাগর আর মেক্সিকো উপসাগরের মাঝামাঝি জায়গায় যেন পাঁচিল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ইউকাটান উপদ্বীপ। সত্তর হাজার বর্গ মাইলের বেশিরভাগই চুনাপাথর। নদীর বালাই নেই জমির ওপর। জায়গাটার পয়লা নম্বর বিস্ময় এখানেই। নদী ছিল এককালে। এখন সব পাতালে চলে গেছে। ফল্গু নদীর রমরমা চলছে সত্তর হাজার বর্গমাইল জুড়ে।

জায়গাটার দোসরা বিস্ময়, মায়া সভ্যতার ধ্বংসস্তূপ। সুপ্রাচীন সেই মায়া সভ্যতা—যা বৈজ্ঞানিক আর প্রত্নতাত্ত্বিকদের মুণ্ডু ঘুরিয়ে ছেড়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ধ্বংসস্তূপগুলোর কেন্দ্র এইখানেই। বলা চলে ভগ্নস্তূপের আড়ত।

আমি এসেছি ইউকাটানের দক্ষিণ অঞ্চলে। নিবিড় সবুজ অরণ্য মনের মধ্যে যেন ঠান্ডা মলম বুলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এমন গাঢ় মেহগনি এই প্রথম দেখছি। নিরক্ষীয় আমেরিকার ঘন জঙ্গলেই এমন মেহগনি জন্মায়। বেশ ভারী কাঠ। ফার্নিচার করার উপযুক্ত।

আমার চোখ কিন্তু মেহগনির দিকে নেই। রয়েছে সামনের আজব পিরামিডটার দিকে। অপলক নয়নে এই দিকেই তাকিয়ে বসে আছেন প্রফেসর। পেছনের তাঁবুর ওপর ঝুঁকে পড়েছে মেহগনির ডাল। ধড়মড় কয়েকটা বাঁদর ওই ডালে ল্যাজ দিয়ে বসে জুলজুল করে দেখছে আমাদের।

মিশরের পিরামিড ঢের দেখেছি। কিন্তু এমন পিরামিড দেখছি এই প্রথম। পিরামিডদের মধ্যে দানব।

চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। শুধু অতিকায় বলে নয়—এমন সাদা পিরামিড কখনও দেখিনি।

সবুজ জঙ্গলের মাঝে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। মাঝে খাড়াই পাহাড়। এই পাহাড়ের মাথায় তৈরি হয়েছে দানবিক সাদা পিরামিড। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে শুভ্র শ্বেতবপু থেকে। আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে, মাথা ঘুরিয়ে ছাড়ছে।

অবিশ্বাস্য। একেবারে অবিশ্বাস্য। বাস্তবে এমন পিরামিড হয় কী করে। অথচ দেখছি তো নিজের একজোড়া চক্ষুবীক্ষণ দিয়েই।

বালিপাথরের রঙ বিলকুল সাদা। শ্বেতবর্ণের মধ্যে নেই কোনও ভেজাল। মেক্সিকোর সূর্য পরমানন্দে কিরণ বর্ষণ করে চলেছে সাদা বালিপাথরে।

চারপাশের ঘন সবুজের মাঝে সাদা দানব। চোখে লাগার মতো বৈচিত্র। দানবিক পিরামিড তাই চোখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে ব্রেনের ভেতর ঝড় তুলেছে।

মানুষের হাতে তৈরি বলে তো মনে হচ্ছে না,—বলেছিলাম বিস্ময় মন্থর স্বরে।

প্রফেসরের যেন চমক ভাঙল। বললেন,—কিন্তু প্রকৃতি আর যাই বানাক, স্ট্রেট লাইন বানাতে পারে না। এই পিরামিডের দিকে-দিকে রয়েছে সোজা সরল রেখা। যা বানাতে জানে মানুষ—আর কেউ না।

'আর কেউ না'—শব্দ তিনটে একটু অস্বাভাবিক সুরে বললেন প্রফেসর। ঝটিতি মুখ ফেরালাম তাঁর দিকে। তিনি নিষ্পলক চেয়েই আছেন অপরাহ্নের রৌদ্র-ঝলসিত শ্বেত-ইমারতের দিকে।

ঝড়ের মেঘ জড়ো হচ্ছে মাথার ওপর। কালো কুচকুচে মেঘ। আসন্ন প্রলয়ের পূর্বাভাস। মেঘ চলেছে পাহাড়চুড়োর পিরামিডের দিকে। ক্রমশঃ রোদও ম্রিয়মান হচ্ছে। দিনের আলো স্তিমিত হচ্ছে ক্ষণে-ক্ষণে। অন্ধকার একটু পরেই গ্রাস করবে বিপুলকায় এই শ্বেত-বিস্ময়কে।

নিরন্ধ্র তমিস্রায় অরণ্যের চরিত্র তখন হয়তো পালটে যাবে। এখন যা মধুময়—তখন তা ভয়াল ভয়ংকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কিচমিচ করে যেন আমার চিন্তাকে সায় দিয়ে গেল মেহগনির বাঁদরগুলো। ফিরলাম প্রফেসরের দিকে। বললাম,—বিজ্ঞান-দুনিয়া স্তম্ভিত হয়ে যাবে আপনার এই আবিষ্কারের খবর পেলে। শুরু হবে অভিযানের পর অভিযান।

নড়ে বসলেন প্রফেসর। অস্বস্তির চাঞ্চল্য। আমার উক্তি তাঁর মনমতো হয়নি। বললেন,—প্রথম দর্শনে বিশাল মনে হচ্ছে বটে, কিন্তু আসলে তেমন বিরাট নয়।

আমি বললাম,—প্রফেসর, আমাকে যতটা বোকা ভাবেন, আমি ততটা বোকা নই। মিশরের পিরামিড নিয়ে আপনি যখন গবেষণা শুরু করেছিলেন, আমি ছিলাম আপনার নিত্যসঙ্গী। চিওপস-এর গ্রেট পিরামিড-ও এই পিরামিডের সামনে নেহাতই বামন।

কালো মেঘের দঙ্গলের দিকে চোখ তুললেন প্রফেসর। পাতলা কালো যবনিকার চেহারা নিচ্ছে মেঘ। শ্বেত-বিস্ময়কে মুড়ে দেওয়ার পূর্ব-প্রস্তুতি। বললেন,—ঝড় উঠবে এখুনি। আজ এই পর্যন্ত থাক। কাল আরও কাছ থেকে দেখো।

শুনেই এতজোরে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম যে, পেছনের বাঁদরগুলো চমকে উঠল। বিষম কলরব তুলে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল মেহগনির ঘন পাতার আড়ালে।

কড়া গলায় বললাম,—এখুনি...এখুনি...এখুনি! ভেতরে ঢোকবার পথ যদি থাকে, ভেতরেই ঢুকব এখুনি।

ঢোক গিললেন প্রফেসর,—ঢোকবার পথ আছে কিন্তু পিরামিডের ওদিকে। যেতে-যেতেই রাত নামবে।

কটমটে চোখে প্রফেসরের গুলি-গুলি চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম,—ভয় পেয়েছেন মনে হচ্ছে? হয়েছে কী আপনার?

আস্তে-আস্তে মাথা নাড়লেন প্রফেসর,—ভয় পাব কেন? ভিনার পড়েছি। আজ পর্যন্ত যত পিরামিড দেখেছি, তাদের তৈরি করা হয়েছিল বিশেষ একটা উদ্দেশ্যে। কিন্তু এই পিরামিড নির্মাণের উদ্দেশ্যটা—

বলতে-বলতে থমকে গেলেন প্রফেসর। মুখে আর কথা নেই।

আমি বললাম,—বেশ তো, দেখেই আসা যাক না কেন। আপনি গ্রিন সিগন্যাল না দিলে তো এই নিয়ে গল্প লিখতে বসব না।

গল্প! —বলে ব্যঙ্গের হাসি হাসলেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র,—কল্পবিজ্ঞানের গল্প? যত্তো সব বুজরুকি।

মাথাটা চড়াত করে উঠল। অতি কষ্টে সামলে নিলাম। বিজ্ঞান জগতে খোলামেলা নিয়ে চলেন প্রফেসর। তাই তো এত পিলেচমকানো কাণ্ড ঘটিয়ে ছাড়েন। কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের অতীব সম্ভাবনাময় গল্প-কাহিনির নাম শুনলেই খেঁকিয়ে ওঠেন।

ঠোঁট কামড়ে চুপ করে থাকাই শ্রেয় মনে করলাম।

জুলজুল করে আমার দিকে তাকালেন প্রফেসর। একটু নরম গলায় বললেন, —লেখো না। ছাইপাঁশ লেখায় আমার কিছু এসে যাবে না। ও গল্প কেউ বিশ্বাসও করবে না। এখানেও কেউ ঝগড়া দিতে আসবে না।

আমি বললাম,—তাহলে মুখে চাবি এঁটে আছেন কেন? এরকম একটা পিরামিড যে এই জঙ্গলে লুকিয়ে আছে, সে খবর তো পেয়েছেন অনেকদিন—মুখে কুলুপ এঁটে আছেন কেন?

সেই ক্যারিবিয়ান ভূতটার জন্যে। —বিড়বিড় করে বললেন প্রফেসর।

ক্যারিবিয়ান ভূত! —খাবি খেলাম আমি।

—ক্যারিব...ক্যারিব...নামটা দিয়েছিলেন কোলাম্বাস। ক্যারিব শব্দের অপভ্রংশই তো ইংরেজিতে—ক্যানিব্যাল। নরখাদক। অতি হিংস্র জাত। খাঁটি ক্যারিবদের আনাগোনা এই ক্যারিব ভূতটার সঙ্গে।

—ভূত!

—দূর ভূত! কথাও বোঝে না! আর আদিবাসী ওই ক্যারিব-এর মুখেই শুনেছিলাম, এখানে রয়েছে এক আশ্চর্য পিরামিড।...বলেছিল অবশ্য ওর ক্যারিব ভাষায়—মানে বুঝতে আমার কালঘাম ছুটে গেছিল। বুঝলাম যখন, তখন চক্ষু চড়কগাছ। সেই থেকে আমার খাওয়া-দাওয়া ঘুমটুম মাথায় উঠেছে। তোমাকেও বলিনি। নিজের চোখে না দেখে তোমাকে টেনে আনতে চাইনি।

ও...ও...ও. —বলে চুপ মেরে গেলাম আমি।

সান্ত্বনার সুরে বলে গেলেন প্রফেসর,—চটছ কেন? আসবার সময়েই তো দেখলে আমেরিকা মহাদেশের সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল এইটা। যখন এসে পৌঁছলে, স্পষ্ট দেখলাম তোমার মতন ছেলেরও জিভ বেরিয়ে গেছে।

বলে আমার দিকে চাইলেন প্রফেসর। ওঁর রসিকতা যে আমার ভালো লাগেনি, তা বুঝলেন। গ্রাহ্য করলেন না।

বলে চললেন,—উপত্যকায় ঢোকবার আগে কি কল্পনাও করতে পেরেছিলে, এমন একটা তাজ্জব দৃশ্য তোমার পথ চেয়ে বসে আছে? তাও আবার পুরোটা দেখা যায় শুধু আকাশ থেকে? আমাকেও অবশ্য সেভাবেই দেখতে হয়েছে।

—আকাশ থেকে দেখেছেন!

—নিশ্চয়ই। কাফ্রির ভূতুড়ে গপ্পো শুনেই কি দৌড়ে এসেছি বনজঙ্গল ঠেঙিয়ে? এই বয়েসে পোষায়? আগে যাচাই করা দরকার তো! আকাশপথে দেখে গেছিলাম বলে আবিষ্কারটা করতে পারলাম, নইলে চোখের আড়ালে থেকে যেত আরও কয়েকশো বছর।

—আপনার আগে আকাশপথে আর কেউ দেখেনি?

—না। কারণ, আকাশের এরোপ্লেনরা বাঁধাধরা পথে যাতায়াত করে—এটা পড়ছে রুটের বাইরে। তাই আমাকে আলাদা প্লেন ভাড়া করতে হয়েছিল।

—অনেক টাকা উড়িয়েছেন?

—কে খাবে আমার টাকা? সবই তো বিজ্ঞানের জন্যে।

—কিন্তু প্রফেসর, এতবড় আবিষ্কার এতদিন চেপে রেখেছেন কেন? কেন বিজ্ঞান-দুনিয়াকে জানাননি? একা এসে তাঁবু খাটিয়ে বসে আছেন কেন? আমি না হয় বোকা-হাঁদা, বিজ্ঞানীরা তো নন।

—তোমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে জানাই, বিজ্ঞান-মহলকে জানাতে আমার বয়ে গেছে। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর,—বসে আছি অভিযানের আনন্দে। যে আনন্দ করতে তুমি সাত সমুদ্দুর তেরো নদী পেরিয়ে উড়ে এসেছ এখানে।

—লোকালয়ের সঙ্গেও তো যোগাযোগ রাখেননি।

—বিজ্ঞানী হতে গেলে কি লোকালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়? মূর্খ! যে-মুহূর্তে দেখেছি এই পিরামিড, সেই মুহূর্তেই একটা আইডিয়া ডানপালা মেলে বসেছে মাথার মধ্যে। প্রথম যখন পুরাতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেছিলাম—সে অনেক বছর আগের কথা, আইডিয়াটা তখনই অঙ্কুরিত হয়েছিল মাথার মধ্যে। এখানকার মাটিতে পা দিয়েই বুঝলাম, আইডিয়াটা কারেক্ট।

—থিওরিটা কী?

—কথায় কাজ কী বৎস্য, চোখ যখন রয়েছে!

—চলুন, যাওয়া যাক।

—আজ রাতেই?

—নিশ্চয়।

—তাঁবুর মধ্যে দুটো হ্যাজাক আছে। জ্বালিয়ে আনো।

মিনিট পনেরো পরেই পৌঁছে গেলাম পিরামিডের পাশে। চক্ষু ছানাবড়া হয়ে গেল স্মৃতিসৌধের বিশালতা দেখে। পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পিরামিডের স্থাপত্য দেখছিলাম, আর অবাক হচ্ছিলাম। রীতিমতো অবিশ্বাস্য দৃশ্য দেখছি তো দেখছিই।

মিশরের পিরামিডের যে স্থাপত্যের মুন্সিয়ানা বিশ্ববাসীর চক্ষুস্থির করেছে—এই পিরামিডেও রয়েছে সেই একই স্থাপত্য-দক্ষতা। তফাত শুধু একটা জায়গায়।

এখানকার সবকিছুই নির্মিত দানবিক মাপকাঠিতে। সে তুলনায় মিশরীয় মাপকাঠি পিগমি-মাপকাঠি বললেও চলে। প্রত্যেকটা পাথরের ব্লক যেন দৈত্য কারিগরের হাতে তৈরি হয়েছে।

টানা লম্বা পিরামিডের মাঝবরাবর গিয়ে আঙুল তুলে দেখালেন প্রফেসর। না দেখালে দেখতেই পেতাম না—নির্ঘাত চোখ এড়িয়ে যেত।

খুব ছোট-ছোট সিঁড়ির ধাপ উঠে গেছে আড়ং পিরামিডের গা বেয়ে।

প্রফেসর বললেন,—এই সিঁড়ি বেয়ে যেতে হবে ঢোকবার সুড়ঙ্গে।

প্রায় একশো ফুট উঠলাম সেই সিঁড়ি বেয়ে। তারপরেই দেখলাম, ধাপগুলো বেশ চওড়া হয়ে গিয়ে শেষ হয়েছে একটা প্রশস্ত চাতালে। চাতালের শেষে মানুষ-সমান উঁচু সুড়ঙ্গের মুখ।

পিরামিডের বুকে ঢুকে যাওয়ার সুড়ঙ্গ। —গভীর গলায় বললেন প্রফেসর।

তাঁর গলায় যেন ম্যাজিক ছিল। আমার ধমনীর রক্তে নাচন লাগল। আবিষ্ট গলায় বলেছিলাম,—মিশরের পিরামিডের মতন।

—উলটো বললে, দীননাথ। মিশরের পিরামিডের সব কিছুই এই পিরামিডের মতন। আদি পিরামিড এইটাই।

—আদি পিরামিড!

—এই পৃথিবীর প্রথম পিরামিড। পিরামিড তৈরির আইডিয়া এখান থেকেই ছড়িয়েছে। যে কিংবদন্তির ভিত্তিতে পিরামিডের পর পিরামিড তৈরি হয়েছে, যে কিংবদন্তি হাজার-হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছে, সেই কিংবদন্তির সূত্রপাত করেছিল তারা—যখন বেঁচেছিল।

—তারা...যখন...বেঁচেছিল! প্রফেসর, মাথায় ঢুকছে না। তারা, মানে, কারা?

—পরে জানবে। আগে চলো সমাধি গর্ভে—কবরঘর বলেই যে ঘরকে সবাই জানে।

একটা হ্যাজাক হাতে নিয়ে সুড়ঙ্গে ঢুকলেন প্রফেসর। পেছনে আমি।

কিছুক্ষণ হাঁটলাম না-নেমে না-উঠে। সুড়ঙ্গ চলেছে জমির সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায়। তারপরেই আচমকা পথ উঠে গেল ওপর দিকে। এখানকার সুড়ঙ্গ বেশ ভ্যাপসা। নাকে ভেসে আসছে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ—সেইসঙ্গে একটা কটু গন্ধ। অনেকদিন পড়ে থাকা, ব্যবহার-না-করা জিনিসপত্র থেকেই এমনি বিশ্রী গন্ধ বেরোয়।

তারপরেই আচমকা সরু সুড়ঙ্গ আর সরু রইল না। দু-পাশের দেওয়ালে আর হাত রাখা গেল না। দেখলাম, ঢুকে পড়েছি একটা ঘরে। চৌকো ঘর। মাথার ওপর তুলে ধরলাম হ্যাজাক লণ্ঠন। ঘরটা খুবজোর চওড়ায় বিশ ফুট, লম্বাতেও বিশ ফুট। শক্ত গোলাপি বালিপাথরের ব্লক দিয়ে মোজেক করা দেওয়াল। এত সুন্দরভাবে ব্লকগুলোকে পাশাপাশি বসানো হয়েছে যে ফাঁকফোকর খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা উঁচু মঞ্চ। মঞ্চে বসানো খোদাই করা চারটে প্রস্তর-শবাধার।

দেখেই ঝিলিক মেরেছিল আমার ব্রেনে। মিশরের পিরামিডে দেখেছি এইরকম প্রস্তর শবাধার। মিশরাধিপতিদের সমাধি। গিজার তিনটে পিরামিড তো আজও পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য। শবাধারে শুয়ে আছে পাঁচ হাজার বছর আগে মৃত নৃপতির মমি।

তাই তনুমন নেচে উঠেছিল আমার। লাফিয়ে উঠে পড়েছিলাম মঞ্চে। হ্যাঁচকা টান মেরেছিলাম একটা শবাধারে। দেখতে চাই...দেখতে চাই... হাজার-হাজার বছর আগে মমিকে কীভাবে শোয়ানো হয়েছিল, তা দেখতে চাই।

কিন্তু কী ভারী ডালা। আমার মতন তাঁদরেল পুরুষও পারল না একচুলও নড়াতে।

ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলাম পেছনে প্রফেসরের দিকে। হ্যারাকের জোরালো আলো মাটিতে নামিয়ে রেখে অদ্ভুত চোখে চেয়ে আছেন আমার দিকে। নিচ থেকে আলো ঠিকরে গিয়ে তাঁর চিবুকে আটকে যাওয়ায় চোখের হেঁয়ালি যেন আরও রহস্যময়।

প্রফেসর! —আমার উচ্চগ্রামের কণ্ঠস্বর চৌকোনা প্রস্তরকক্ষে ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে-ফিরে আছড়ে পড়েছিল আমারই কানে। গুরুগম্ভীর শব্দলহরী সুড়ঙ্গ পথে বেয়ে গিয়ে মিলিয়ে গেছিল দূর হতে দূরে।

খট খটাস শব্দটা কানে ভেসে এসেছিল ঠিক তখনই। আমার পেছনকার প্রস্তর-শবাধার মুখর হয়েছে আচম্বিতে।

সবেগে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

সবিস্ময়ে দেখেছিলাম সেই অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

ভারী পাথরের যে ডালা আমি হেঁইও-হেঁইও করেও একচুল তুলতে পারিনি—সেই ডালা এখন উঠে রয়েছে ঠিক ইঞ্চিখানেক।

চোয়াল ঝুলে পড়েছিল ভয়ানক ভৌতিক এই ব্যাপার দেখে। শবাধারে যে ব্যক্তি শুয়ে আছে, নিঃসন্দেহে তার কীর্তি। আমার চিৎকারেই বোধহয় ঘুম ভেঙেছে। বিরক্ত হয়ে ডালা ঠেলেছে ভেতর থেকে।

এক লাফে নেমে এলাম মঞ্চ থেকে। জানি না তখন ঠকঠক করে কেঁপেছিলাম কি না, তবে গলা যে কেঁপে গেছিল, তা স্বকর্ণে শুনেছি। বলেছিলাম,—প্রফেসর, মমি কি জ্যান্ত হয়?

হ্যারাক রেখে এসেছিলাম মঞ্চে। শবাধারটা স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছি। ভেতর থেকে ব্যান্ডেজ জড়ানো আঙুল বের করে পাথরের বাক্সর গা কেউ খামচে ধরছে না তো?

আমার পিঠে একটা হাত রাখলেন প্রফেসর। বললেন,—ঘুমিয়ে আছে বোকা।

ভয় পাওয়ার লেশমাত্র নেই তাঁর কণ্ঠস্বরে,—ঠিক এমনটাই আমি শুনেছিলাম ক্যাবিব ভুতটার কাছে।

—কী শুনেছিলেন?

ভারী প্রস্তর-ডালা ইঞ্চিখানেক উঠেই রয়েছে, আর নেমে যাচ্ছে না। সেই দিকে তাকিয়ে প্রফেসর বললেন,—বেহালায় ছড়ি টেনে দূর থেকে কাচের গেলাস ভেঙে দেওয়া যায়, জানো তো?

—শুনেছি।

—এও সেই স্পন্দন-কম্পনের ম্যাজিক। ঠিকমতো চেঁচালে স্বরের মধ্যে যে স্পন্দন-কম্পাঙ্ক জাগে, তা ওই শবাধারের গুপ্ত স্প্রিংয়ে চাপ দিয়ে ডালা খুলে দেয়। আমি চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়েছি, কিন্তু পারিনি। তখন তোমার কথা ভেবেছিলাম। যা হেঁড়ে গলা তোমার! ...দেখলে তো, এক চিৎকারেই ডালা খুলে গেল।

ঢোক গিললাম আমি প্রফেসরের দিকে চেয়ে। বুড়োর পেটে-পেটে এত বিটলেমি!

পিঠে ঠেলা দিয়ে বললেন, প্রফেসর,—যাও বৎস, যাও। খুলে দেখো, কী আছে শবাধারে।

ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে বললাম,—আপনিও চলুন।

চলো! —বলে যুবকোচিত লম্ফ দিয়ে মঞ্চে উঠে গেলেন প্রফেসর। এখন তাঁর এক হাতে হ্যাজাক। আর-এক হাতে অবলীলাক্রমে ঠেলে তুললেন পাথরের ডালা। যেন শোলা দিয়ে তৈরি।

লণ্ঠন রাখলেন বাক্সর ওপর। কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন,—যা আশা করেছিলাম, ঠিক তাই। ভালি সমাধি।

প্রফেসরের পাশে এবার নিশ্চিন্তে দাঁড়ানো যায়। আমিও তাই করেছিলাম। হেঁট হয়ে চেয়েছিলাম প্রস্তর-শবাধারের অভ্যন্তরে।

হ্যাজাকের নীলচে-সাদা অত্যুজ্জ্বল আলো ঠিক বিপরীত ছায়া-তমিস্রা রচনা করেছে শবাধারের মধ্যে। ওই ছায়া পড়েছে লম্বালম্বিভাবে। তলদেশের বস্তু সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাই চোখ নামিয়ে আনতে হল নিচে।

এখন দেখছি জিনিসগুলো। আকার আয়তন দেখে চিনতেও পারছি।

হাড়। মানুষের হাড়গোড়। গোটা কঙ্কালটাই মানুষের। কিন্তু ঠাহর করলে তবে চেনা যায়। ধাতুর টুকরো খানকয়েক বোধহয় অলঙ্কার। খসে পড়ে যাওয়া কিছু বস্ত্র—একদা যা ছিল পোশাক।

নাক সিঁটিয়ে বলেছিলাম,—এ কী!

প্রফেসর তন্ময় চোখে পাথরের শবাধারের দিকে তাকিয়েছিলেন। হ্যাজাক ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সবদিকে আলো ফেলছিলেন।

কিছু খুঁজছেন? —জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি।

হ্যাঁ, দীননাথ—আনমনে বললেন প্রফেসর : চাবিটা খুঁজছি।

—চাবি!

—তোমার গলাবাজিতে সবকটা বাক্স খুলে যাওয়া উচিত ছিল দীননাথ। কিন্তু খুলল মোটে একটা।

বলতে-বলতে ডানদিকে একদম নিচের কোণে তাকালেন প্রফেসর। হ্যাজাক

ঘুরিয়ে আলো ফোকাস করলেন সেদিকে। হিরের রোশনাই দেখলাম ওঁর দুই চোখে,—দেখেছ?

দেখেছিলাম। ছোট্ট একটা পুঁতি। তিন পাথর যেখানে মিলেছে, সেই সংযোগের জায়গায় কারবনি-ছোলা সাইজের একটা সবুজ পুঁতি। নিশ্চয় কোনও দামি পাথর। কিন্তু সেই মুহূর্তে দাম নিয়ে মাথা ঘামানোর মতন অবস্থায় আমি ছিলাম না।

জ্বলজ্বলে চোখে নিমেষহীন দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রইলেন প্রফেসর। বাঁ-হাতে ধরলেন হ্যাজাক। ডান হাতের তর্জনী বাড়িয়ে দিয়ে রাখলেন সবুজ পুঁতির ওপর।

আঙুল ছোঁয়াতে না ছোঁয়াতেই পর্যায়ক্রমে তিনটে শব্দ শুনলাম : খট-খটাস...খট-খটাস...খট-খটাস।

আওয়াজ হয়েছে চৌকোনা এই ঘরের মধ্যে—মঞ্চের ওপরেই। সুতরাং সবেগে মুণ্ড টেনে আনলাম শবাধারের বাইরে এবং দেখলাম, পাশের তিনটে শবাধারের ডালা আপনা থেকে খুলে গিয়ে ইঞ্চিখানেক উঁচু হয়ে রয়েছে।

হ্যাজাক উঁচু করে ছানাবড়া চোখে এই দৃশ্য যখন দেখছি, প্রফেসর তখন হ্যাজাক দুলিয়ে চলে গেছেন পাশের শবাধারের সামনে। টেনে খুলেছেন ডালা। অগত্যা আমিও দৌড়লাম। দেখলাম, সেই একই দৃশ্য—প্রথম শবাধারে যা দেখেছি।

তৃতীয় আর চতুর্থ শবাধারেও একই ব্যাপার।

নরকঙ্কাল—হাড়গোড় দেখে চিনে নিতে হচ্ছে। আর বস্ত্রের টুকরো জীর্ণ বস্ত্র।

দেখে টেখে মাথা গরম করে ফেললাম—মমি কোথায়?

নেই। —খুশি-খুশি মুখে বললেন প্রফেসর, কিন্তু মমি বানিয়ে রাখা হয়েছিল। মিশরের মানুষ যখন বানিয়েছে, তারও হাজার-হাজার বছর আগে। সেই মমি বানানোর বিদ্যে আর পিরামিড বানানোর কায়দা এখান থেকেই নকল করা হয়েছে মিশরে। কিন্তু এই পিরামিড আর এই মমি যারা বানিয়েছিল, তাদের উদ্দেশ্য ছিল একেবারে আলাদা।

একেবারে আলাদা মানে? —বলেছিলাম রীতিমতো রুষ্ট গলায়।

—তোমার এই এক দোষ, দীননাথ। খাঁ করে রেগে যাও। এই মমি আর পিরামিড যারা বানিয়েছিল, তাদের অভিসন্ধি অবশ্যই ছিল—এই শবাধার আর এই সব হাড়গোড় দেখেই যেন ভবিষ্যতের মানুষ রেগেমেগে চলে যায়। আরও কিছু খোঁজার কথা মাথায় না আনে।

—এই চাপাধরে আপনার হেঁয়ালি আমার ভালো লাগছে না প্রফেসর।

—দীননাথ, মিশরে মমি বানানো হতো কেন?

—আত্মা ফিরে এসে যেন দেহ ফিরে পায়।

—গুড, গুড, ভেরি গুড। মড়ার মধ্যে আত্মা ঢুকে ফের জ্যান্ত হতে পারে। ...কিন্তু এখানে ব্যাপারটা অন্যরকম। একেবারে অন্যরকম। মমিই এখানেও সিধে হয়ে দাঁড়াবে, তবে সে দেহ—

বলে, চুপ করে গেলেন প্রফেসর।

সব গুলিয়ে গেল আমার। চোখ পিট-পিট করলাম বার কয়েক।

কৃপা হল প্রফেসরের। বললেন,—আমি শেষ পর্যন্ত দেখেছি। শুধু এই বিটকেল কফিনগুলো খোলার মতন গলার জোর নেই বলে তোমাকে এত কষ্ট দিয়ে এখানে আনিয়েছি। আনিয়েছি যখন, সব বলব, সব দেখাব তোমাকে। তার আগে তোমাকে একটু জ্ঞান দিতে চাই।

বলতে-বলতে মঞ্চের ওপর হ্যাজাক রেখে তার পাশেই বসে পড়লেন প্রফেসর।

আমিও বললাম নিতান্ত নাচার মুখভঙ্গি করে। বললাম,—বেশি জ্ঞান দেবেন না, বেশি সময় নেবেন না।

—দীননাথ, তুমি ইজিপ্টলজিস্ট নও, কিন্তু বহু মিশর তত্ত্ববিদের সঙ্গে তোমার মহরম-মহরম ঘটেছে আমার সুবাদে।

পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। —মুখ গোঁজ করে বললাম আমি।

—মমিকে বাঁচিয়ে তোলার এই যে কিংবদন্তি, এর পেছনে কী অভিলাষ ফুলত কাজ করেছে, তা কি তোমরা কেউ ভেবেছ?

—অভিলাষ! জ্বালালেন দেখছি। বললাম তো, মমি যাতে বেঁচে ওঠে।

—মিশরীয়রা শুধু এইটুকুই চেয়েছিল। আসল কিংবদন্তির ল্যাজ ধরে তারা শুধু এইটুকুই করতে চেয়েছিল। দীননাথ, আসল কিংবদন্তিটা যে অভিলাষ থেকে তৈরি হয়েছে, তা এমনই সৃষ্টিছাড়া যে শুনলে তোমার চোখ টাকা হয়ে যাবে।

টিটকিরির 'মুডে' চলে যাচ্ছেন প্রফেসর। সুতরাং মুখে চাবি দিয়ে রইলাম।

—সৃষ্টির পর সেই আদি সভ্যতাগুলোর কথা ভাব, দীননাথ। অনেক লোককথা, উপকথা, কিংবদন্তি মুখে-মুখে ছড়িয়েছে। এই সব প্রাচীন কাহিনিতে মহাপ্লাবনের কথা লেখা আছে। তখন সাতদিন পৃথিবী অন্ধকারে ডুবে ছিল। মহাভারতের মাৎস্য উপাখ্যানে খুঁটিয়ে লেখা হয়েছে সেই মহাপ্রলয়ের বর্ণনা। ধরে নাও, হাজার-হাজার বছর আগে, পৃথিবীর মানুষ যখন অর্ধসভ্য, তখন—

বলে একটু থামলেন প্রফেসর। দম নিলেন।

আমি চেয়ে রইলাম।

উনি বললেন,—তখন পৃথিবীর বাইরে থেকে সুসভ্য প্রাণী এসেছিল ধরাতলে।

—যাক, আপনিও তাহলে কল্পবিজ্ঞানের চর্চা করছেন! যেন শুনতেই পেলেন না প্রফেসর,—আমি বিজ্ঞানের চর্চা করি, গাঁজা বিজ্ঞানের নয়। আমি যা বলছি, সেটা অনুমিতি—মনগড়া দমবাজি নয়।

বড় কড়া-কড়া কথা বলছেন বৃদ্ধ। আমি জবাব দিলাম না। বললেন প্রফেসর,—বোধান থিওরির নাম শুনেছ?

—না।

—নেপচুন আর প্লুটোর কক্ষপথের বাইরেও পাগলামি। প্রায় পৃথিবীর সমান

আপেক্ষিক গুরুত্বের একটা গ্রহ ধূমকেতুর মতন বহু বছর পরে-পরে চলে যাচ্ছে সৌরজগতের মধ্যে দিয়ে।

—ও।

—ধরে নাও, ওই গ্রহের অতি-ধীমান প্রাণীরা একটা অভিযান চালিয়েছিল পৃথিবীর বুকে। হয়তো সে গ্রহে খাবারদাবার অথবা জলবস্তির অভাব ঘটেছিল। প্রাকৃতিক সম্পদ ফুরিয়ে এলে টনক তো নড়বেই। সুতরাং পৃথিবীতে উপনিবেশ পত্তনের ইচ্ছে হয়েছিল সেই গ্রহবাসীদের।

—এ সব কল্পবিজ্ঞানে লেখা হয়ে গেছে অনেক আগে।

—প্রমাণহীন ধারণাই মারা হয়েছে! মূর্খ! চুপ করে শোনো।

—শুনছি।

—অভিযান পাঠানোর পর তারা জেনেছিল, পৃথিবীর আবহমণ্ডল তাদের প্রাণধারণের উপযোগী নয়। ঝুঁকি নিয়েছিল, কিন্তু হেরে গেল। বাতাসে সেই-সেই বিশেষ গ্যাস যা তাদের প্রাণ টিকিয়ে রাখতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন, সেগুলোই নেই জানোই তো, দিকে-বর্ণালী বিশ্লেষণে সব তথ্য জানা যায় না। অন্য গ্রহের প্রকৃত আঁধারেই থেকে যায়। দীননাথ, তর্কের খাতিরে ধরে নাও, ঠিক এই পরিস্থিতিতে তোমাকে পড়তে হয়েছে। সেই অভিযানে ছিলে তুমি—শ্রী দীননাথ নাথ। —কী করতে তুমি?

প্রফেসরের কথা শুনতে-শুনতে আমার কান ভোঁ-ভোঁ করছিল বলে ঘরের দেওয়ালের দিকে চেয়েছিলাম। মায়া ভাষায় কী যেন সব লেখা রয়েছে দেওয়ালে। প্রফেসরের লম্বা বক্তৃতার শেষ প্রশ্নটা আমার নজর চঞ্চল করে তুলল।

—কী বললেন? ও হাঁ— এ অভিযানে থাকলে কী করতাম? কী আবার করতাম, করবার তো কিছু নেই। পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হতাম।

—সেটা সকলেই তো জানে। ননসেন্স! বাঁচবার চেষ্টা কি করতে না?

—একশোবার।

—খুবই ইনটেলিজেন্ট আর বিজ্ঞানের যথেষ্ট উন্নতি করেছিল বলেই তো ভিনগ্রহের প্রাণীরা মহাকাশ পাড়ি দিয়ে এসেছিল এতদূরে। নিশ্চিত মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখার মন্ত্রগুপ্তি কি তাদের অজানা ছিল?

—মৃত্যুকে ঠেকিয়ে রাখবার মন্ত্রগুপ্তি!

—হিবর্নেশন।

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ। আমাদের এই আনাড়ি বিজ্ঞানও ভাবছে না টেনে লম্বা ঘুম পাড়িয়ে প্রাণকে টিকিয়ে রাখা যায় কীভাবে। দূরের অজানা গ্রহের সুপার-সায়েন্টিস্টরা কি সে বিদ্যেতে যথেষ্ট এগিয়ে না থেকে আভভেঞ্চারে বেরিয়েছিল? ...হুঁহু দীননাথ, তোমার মতো গভারের গোঁ নিশ্চয় তাদের ছিল না।

ঢোক গিললাম।

প্রফেসর বললেন,—ধরো, এক ধরনের ঘুমপাড়ানি ওষুধ বা জ্ঞান লোপ করার ওষুধ তাদের কাছে ছিল। মৃত্যু আসন্ন জেনে সেই ওষুধ তারা নিজেদের শরীরে প্রয়োগ করতে বাধ্য হয়েছিল। ...দীননাথ, পরিণামটা কী হবে?

—ঘুমোবে।

—এই তো বুদ্ধি খুলেছে, মুখে বোল ফুটছে। তারা ঘুমোবে—সুদিন ফিরে না আসা পর্যন্ত লম্বা ঘুম দেবে।

—সুদিন মানে?

—এই বৈরী পৃথিবী থেকে চম্পট দেওয়ার সুযোগ একদিন তারা পাবেই—সেই সুযোগটা আসবে কবে, সে হিসেবও নিশ্চয় তারা করেছিল।

—ও...ও...ও!

—ততদিন ঘুমিয়ে থাকাই মনস্থ করেছিল। কিন্তু ঘুমোবে কোথায়? ফাঁকা মাঠে অথবা গাছতলায় নিশ্চয় নয়। শরীরটা যাতে টিকে থাকে সুযোগ আসার দিন পর্যন্ত, সে ব্যবস্থাও করে নিতে হয়েছে ঘুমোনোর আগে। —দীননাথ, কী বলছি মাথায় ঢুকছে?

—একটু-একটু।

—বিশাল ইমারত তৈরি করা দরকার। এমন সৌধনির্মাণ করা প্রয়োজন, যা পুঁচকে মানুষদের দূরতম কল্পনারও বাইরে। ভিনগ্রহীদের সুপার-সায়েন্সে এমন পেল্লায় ইমারত নির্মাণ করা ছিল নেহাতই ছেলেখেলা।

—পিরামিড! পিরামিড!

—ইয়েস মাই বয়, পিরামিড। এমন জিনিস তাদের স্থপতিরা নির্মাণ করেছিল যা আকাশ থেকেই স্পষ্ট দেখা যায়। পাহাড়ের মধ্যে থাকলেও সেটা যে পাহাড় নয়, তা বোঝা যায়। কারণ পিরামিডে আছে সরল রেখার স্থপতিকৌশল। মহাকাশ থেকে এক নজরেই ভিনগ্রহীদের উদ্ধারকারী অভিযাত্রীদল চিনে ফেলবে—এই তো এখানে রয়েছে ইনটেলিজেন্ট প্রাণীদের তৈরি অতিকায় ইমারত—যা নেই পৃথিবীর কোথাও। অতএব নামো এখানে। জাতভাইদের পেয়ে যাবে ওই ইমারতের মধ্যেই। —আমি কি ভুল বকছি, দীননাথ?

—কখনও বকেছেন?

গাল চুলকে প্রফেসর বললেন,—কখনও-কখনও বকি বটে, যখন তোমার ওপর রেগে যাই। যখন তুমি আমার কথা ধরতে না পারো। এখন পারছ, তাই ভুল বকছি না। —কী বলছিলাম?

—ভিনগ্রহীরা আকাশ থেকে পেল্লায় পিরামিড দেখে নেমে আসবে। তারা জানে, হঠকারী ভিনগ্রহীরা নাক ডেকে এখনও ঘুমোচ্ছে এই পিরামিডের মধ্যেই। —প্রমাণ? চলো দেখাচ্ছি।

মঞ্চ থেকে নামলেন প্রফেসর। হেঁটে গেলেন একটা দেওয়ালের সামনে। দ্রুত হিসেব করলেন। প্রকাণ্ড একটা পাথরের তলে কাঁধ লাগিয়ে একটু ঠেলা দিলেন। অতবড় পাথরের চাঁইটা ঘুরে গেল নিঃশব্দে। প্রফেসর বললেন,—সুপার-সায়েন্সের

ভেদেনি। যে কৌশল আজও আমাদের শিশু বিজ্ঞান রপ্ত করতে পারেনি। —দীননাথ, পাথর কোথায়?

নেই। অতবড় পাথরের ব্লকটা বুঝি ভোজবাজির মতন মিলিয়ে গেছে। দেওয়ালের গায়ের পথ ব্যাদিত মুখে নিঃসীম তমিস্রার মধ্যে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। যে সুড়ঙ্গপথে এই ঘরে এসেছি, তার চাইতে অনেক সঙ্কীর্ণ নতুন এই বিবর।

প্রফেসর পা বাড়ালেন সেই সুড়ঙ্গে। পেছনে আমি। আমার দু-হাতে দুটো হ্যাভারাক।

সুড়ঙ্গ নিচের দিকে নামছে তো নামছেই। শেষ নেই, শেষ নেই। আমার তো মনে হল ভূপৃষ্ঠ থেকেও নেমে এসেছি—পাতালগর্ভে পৌঁছে গেছি।

আচমকা প্রশস্ত হয়ে গেল সরু সুড়ঙ্গ। পৌঁছলাম একটা ঘরে। কবরঘরের চেয়ে একটু বড়, তবে চার দেওয়ালে নেই কোনও অলঙ্করণ—যা দেখে এসেছি সমাধিকক্ষের চার দেওয়ালে। এ ঘরের দেওয়াল একেবারে ন্যাড়া—তেলতেলে পরিষ্কার। ছেনি-হাতুড়ির ছোঁয়া পড়েনি কোথাও।

ঘরের মাঝখানে রয়েছে চারটে পেটিকা। হ্যাভারাকের আলোয়। মনে হচ্ছে কোনও পেটিকাই পাথর দিয়ে তৈরি নয়—ধাতু নির্মিত। কিন্তু সে যে কী ধাতু, আমার স্বল্পজ্ঞান দিয়ে তা ধরতে পারলাম না।

প্রফেসরের কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল চতুষ্কোণ এই ভূগর্ভ কক্ষে,—ওপরে দেখেছিলাম চারটে শবাধার, এখানেও দেখো চারটে পেটিকা। অপূর্ব ধোঁকাবাজি দীননাথ। ভবিষ্যতের কৌতূহলী মানুষ যেন ওপরের চার শবাধার দেখেই প্রতারিত হয়—আর খোঁজ না নিয়ে কেটে পড়ে। কী দূরদৃষ্টি, কী অসাধারণ পরিকল্পনা। হাজার-হাজার বছর পরেও বুরবক মানুষ বুরবকই রয়ে গেল—প্রতারণার আভাসটুকুও পেল না।

আপনি তো পেয়েছেন। —কীরকম যেন হয়ে গেছিলাম আমি। প্রফেসরের চোখমুখ দিয়ে যেন দ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছিল। বিহ্বল কণ্ঠে তাই বলেছিলাম, আপনি তো মানুষ।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও মানুষ। হাজার-হাজার বছর ধরে ধোঁকাবাজির আভাস যে মানুষ পায়নি—আমি তাদেরই বংশধর। বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ ভিনগ্রহীরা এই পৃথিবীতে পা দিয়েই বোধহয় টের পেয়েছিল, জানোয়ারদের চেয়ে একটু বেশি বুদ্ধি ধরে দু-পেয়ে মানুষ। বড় বেশি কৌতূহলী।

—ওপরের শবাধারের কঙ্কালগুলো কাদের?

—মানুষের।

—মানুষের?

—তাছাড়া কী? মানুষের কঙ্কাল দেখলেই তো মানুষ খুশি হয়ে চলে যাবে—আর খুঁজতে যাবে না। ভাববে, সমাধি পেয়েছি, পিরামিডও দেখেছি।

—মানুষ মেরে শবাধারে ঢুকিয়েছে?

—নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তা করতে হয়েছে দীননাথ।

—মারল কারা?

—ভিনগ্রহীদেরই একটা দল। তারাই বিশেষ চারজনকে লম্বা ঘুমের দাওয়াই দিল, পিরামিড বানিয়ে ভূগর্ভে তাদের নিরাপদে রেখে দিল, চার কম্জাত মানুষকে মেরে মমি বানিয়ে ওপরের ঘরের শবাধারে রেখে দিল, তারপর নিজেরা গেল পরলোকে—স্বইচ্ছায়।

—ফ্যানটাসটিক।

—ইয়েস মাই বয়, মিশরের মানুষ এই দেখেই শিখল মমি বানিয়ে, পিরামিড তৈরি করে, সমাধিসৌধ রচনার বিদ্যে। তৈরি হয়ে গেল ভুল কিংবদন্তি—আত্মা ফিরে আসবে মড়ার মধ্যে। আসল কিংবদন্তি গেল হারিয়ে।

—ভিনগ্রহীদের স্বদেহে জাগ্রত হওয়ার কিংবদন্তি?

—ইয়েস, ইয়েস, ইয়েস। ক্যাবির ভূতটার কাছে আগড়ম-বাগড়ম গল্প শুনে এই সন্দেহটাই মাথাচাড়া দিয়েছিল আমার। মিশরীয়দের মধ্যে যা ধর্মীয় প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে—আসলে তা—

—উদ্দেশ্যসিদ্ধির কলাকৌশল?

—ইয়েস, মাই বয়।

নির্নিমেষে চেয়ে রইলাম পেটিকা চারটের দিকে।

প্রতিটার ওপর চেপে রয়েছে অদ্ভুত ডালা। দেখে তো মনে হচ্ছে কাচের ডালা। খুবই স্বচ্ছ, রীতিমতো পুরু। অথচ তা মোটেই কাচ নয়। প্লাস্টিক জাতীয় বস্তুও নয়।

প্রতিটি পেটিকার নিচে পাতা নরম কুশন জাতীয় গদি। প্রতিটি গদিতে শুয়ে একজন করে মানুষ।

আরও প্রাঞ্জল করে বলা যাক।

তাদের দুজন দুটি ছেলে, বাকি দুজন দুটি মেয়ে। বয়স তাদের আমার মতনই। গায়ে খাটো জামাকাপড়। যে বস্ত্র তন্তুজাতীয় কিছু দিয়ে তৈরি নয়—গাছের বাকলের মতন দেখতে। খসখসে, পুরু। অথচ তা উদ্ভিদ জগতের দান নয়। এমন কোনও ধাতু দিয়ে তৈরি যে ধাতু আমি অন্তত কখনও দেখিনি। এই পৃথিবীর কোনও ধাতুবিজ্ঞানীরও জানা আছে বলে তো আমার মনে হল না। প্রফেসরের মুখেও পরে শুনেছিলাম, আমার অনুমানে ভুল নেই। এ ধাতু অপার্থিব ধাতু—পৃথিবীর কেউ কখনও দেখেনি।

ফিকে সবুজ সেই ধাতুর দিকে প্রথমে চেয়ে থাকলেও পরমুহূর্তেই আমার নজর ছিনিয়ে নিয়েছিল তাদের মুখের চেহারা। কফিন-আবদ্ধ হয়েও তারা কেউ মৃত মড়া নয়। মড়ার চোখে-মুখে সারাদেহে যে প্রাণহীনতা আবির্ভূত হয়, এদের শরীরের কোথাও তা নেই। ঠান্ডা মৃত্যুর করাল ছায়া নেই শায়িত মানুষগুলোকে। গ্রিক ভাস্কর অসীম ধৈর্য নিয়ে বাটালি দিয়ে পাথর খুদে যে সব মূর্তি বানিয়েছেন, এদের চারজনের দেহাবয়ব সেইসব প্রস্তর মূর্তির মতন অতীব সুন্দর।

ঘুমোচ্ছে। বড় শান্তিতে ঘুমোচ্ছে চারজনেই। কুত্তা ধারেকাছে ঘেঁষতে সাহস পাচ্ছে না। বন্ধ কফিনে এ কেমন নিদ্রা? মানুষ ঘুমিয়ে থেকেও অক্সিজেন নেয় নিশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। চারদিকের বন্ধ আধারে বাতাস তো নেই। থাকলেও হাজার-হাজার বছরে তা টিঁকে রয়েছে কী করে?

স্তম্ভিত হয়েছিলাম তাদের গাত্রবর্ণ দেখে। যেহেতু তাদের গায়ের জামাকাপড় খুব হালকা সবুজ রঙের, তাই প্রথমে ধরে নিয়েছিলাম ওদের গায়ের চামড়ায় যে হালকা সবুজাভা দেখছি, ওটাও নিশ্চয় ক্রমাগত সবুজ ধাতু দেখার ফলে আমার চক্ষুভ্রম।

কিন্তু তা দৃষ্টিবিভ্রম নয়, নয়, নয়!

তাদের প্রত্যেকের মুখ থেকে, গা থেকে ঝরে পড়ছে আশ্চর্য সবুজ আভা। পৃথিবীর মানুষের চামড়ায় যেমন ঈষৎ গোলাপি আভা দেখা যায়, খুব ফর্সা হলে তা অল্প লালচে অথবা দুধে-আলতা বর্ণ ধারণ করে—এদের চারজনের ক্ষেত্রে তা খুবই হালকা সবুজ বর্ণ।

সবুজ মানুষ!

মৃত্যুর হিমশীতল আভা নয়—প্রাণের সবুজাভা!

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল আমার। প্রফেসরও তা লক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন,—হাতের আঙুলগুলো দেখেছ?

তখনও পর্যন্ত ভালো করে চোখে দেখিনি। শুধু চোখ বুলিয়ে গেছিলাম। প্রফেসরের কথায় ভালো করে তাকালাম।

আর চোখ ফেরাতে পারলাম না। প্রত্যেকের হাতে রয়েছে ছটা করে আঙুল।

বাতাসের সুরে কানের কাছে বলে গেলেন প্রফেসর,—এই পৃথিবীর মানুষ নয় ওরা, এসেছে পৃথিবীর বাইরে থেকে—প্রত্যয় হল কি এবার?

আর প্রত্যয়! কথা বলার শক্তি পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম।

জবাব দিতে পারলাম না। ফ্যালফ্যাল করে শুধু চেয়ে রইলাম।

আচমকা বিদ্যুৎ খেলে গেল আমার মগজের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্তে।

বিজ্ঞানের কিছু বুঝি না বুঝি, কমনসেন্স তো আছে আমার। আশ্চর্য এই রহস্যের সমাধান ঘটিয়ে দিতে পারি এখুনি। হ্যাভারস্যাক নামিয়ে রেখে শক্ত দুই মুঠোয় চেপে ধরলাম একটা কফিনের স্বচ্ছ ডালা। মতলব ছিল, ডালা টেনে খুলে দেওয়ার। কিন্তু পারলাম না শুধু প্রফেসরের জন্যে।

এই বৃদ্ধের শরীরে যে বাঘের শক্তি লুকিয়ে আছে, তা তো জানতাম না।

আমার মতলব উনি আঁচ করেই নামিয়ে রেখেছিলেন নিজের হাতের হ্যাভারস্যাক। আমি যখন লম্ফ দিয়েছি একটা কফিন লক্ষ্য করে, উনিও তখন ছুটে এসেছেন পেছন-পেছন। দুই মুঠোয় কফিন চেপে ধরেও তাই ডালাটি টেনে খুলতে পারিনি।

শার্দুল শক্তিতে হ্যাঁচকা টান মেরেছিলেন প্রফেসর পেছন থেকে আমার কোমর জড়িয়ে। এত জোরে যে আমি পেছনে ছিটকে গিয়ে পড়েছিলাম প্রফেসরের ওপর।

বেচারা প্রফেসর! আমার ভার সইবার ক্ষমতা তাঁর কোথায়?

তিনি পড়লেন চিতপটাং অবস্থায়, আমি পড়লাম তাঁর ওপর।

চিল-চিৎকার ছাড়লেন প্রফেসর,—উহু! উহ! লাগছে!

তড়াক করে লাফিয়ে উঠে টেনে তুললাম প্রফেসরকে। চিঁড়েচ্যাপ্টা হয়েও কাহিল হননি তিনি। খাড়া হয়েই ফের জাপটে ধরলেন আমাকে। ছোট্ট ঘর গমগম করতে লাগল তাঁর বাজখাঁই চিৎকারে,—মূর্খ! মূর্খ! গেঁইয়া গোঁয়ার কোথাকার। অতল সমুদ্রের মতো যাদের জ্ঞানভাণ্ডার—তাদের শক্তি কতখানি তা মাথায় এল না? কী বিপুল শক্তির অধিকারী হলে তারা মহাকাশের বুকে পাড়ি দিয়ে, এক গ্রহ থেকে আর-এক গ্রহে এসে, কল্পনাতীত এই ইমারত বানিয়ে হাজার-হাজার বছর ধরে তাদের শরীর প্রাণময় রাখতে পারে! সেটা না ভেবেই তাদের জাগাতে যাচ্ছ? জাগবার পর তারা কী ধরনের শক্তির খেলা দেখাবে, তা তুমি জানো? অথবা এই বিষাক্ত হাওয়ায় যদি ওদের মৃত্যু হয়—ওদের জাতভাইরা যখন ফিরে আসবে পৃথিবীতে—এসে দেখবে খাঁ-খাঁ করছে পৃথিবীর প্রথম পিরামিড—তখন কি তাণ্ডব কাণ্ড শুরু করবে, তা কি কল্পবিজ্ঞানের কল্পনাশক্তি দিয়েও আঁচ করতে পারছ না? পৃথিবীর শেষ কি সেদিন ঘনিয়ে আসবে না?

ছাড়ুন! —আস্তে আস্তে বলেছিলাম আমি।

—খাপানো করবে না তো?

—না।

প্রফেসর ছেড়ে দিলেন আমাকে।

ঘুরে দাঁড়ালাম তাঁর সামনে। জিগ্যেস করলাম,—কবে আসবে ওরা?

—ওপরের ঘরে 'মায়া' ভাষায় সে তারিখটা লেখা আছে। হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয়েছে, ওই সালের আগে যদি এই পিরামিড ধ্বংস হয়—পৃথিবীও মিলিয়ে যাবে শূন্যে।

—তারিখটা কবে?

—২০৪০ খ্রিস্টাব্দে।

চুপ করে রইলাম।

প্রফেসর বললেন,—নিজের কক্ষপথে পাক দিয়ে সেই গ্রহ বা জ্যোতিষ্ক ফিরে আসবে এই পৃথিবীর পাশে। ওপরের ঘরে সেই অভিশাপই দেওয়া আছে। ২০৪০ সালের আগে যদি এই সমাধি ধ্বংস হয়, পৃথিবীও ধ্বংস হবে। এই অভিশাপের ভয়েই এ তল্লাট খাঁ-খাঁ করে। এই পিরামিডের ধারেকাছেও আদিবাসীরা আসে না।—দীননাথ, এখনও কি কফিন ভাঙতে চাও?

—না, বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

যেদিন ২৩ ঘণ্টায় একদিন হয়েছিল

খবরটা চোখে পড়েছিল এই রকমই একটা অলস সন্ধ্যায়। ছোট্ট একটা চিঠি। এত ছোট যে তা চোখে না পড়ারই কথা।

একটি ক্যামেরার অদ্ভুত কাণ্ড নিয়ে চিঠিটি লিখেছেন একজন বাঙালি ক্যামেরাম্যান। দুমাসের মধ্যে নাকি ক্যামেরাটার ওজন কমে গিয়েছে গ্রামেরও বেশি।

বায়না ধরেছিল একমাত্র ভাগ্নে। তাই তাকে একটা স্প্রিং-ব্যালেন্স উপহার দিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ছেলেমানুষের খেয়ালের সীমা নেই। তাই রাজ্যের জিনিস ওজন করতে শুরু করেছিল সে। খেলার ছলে মামার মুভি-ক্যামেরাটিকেও একদিন ওজন করে ফেলালে ছেলেটি। ওজন দাঁড়াল এক কিলোগ্রাম।

ঠিক তার পরের দিনই জরুরি কাজে কলকাতার বাইরে যেতে হল ভদ্রলোককে। মাসখানেক পরেই ফিরে এলেন কলকাতায়।

ইতিমধ্যে বাতিকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে ভাগ্নের ওজন করার খেলা। টেবিলের ওপর মামার মুভি ক্যামেরা দেখেই ভারিক্কি চালে আর-একবার তা ওজন করে নিলে সে।

আর তখনই খটকা লাগল ভদ্রলোকের মনে। কেননা, এবার আর-এক কিলোগ্রাম ওজন নেই ক্যামেরাটার। কী এক অলৌকিক উপায়ে কমে গেছে পুরো তিনটি গ্রাম।

মহা ভাবনার ব্যাপার। ভেতরকার টুকরো অংশ খুলে পড়ে যায়নি তো? সঙ্গে-সঙ্গে নামকরা দোকান থেকে তিনি পরীক্ষা করালেন ক্যামেরাটা।

কিন্তু আশ্চর্য! টুকরো অংশ হারিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এতটুকু আঁচড়ও লাগেনি ক্যামেরাটার কোনও অংশে। প্রথমবার ওজন করার সময়ে বাড়তি কোনও স্পুল ছিল না ভেতরে। দ্বিতীয়বারেও নয়। অথচ কী এক রহস্যময় কারণে এক কিলোগ্রাম থেকে ক্যামেরাটার ওজন দাঁড়িয়েছে ৯৯৭ গ্রামে।

এ ঘটনা ঘটে জানুয়ারি মাসে। দিন কুড়ি বাদে স্প্রিং-ব্যালেন্স হাতে নিয়ে বাড়িময় ঘুর-ঘুর করছিল ভাগ্নেটি। প্রতিটি জিনিসই অন্ততপক্ষে দশ-বিশবার ওজন হয়ে গেছে। তাই শ্যেনদৃষ্টি মেলে ঘুরছিল সে নতুন কিছুর সন্ধানে। এমন সময়ে চোখে পড়ল সেই ক্যামেরাটি। টেবিলের ওপরেই পড়েছিল তা।

তৎপর হয়ে উঠল সে। সবে ওজন করা শেষ হয়েছে, এমন সময়ে বাথরুম থেকে ঘরে ঢুকলেন মামা। ভাগ্নের কীর্তি দেখেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল ভৌতিক ক্যামেরার ভুতুড়ে কাণ্ডকারখানা। সঙ্গে-সঙ্গে ব্যালেন্সটা নিয়ে ওজন দেখতে গিয়েই চক্ষুস্থির হয়ে গেল তাঁর।

ক্যামেরাটার ওজন আর ৯৯৭ গ্রামও নেই। কমে গেছে আরও তিন গ্রাম।

ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন ভদ্রলোক। ধাতস্থ হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে। এবং তার পরেই 'সম্পাদক সমীপেষু' বলে লিখে ফেলেন সমস্ত ব্যাপারটা।

চিঠি পড়া শেষ হতেই অট্টহাস্য করে উঠলাম আমি।

তাকপোশের ওপর পা তুলে দিয়ে শিবনেত্র হয়ে সিগারেট ফুঁকছিল সুন্দর। সুন্দর দাস। পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমার অট্টহাসি শুনে ভুরু কুঁচকে শুধু বললে,—এর চাইতে কোলাব্যাঙের হাসিও অনেক ভালো।

কথাটা গায়ে না মেখে বললাম,—কিন্তু এই চিঠিটা পড়লে তোমার হাসিও সুন্দরতর হতো না।

কী রকম?

চিঠিটা পড়ে শোনালাম ওকে।

সুন্দর কিন্তু হাসল না। বিচিত্র দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে রইল আমার দিকে।

আমার ভুল হতে পারে, তবে ওর ওই অদ্ভুত চাহনির মধ্যে বিস্ময় যত না দেখলাম, তার চাইতে বেশি দেখলাম আতঙ্কের কালো ছায়া।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বিড়-বিড় করে ও শুধু শুধোলে,—ভদ্রলোকের ঠিকানা দেওয়া নেই, তাই না?

না,—ওর হাবভাব দেখে ঘাবড়ে যাই আমি।

কাগজের অফিসে গেলেই পাওয়া যাবে নাকি? —বলেই, আর দ্বিতীয় শব্দটি উচ্চারণ না করে তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল ও। হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একটানে কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল লম্বা-লম্বা পা ফেলে।

হতভম্ব হয়ে বসে রইলাম আমি।

রাত নটার সময়ে ফিরল সুন্দর। উস্কো-খুস্কো চুল। চোখে-মুখে শ্রান্তির ছাপ। পাঞ্জাবিটা খুলতে-খুলতে বলে উঠল,—না হে না, স্প্রিং-ব্যালেন্সে কোনও গোলমাল নেই।

তার মানে? —বাস্তবিকই বুঝতে পারি না ওর এই ভাসাভাসা সিদ্ধান্তের অর্থ কী।

—মানে অতি সরল। ভেবেছিলাম, স্প্রিং-ব্যালেন্সটাই নিশ্চয় বিগড়েছে। কিন্তু এখন দেখছি তা নয়।

—কিন্তু সুন্দর, তুমি এই গাঁজাখুরি ব্যাপার নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছ কেন বলো তো?

ঘুরে দাঁড়াল সুন্দর। আবার সেই অদ্ভুত চাহনি ফেলল আমার ওপর। তারপর গলার স্বর হঠাৎ একদম খাদে নামিয়ে এনে ফিস-ফিস করে বলে উঠল,—দীনেশ, দীনেশ, কস্মিনকালেও বিজ্ঞানে তোমার কোনও আগ্রহ দেখিনি। তাই শুধু জেনে রাখো, আমার আশঙ্কা যদি সত্যি হয়, তাহলে আর বেশিদিন নেই আমাদের আয়ু।

অপরাধী সুরে বলি আমি,—বিজ্ঞান জানি বলে কোনওদিন বড়াই করিনি ঠিকই। তবে জানলেও ক্যামেরার ওজন কমার সঙ্গে আমাদের আয়ু ফুরনোর কী সম্পর্ক আছে তা নিশ্চয়ই বুঝতাম না।

আছে, আছে, আলবৎ সম্পর্ক আছে। বসো তুমি,—বলে আমাকে জোর করে চেয়ারের ওপর বসিয়ে ও বলতে শুরু করল,—নিরক্ষীয় অঞ্চলে যে জিনিসের ওজন এক কিলোগ্রাম, যদি বলি মেরু অঞ্চলে তারই ওজন বেড়ে যায় পাঁচ গ্রাম—তুমি কি তা বিশ্বাস করবে?

—তুমি বললে করব না, বিজ্ঞান বললে করব।

—হ্যাঁ, বিজ্ঞানই তাই বলছে। অবশ্য দাঁড়িপাল্লাটা স্প্রিং-ব্যালেন্স হওয়া চাই এবং মাত্রা-দাগগুলিও নিরক্ষীয় অঞ্চলে দেওয়া চাই। তা না হলে এ প্রভেদ ধরা যায় না।

—কিন্তু একই জিনিসের দু জায়গায় দু-রকম ওজন হওয়ার কারণটা না বুঝিয়ে বললে বিশ্বাস করি কী করে?

—কারণ হচ্ছে, নিজের অক্ষরেখার চারদিকে পৃথিবীর আবর্তন। ফলে, নিরক্ষীয় অঞ্চলের প্রতিটি জিনিসকে বেশি পথ পরিক্রমা করতে হয়। তাছাড়াও পৃথিবীর এই অঞ্চলটিই তো বেশি ফুলে রয়েছে কিনা। তাই নিরক্ষরেখা থেকে যতই মেরু অঞ্চলের দিকে যাওয়া যায়, ততই মাধ্যাকর্ষণ বৃদ্ধি পেতে থাকে একটু-একটু করে। সেই কারণেই স্পিটসবার্জেন থেকে তিন লাখ টন কয়লা এনে নিরক্ষরেখা বরাবর কোনও বন্দরে নামাতে গেলে দেখবে তার ওজন কমে গেছে প্রায় বারোশো টন।

অবিশ্বাসের সুরে বলি,—তাহলে তো আন্তর্জাতিক জোচ্চুরি শুরু হয়ে যেত হে। ব্যবসা-বাণিজ্যও অচল হয়ে পড়ত।

—না তা হয় না। কারণ তো আগেই বলেছি। আগে এবং পরে একই স্প্রিং-ব্যালেন্সে ওজন না করলে আর মাত্রা-দাগগুলি আগের অঞ্চলে না দিলে এ প্রভেদ ধরা সম্ভব নয়। অর্থাৎ স্পিটসবার্জেন থেকে স্প্রিং-ব্যালেন্স এনে নিরক্ষীয় অঞ্চলে কয়লাগুলো ওজন না করলে এ প্রভেদ কারওর পক্ষেই বুঝতে পারা সম্ভব নয়।

—ক্যামেরাটার কিন্তু ওজন হু-হু করে কমে যাচ্ছে কেন, এই তো? পৃথিবীর আবর্তন যদি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলেই তো নিরক্ষীয় অঞ্চলের সব কিছুরই ওজন কমতে থাকবে। কেননা, জোরে ঘুরপাক খাওয়া মানেই নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাধ্যাকর্ষণ কমে আসা। এবং এই ঘুরপাক যদি এখনকার চাইতে ১৭ গুণ বেশি বৃদ্ধি

পায়, তাহলেই নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোনও জিনিসেরই আর ওজন থাকবে না; সব কিছুই নির্ভার হয়ে যাবে।

—কেন হবে?

—হবে ত্বরণ অথবা Centrifugal Acceleration-এর জন্যে। দড়ির আগায় বল বেঁধে বন-বন করে ঘোরালে যে শক্তিটা কেন্দ্র থেকে বাইরে ছিটকে ফেলতে চায় বলটাকে—তাকেই বলে ত্বরণ। মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে পৃথিবী সব জিনিসকে টেনে রেখেছে নিজের বুকে। কিন্তু খুব জোরে ঘুরপাক খেলে ত্বরণ বৃদ্ধি পায় সেই অনুপাতে। আর তা ২৯০ গুণ বৃদ্ধি পেলেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সমান-সমান হয়ে যায়। তখন আর ওজন থাকে না কোনও জিনিসের।

—তারপর?

—তার পরের পরিণতিই তো ভয়ানক। পৃথিবীর আবর্তন আরও একটু বৃদ্ধি পাওয়া মানেই ত্বরণ আরও বৃদ্ধি পাওয়া...

—আর তাহলেই তো মাধ্যাকর্ষণ না থাকার ফলে আমরা ছিটকে যাব বাইরে?

—ঠিক তাই। খুব জোরে ঘুরপাক খাওয়ালে ভিজে বলের গা থেকে যেমন জল ছিটকে যায়, আমাদেরও পরিণতি হবে তাই। ক্যামেরার ওজন কমছে মানে পৃথিবীর আবর্তন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর তাই পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলেও বিশেষ উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে।

গেল আরও কয়েকটা উদ্বেগ-উত্তাল দিন। এর মধ্যে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে তুমুল উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছিল।

দিন কয়েক পরে হন্তদন্ত হয়ে মেসে ফিরল সুন্দর। আমার ঘরে এসেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফিসফিস করে বলে উঠল,—দীনেশ, যা ভয় করেছিলাম, তাই।

ওর ফিসফিসানির মধ্যে যেন মহাপ্রলয়ের দ্রিমি-দ্রিমি ডঙ্কা সংকেত শুনলাম। ভয়ে বুক ঢিপ-ঢিপ করে উঠল আমার।

শুধোলাম,—কে বলল তোমাকে?

—সংক্ষেপে জেনে রাখো, জাপানের একজন বিজ্ঞানী, আমার আশঙ্কাকেই সমর্থন জানিয়েছেন। টোকিও অ্যাসট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি থেকে এই খবর এল, বাস্তবিকই কী এক রহস্যময় কারণে গত জানুয়ারি মাস থেকে বেশ জোরে ঘুরপাক খেতে শুরু করছে পৃথিবী।

—কিন্তু কারণটা কী?

—সঠিক কেউ বলতে পারছে না। জাপানি বিজ্ঞানী যে-ক'টি কারণ দেখিয়েছেন, তা এই: নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুচাপ অন্যান্য বছরের গড় বায়ুচাপের চেয়ে অনেক কমে গেছে। এই এক নম্বর কারণ। দু-নম্বর কারণ, নিরক্ষরেখা বরাবর অঞ্চলে জল কয়েক সেন্টিমিটার বেড়ে গেছে এবং আরও বাড়ছে। [illegible] পশ্চিম থেকে পূবে প্রবাহিত আহ্নিক গতিও নাকি ধীরে-ধীরে মন্থর আসছে। এই তিনটে পরিবর্তনই নাকি একযোগে বাড়িয়ে দিয়েছে পৃথিবী আবর্তনের হার।

কিন্তু এই পরিবর্তনগুলো হল কী কারণে? —শুধোলাম আমি।

—একজন জার্মান বিজ্ঞানী এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলছেন, ক্রমাগত আণবিক বিস্ফোরণের ফলে ঊর্ধ্ব আবহমণ্ডলে সৃষ্টি হয়েছে ইলেকট্রন ভরা রহস্যময় ভ্যান অ্যালেন বেল্ট নিরক্ষরেখা থেকে ৪৫০০ মাইল ওপরে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে রয়েছে প্রায় ১০০ কোটি ইলেকট্রন এবং প্রতিটি বিকিরণ কণার তেজ লক্ষ-লক্ষ ইলেকট্রিক ভোল্টের সমান। তাঁর মতে, প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এই বিকিরণ বেল্টের জন্যেই এই সব প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।

তাহলে এখন উপায়? —বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমস্ত না বুঝলেও বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে আমার।

—উপায় কিছু নেই। তবে শুনলাম, সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা একজোট হয়ে কল্পনাতীত পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গতি বৃদ্ধি রোধ করার পরিকল্পনা করছেন। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের এই অভিযান কতখানি সার্থক হবে, তা তো ভাই বলতে পারব না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর এই প্রলয়ংকর পরমাণু বিস্ফোরণের প্রয়োজন হয়নি। মার্চ মাসের শেষাশেষি কাকপক্ষীকে না জানিয়ে সব আয়োজনই যখন সম্পূর্ণ, দ্রুত আবর্তনের ফলে ২৪ ঘণ্টার দিন যখন কমে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র ২৩ ঘণ্টায়, দিন ছোট হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত কোনও আলোচনাকেও যখন বেমালুম চেপে দেওয়া হচ্ছে—ঠিক এই সময়ে নবতম কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত খবর পাওয়া গেল, কম উঁচুতে উঠে গেছে রহস্যময় ভ্যান অ্যালেন বেল্ট। আবার স্বাভাবিক হয়ে আসছে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বায়ুচাপ, আগের অবস্থায় ফিরে যাচ্ছে জোয়ারের জলের উচ্চতা আর জেট স্ট্রিমের গতি। আর, কমে আসছে পৃথিবীর মারণ ঘূর্ণিপাক, বৃদ্ধি পাচ্ছে নিরক্ষীয় অঞ্চলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, স্বাভাবিক হয়ে আসছে সব কিছুর ওজন।

এ যেন পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকদের দম্ভের ওপর প্রকৃতির নির্মম কশাঘাত! উদ্বেগ-থমথমে আবহাওয়া একটু-একটু করে ফিকে হয়ে আসতে থাকে, আশায়-আনন্দে ভরে ওঠে বিজ্ঞানীদের অন্তর।

অব্যাহত থাকে অবস্থার ক্রমিক উন্নতি। দীর্ঘ দুমাস পরে মে মাসে সারা পৃথিবী স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে মন দিলে বিষয়ান্তরে।

আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করলাম আমি। যখন বুঝলাম যে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত হয়েছি, মহাশূন্যের মাঝে ছিটকে যাওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই এবং জনসাধারণের মধ্যে এ-কাহিনি প্রকাশ করলেও আতঙ্কের কোনও কারণ নেই—তখনই লিখে ফেললাম ভয়ংকর সত্য গল্পটি।

টোকিও অ্যাসট্রোনমিক্যাল অবজারভেটরি থেকে প্রচারিত একটি রিপোর্ট অবলম্বনে লেখা এই কাহিনিটি নিছক কল্পনা-প্রসূত। গত জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে বাস্তবিকই পৃথিবীর আবর্তন গতি বৃদ্ধি পেয়েছিল এক সেকেন্ডের দশ হাজার ভাগের পাঁচ ভাগ।
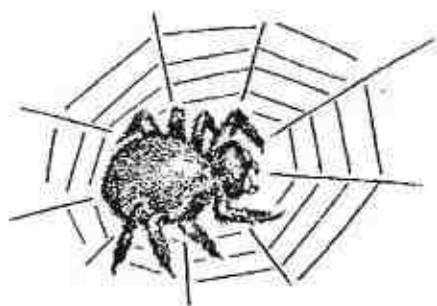
ভয়ংকরদের দ্বীপ

এ জাহাজ থেকে এখন দেখা যাচ্ছে যমজ দ্বীপটাকে।

প্রফেসর নাটবল্টু চক্র চোখ কুঁচকে চেয়েছিলেন পাহাড়দুটোর দিকে। চোখের নিবিড় চাহনি দেখে কে বলবে, সুদূর কলকাতা থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের এই দ্বীপে আসতে গিয়ে তাঁর জিভ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। পথকষ্ট তো কম নয়। তাঁর বয়সটাও বাড়ছে।

কিন্তু কোনও কথাই উনি শোনেননি।

সেই যে জিওকেমিস্ট ভদ্রলোক এল ওঁর কাছে, কানে-কানে এমন মন্ত্র দিল যে, প্রফেসর খেপে গেলেন এখানে আসার জন্যে।

জিওকেমিস্ট ভদ্রলোক রয়েছে প্রফেসরের পাশেই। পাগল-পাগল চেহারা। নাকের ফুটো দুটো বড়। বড়-বড় লোম ঝুলছে ফুটো থেকে। মাথার চুল এত কম আর এত লালচে যে নেই বললেই চলে। কপাল খুব ছোট, নাকটাও থ্যাবড়া। মুখের তলার দিকটা অবিকল এপম্যানদের নকলে বিধাতা গড়ে দিয়েছেন। চোখের নিচে ভাঁজ-ভাঁজ চামড়া আর পাটকিলে চোখের তারা দেখলে এমন লোককে মানুষ বলে মনে হওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে তার গালের আর চিবুকের রোঁয়া-রোঁয়া দাড়ি তো নরবানরদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকী, লোকটার গোঁফও নেই। খানকয়েক লালচে রোঁয়াকে নিশ্চয় গোঁফ বলা চলে না?

লোকটার নাম গোনজালা। কোন দেশের লোক, তা জানি না। হাইট দেখেও আন্দাজ করা যায় না। বেঁটে মরকুটে নয়—আবার তালঢ্যাঙাও নয়। হাতদুটো অবশ্য বড্ড লম্বা। সবসময়ে দস্তানা পরে থাকে। পাজামার মতো ঢিলে প্যান্ট, ঢলঢলে শার্ট আর এহেন চেহারা—দেখলে হাসি পায় না?

গোনজালা ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি বলে চলেছে। আমি তার গোটা-গোটা বাংলা করে দিচ্ছি।

'প্রফেসার, এই সেই দ্বীপ।'

প্রফেসার মুগ্ধ চোখে পাহাড় জঙ্গল আর সমুদ্র দেখতে-দেখতে বললেন, 'গোনজালা, এমন দ্বীপের সন্ধান পেলে কী করে?'

গোনজালা হাসতে গিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে ফেলল। ছ্যাতলা পড়া হলদে দাঁত। জন্মে দাঁত মাজে না।

বললে, 'আমি যে জিওকেমিস্ট। খনিজের সন্ধান করে বেড়াই।'

'প্লাটিনাম মেটালদের দেখেছ এখানেই?

'ইয়েস, প্রফেসর। চাঁইটাও দেখিয়েছি আপনাকে।'

'সেটা দেখেই তো আমার চক্ষু ছানাবড়া হয়েছে, গোনজালা।'

'আপনিই তো বললেন ওর মধ্যে রয়েছে অনেকগুলো মেটাল।'

'হ্যাঁ। অনেকগুলো। সবগুলোই প্লাটিনাম মেটাল। সবগুলোই দুষ্প্রাপ্য। কোনওটাকেই একজায়গায় তাল-তাল আকারে আজও পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায়নি—'

'কিন্তু এখানে তা আছে'—বললে গোনজালা।

'প্লাটিনাম, রেডিয়াম, অসমিয়াম, ইরিডিয়াম, রুথেনিয়াম। আশ্চর্য! আশ্চর্য! আশ্চর্য!'

'কিছুই আশ্চর্য নয়, প্রফেসার। পৃথিবীর দেখা সবটাই হয়ে গেছে এমন কথা যে বলে, সে মানুষই নয়।'

চোখ ফিরিয়ে বললেন প্রফেসর,—'কথাটা এমনভাবে বললে, গোনজালা যেন তুমি একাই মানুষ—আর সবাই অমানুষ।'

লাল টকটকে মোটকা জিভখানা আর্ধেক বের করে গোনজালা বলে উঠল,—'কী যে বলেন। আমি আবার একটা মানুষ! আমি শুধু গোনজালা জিওকেমিস্ট—এই পৃথিবীটা আমার বাড়ি—'

'যাকগে, দ্বীপে তুমি নেমেছিলে বলেছ। কোন পাহাড়টার মধ্যে আছে তাল-তাল প্লাটিনাম ধাতু?'

'বাঁদিকেরটায়। এটাই একেবারে মরে গেছে। ডানদিকেরটায় এখনও একটু আঁচ আছে।'

এই পর্যন্ত শুনেই ফস করে আমি বলেছিলাম,—'আঁচ আছে? পাহাড়ে আবার আঁচ থাকে নাকি? পাহাড় কি উনুন?'

গোনজালা পাটকিলে চোখে পিট-পিট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—'থাকে, থাকে, এরা যে এককালে আগ্নেয়গিরি ছিল। এখনও একটার মধ্যে কাদা ফুটে যাচ্ছে—গেলেই দেখতে পাবে।'

'তার আগে,' বললেন প্রফেসর—'হেলিকপ্টারে করে গোটা দ্বীপটাকে ওপর থেকে দেখে নেওয়া যাক।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলে উঠল গোনজালা—'ওপর থেকে দেখলে কী-ই বা আর বুঝবেন—তবুও দেখা দরকার।'

অত্যাধুনিক এক জাহাজে সব ব্যবস্থাই ছিল। তক্ষুনি আমরা উঠে বসলাম ডেকের ওপর, খাড়া হেলিকপ্টার বিকট আওয়াজ করে উঠল শূন্যে।

তখন গোধূলি। একটু পরেই অন্ধকার আরও গাঢ় হবে। দ্বীপ দুটোকে দূর থেকে যতটা খুদে মনে হয়েছিল, ওপরে গিয়ে ততটা মনে হল না। এক-একটা দ্বীপ লম্বায় পাঁচ মাইল, আর চওড়ায় মাইল তিনেক। দুই দ্বীপের মাঝে একটা সরু নালা—সেখানে সবুজ আগাছার ওপর সাদা কুয়াশার চাদর। জাহাজ নোঙর ফেলেছে পূর্বদিকে। দূরবিন দিয়েও ওদিকে কুয়াশা দেখিনি। দেখলাম পশ্চিম দিকে। আকাশপথ থেকে আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে কুয়াশা ঘন হয়ে লেপটে রয়েছে গাছপালার ওপর। কোথাও কিছু নড়ছে না।

কেন জানি না, গা-টা শির-শির করে উঠেছিল চারদিকের এই নিঝুমতা দেখে। কোথাও পাখি উড়ছে না। গাছপালা নড়ছে না—

হ্যাঁ, নড়ছে...নড়ছে...কুয়াশার ওই চাদর দুলে-দুলে উঠছে...চিকচিক করছে শেষ আলোয়।

পাহাড়দুটোর তলার দিকে রঙ হালকা সবুজ—ওপর দিকে ঘন সবুজ। তারপরেই আবার সেই সাদা কুয়াশা। সাদা চাদরে মোড়া। তারও ওপরে পাহাড়ের চুড়ো।

মাথাকাটা চুড়ো। আগ্নেয়গিরিই বটে। জ্বালামুখ। এককালে এখান থেকে ভলকে-ভলকে আগুন, ধোঁয়া আর লাভা বেরিয়েছে। দ্বীপের প্রাণ কি তখন থেকে মুছে গেছে?

জাহাজে ফিরে এসে এই প্রশ্নই করেছিলাম গোনজালাকে।

আমরা তখন খেতে বসেছিলাম। গোনজালা লোকটা সত্যিই একটা জীব। মাংস-টাংস কিসসু খায় না। শুধু ফল। এরকম নিরামিষাশী মানুষ জন্মে দেখিনি।

গোনজালা বললে,—'ডিনোনাট, (পাঠক-পাঠিকা চমকে যেও না—দীননাথ নামটা গোনজালার গলায় ওই রকম শোনায়), অ্যাটমবোমাটা ফাটানোর পর থেকেই নাকি এ দ্বীপের সবাই মরে গেছে।'

'দুটো দ্বীপেরই?'

'তাই তো শুনেছি,' কলার খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে বললে গোনজালা—'সেই যে বোমটা ফাটল ওই দূরে...আকাশ যেখানে জলে মিশেছে—'

ফুট করে ফুটকুনি কাটলেন প্রফেসর,—'এমনভাবে বলছ গোনজালা যেন বোমা ফাটার সময়ে তুমি দ্বীপে ছিলে—'

চমকে ওঠে গোনজালা,—'আমি? আমি কেন থাকতে যাব? আমি যে জিওকেমিস্ট, হিল্লিদিল্লি ঘুরতে হয়...তখনি তো শুনলাম অ্যাটম বোমা ফাটানো হয়েছিল এই দ্বীপেরই ধারেকাছে। কেননা মানুষ তো ছিল না এখানে।'

পোর্টহোল দিয়ে অন্ধকারে ঢাকা যমজ দ্বীপের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক গলায় বললেন প্রফেসর,—'সেটাও একটা ব্যাপার। দ্বীপের মানুষগুলো সব গেল কোথায়?'

'ম-মানে?'

'প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপ তো—যতই একটেরে হোক না কেন, জংলি মানুষ থাকবেই। এখানে কেন নেই?'

'খাবারের অভাবে বোধহয়' বললে গোনজালা।

'তা হতে পারে' বলে চুপ মেরে গেলেন প্রফেসর।

পরের দিন সকালে হেলিকপ্টারে চেপেই পৌঁছলাম দ্বীপের সৈকতে।

কপ্টার-চালক রিচার্ড কম কথার মানুষ। সাদা বালি ছাওয়া বালুকাবেলায় কপ্টার নামিয়ে এককথায় বলে দিলে,—'আপনারা যান।'

'তুমি?' প্রফেসরের প্রশ্ন।

'এখানেই রইলাম।'

লোকটা এমনিতেই কাঠগোঁয়ার। কাটকেটে কথা শুনলে গা পিত্তি জ্বলে যায়। প্রফেসর আমাদের লিডার, তাঁকেও পরোয়া করে না।

খেপে গেলে বৃদ্ধকে সামলানো মুশকিল। তাই খাঁটি বাংলায় বললাম,— 'ব্যাটা ভয় পেয়েছে।'

'ভয়? কাকে?' প্রফেসর চিড়বিড়িয়ে উঠলেন আমার ওপরেই।

'কাকে তা বলতে পারব না। তবে আমারও গা ছমছম করছে কাল থেকেই।'

'ভীতুর ডিম কোথাকার!' বলেই হনহন করে বালি মাড়িয়ে দ্বীপের ভেতর দিকে রওনা হলেন প্রফেসর।

গোনজালা কপ্টার থেকে নেমেই হেলেদুলে ছুটছিল বড়-বড় পাথরের চাঁইগুলোর দিকে। লোকটার পায়ে সিরিয়াস ডিফেক্ট আছে নিশ্চয়। ওইজন্যে অমন পাৎলুন পরে—পাজামা ছাড়া যাকে আর কিছুই বলা যায় না। পায়ের বুটজুতোজোড়া যে মুচি বানিয়েছে, বলিহারি যাই তার কল্পনার।

বুটের মাথা এত চ্যাপ্টা কখনও হয়? সার্কাসের ক্লাউনেরাও এহেন বদখত বুট পরে না।

গেল কোথায় পাগলা জিওকেমিস্ট?

প্রফেসর হনহন করে কিছুটা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ইতিউতি তাকাচ্ছিলেন গোনাজালাকে দেখবার জন্যে।

পেছনে গিয়ে আমি বললাম,—'ওই তো পাথরগুলোর আড়ালে ঢুকে গেল।'

প্রফেসর কোমরের বেল্ট ধরে প্যান্টটাকে টেনে তুলতে-তুলতে খেঁকিয়ে উঠলেন,—'আপদ! নতুন জায়গায় সঙ্গে-সঙ্গে থাকবে তো।'

বেল্ট পরা প্রফেসরের ধাতে সয় না। ট্রাউজার্স পরেন না বেল্ট পরতে হবে বলে। কোমরবন্ধনী নাকি তাঁর দমবন্ধ করে দেয়। কিন্তু দ্বীপের পাহাড় জঙ্গলে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে অভিযানে যাওয়া যায় না। তাই আমি কলকাতা থেকেই ওঁর জন্য হাঁটু পর্যন্ত উঁচু চামড়ার বুট আর মোটা জিনসের প্যান্ট এনেছি। নিজেও তা পরেছি। পোকামাকড় থাকতে পারে, সাপ, বিছে থাকতে পারে—একটা কামড় খেলে প্রাণটাও সটকান দিতে পারে।

এখন সকাল সাতটা। রোদ বেশ মিঠে। নীল আকাশ বড় ভালো লাগছে, তার চাইতেও ভালো লাগছে নীল সমুদ্রকে। পুরীর বঙ্গোপসাগর আর বম্বের আরবসাগর দেখে যারা দু-হাত তুলে নাচে, তারা কল্পনাও করতে পারবে না প্রশান্ত মহাসাগরের এই রূপকে। চারদিক থেকে ফেনার মুকুট মাথায় নিয়ে ঢেউগুলো একের পর এক আছড়ে পড়ছে দ্বীপদুটোর ওপর। অটল মহিমায় এদের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে সবুজ আর সাদায় অপরূপ দু-দুটো পাহাড়।

রোদ ঠিকরে যাচ্ছে এদের গা থেকে। জঙ্গলকে কেন যে সবুজ সোনা বলা হয় তা এই দ্বীপযুগলের সৈকতে দাঁড়িয়ে মুগ্ধাবেশে অনুভব করলাম। বেলাভূমির বালি কিছুদূর গিয়েই শেষ হয়ে গেছে, তার পর পাথরের চাঁই আর চাঁই। তেড়াবেঁকা, গোলগাল, এবড়োখেবড়ো। ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর চোখ গেল, এই ধরনের পাথর পড়ে আছে সৈকতকে পাহারা দিয়ে।

ঠিক যেন পাঁচিল। প্রকৃতি নিজের হাতে বড়-বড় পাথর ফেলে দ্বীপদুটোকে ঘিরে রেখে দিয়েছে যাতে নোনাজল ভেতরে ঢুকতে না পারে। নোনা জলের আতঙ্করা সবুজ সোনার লোভে দ্বীপের শান্তি নষ্ট করতে না পারে।

আমি চিরকালই একটু উলটো দিক থেকে ভাবি। তাই আমার মনে হল, পাথর ফেলা আছে বলেই দ্বীপের আতঙ্করা বাইরে বেরিয়ে আসতে পারছে না—অন্তহীন রহস্য নিয়ে আটকে রয়েছে দ্বীপের মধ্যে।

আতঙ্ক? রহস্য? যত্তোসব উলটোপালটা চিন্তা। মনে-মনে নিজেকে ধমক দিয়ে তাকালাম গোনজালোর সন্ধানে।

উড়ে গেল নাকি লোকটা?

যে কথাটা গতকাল থেকেই ঘুরঘুর করছিল মাথার মধ্যে এবার তা সুড়ুত করে চলে এল জিভের ডগায়। বলেই ফেললাম প্রফেসরকে,—'গোনজালো বলছিল দ্বীপের কাছেই অ্যাটমবোমা ফাটানো হয়েছিল। কত বছর আগে?'

'বিশ বছর আগে।'

'পারমাণবিক ধুলো আর বিকিরণ তো দ্বীপেও পৌঁছেছে—চারদিক খাঁ-খাঁ করছে ওই জন্যেই। কেউ বেঁচে নেই।'

দীননাথ, উজবুক বলেই প্রশ্নটা এখন করছ। আমি আগেই করেছিলাম। গোনজালা সব খবরই রেখেছে। তিনমাস অন্তর তিনবার বৈজ্ঞানিকরা এ দ্বীপে এসে দেখে গেছেন, পারমাণবিক বিষ রেছুই নিয়ে গেছে দুটো দ্বীপকেই।'

'কেন?'

'বোমা যখন ফাটে, তখন হাওয়া বইছিল অন্যদিকে। ধুলো এদিকে আসেনি। রেডিয়েশন যেটুকু এসেছে, তা ডেঞ্জার লেভেলের অনেক নিচে।'

'ও', বলে ঢোক গিললাম আমি—'মানুষজন কোনও-কালেই কি দ্বীপে ছিল না?'

'না। টেস্ট হয়েছিল সেই কারণেই। লোক থাকলে সরিয়ে দেওয়া হতো। —কিন্তু গোনজালা গেল কোথায়?

—গোনজালা! গোনজালা!...গোনজালা!'

আচমকা এ রকম বিকটভাবে যে উনি চেঁচিয়ে উঠবেন, ভাবতে পারিনি। তেড়াবেঁকা পাথরগুলোর ওপর দিয়ে বিচ্ছিরি চিৎকারটা দাঁত বার করে ছুটে গিয়ে যেন দমাস করে আছড়ে পড়ল সবুজ সোনাদের ওপর। তারপর পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে অদ্ভুত প্রতিধ্বনি জাগিয়ে সেই ডাকই ফিরে এল কানে,—'গোনজালা! গোনজালা! গোনজালা!'

জঙ্গলের মধ্যে গোটা তিন-চার পাখি কেবল উড়ে গেল সেই ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির আছড়িপিছাড়িতে তার বেশি নয়।

খটকা লাগল আমার তখনি। এত গভীর জঙ্গল অথচ এত কম পাখি!

শ্মশান দ্বীপ নাকি? প্রাণের চিহ্ন যাও বা দেখলাম—এত কম?

আচমকা পিলে চমকে গেল আমার রক্ত জল করা একটা শব্দে।

জঙ্গলের অনেক ভেতর থেকে। পাহাড়ের ডানদিক থেকে ভেসে এল অনেকগুলো গলায় অমানুষিক আকাশ ফাটা চিৎকার,—'আঁহ! ...আঁহ! আঁহ!'

সেই চিৎকারের রেশ মিলোতে না মিলোতেই আবার পাহাড়ের বাঁ-দিক থেকে জঙ্গলের মাথায় নাচতে-নাচতে ছুটে এল রক্ত জল করা ভয়াবহ সেই হুহুংকার—'আঁহ-উ!... আঁহ-উ!... আঁহ—উ!'

আর তার পরেই পাহাড়দুটির একদম-ওদিক থেকে 'আঁহ্। —আঁহ—!'

তারপরেই সব চুপচাপ জঙ্গল স্তব্ধ। পাখিরা কেউ নেই। কানে ভেসে আসছে কেবল বিরামবিহীন ঢেউ ভেঙে পড়ার শব্দ।

গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেছিল অমানুষিক শব্দপরম্পরা শুনে। পরিষ্কার দিনের আলোয় নীল আকাশের নিচে একি কাণ্ড। কারা ওভাবে চেঁচাচ্ছে? কেন চেঁচাচ্ছে?

প্রফেসর ঘুরে দাঁড়িয়েছেন আমার দিকে। তাঁর চোখ দুটো শুধু কুঁচকে গেছে দেখলাম। ভয়ডরের লেশমাত্র নেই। খুব কূট একটা চিন্তা নিয়ে ভেবেই চলেছেন তন্ময় হয়ে।

গলা শুকিয়ে গেছিল। ওঁর পেছনেই বেশ কিছু দূরে বড়-বড় বিশাল পাথরগুলোর দিকে চাইতেই নামহীন আতঙ্কে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠল আমার।

দস্তানা পরা একটা হাত আগে দেখা গেল একটা বিশাল পাথরের মাথায়। তার পাশে উঠে এল আর একটা হাত। সাদা দস্তানা। আমি চিনি। গোনজালার।

আর তার ঠিক পরেই একটা মাথা দেখা গেল দুই দস্তানার মাঝ দিয়ে। মাথায় লালচে চুল খুব অল্প।

সট করে উঠে এল পুরো মুণ্ডটা।

গোনজালা তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে।

এবং, দাঁত খিঁচিয়ে রয়েছে। হলুদ দাঁতগুলো এতদূর থেকেও গা ঘিনঘিনিয়ে দিচ্ছে আমার। মুখবিবর ঘিরে লালচে রোঁয়ার মতো গোঁফ-দাড়ি আর নাকের ফুটো থেকে ঝুলে পড়া লালচে চুলগুলোও এত কদর্য লাগছে যে বলবার নয়।

পাটকিলে চোখে পিট-পিট করে চেয়ে রইল গোনজালা।

প্রফেসর তার দিকে পেছন ফিরে থাকায় কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু আমার চোখমুখ দেখে ছিলেন। নিশ্চয় নিঃসীম আতঙ্কে তা বিকৃত, বীভৎস হয়ে গেছিল।

তাই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে অপরিসীম উদ্বেগে প্রশ্ন করেছিলেন,—'কী হয়েছে? কী হয়েছে, দীননাথ?'

আমার গলা তখন শুকিয়ে কাঠ, জবাব দেব কী? হাত তুলে শুধু দেখিয়েছিলাম ওঁর পেছন দিকে—যেখানে তখনও মূর্তিমান আতঙ্ক হয়ে গোনজালা বিকট হাসি হেসে চলেছে। সবেগে পেছনে ফিরেছিলেন প্রফেসর। আর সঙ্গে-সঙ্গে সাঁৎ করে কদাকার মুখটা নেমে গেল। পাথরের আড়ালে. নেমে গেল সাদা দস্তানা দুটোও।

স্থির চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন প্রফেসর। তাঁর পেছনে থাকায় মুখের চেহারাটা দেখতে পেলাম না—তবে শরীরটা যে হঠাৎ শক্ত হয়ে গেছে, তা বুঝলাম।

সমুদ্রের অশান্ত গজরানি ছাড়া আশেপাশে দূরে কোথাও আর কোনও শব্দ নেই। পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে যেন এক অপার্থিব জগতে এসে পড়েছি।

আচমকা উল্লসিত গলায় শুনলাম একটা ডাক,

'ডিনোনাট।'

আমার কানে যেন ডিনামাইট ফাটল ডাকটা শোনার সঙ্গে-সঙ্গে। আঁতকে উঠে সভয়ে প্রফেসরকে হ্যাঁচকা টান মেরে বলেছিলাম—'পালিয়ে আসুন! পালিয়ে আসুন!'

শক্ত হয়ে প্রফেসর দাঁড়িয়েই রইলেন। চেয়ে আছেন সেদিকে, যে জায়গাটায় একটু আগে বিচ্ছিরি মুণ্ড সেখানে দেখেছি, তার একটু পাশেই।

দুটো বড় পাথরের ফাঁকে দাঁড়িয়ে গোনজালা। আত্তাল হাওয়ায় লটপট করছে তার পাৎলুন, নিশানের মতো গা থেকে উড়ে যেতে চাইছে ঢলঢলে শার্ট।

'ডিনোনাট।'

প্রফেসর এমনিতে নরম ধাতের মানুষ। কিন্তু রেগে গেলে যাচ্ছেতাই রকমের কর্কশ হয়ে যান।

এখন যে হয়েছেন, তা তাঁর কাঠচেরা গলাবাজি শুনেই মালুম হয়ে গেল, —'বলি, ব্যাপারটা কী?'

দুলে-দুলে পাথরের ফাঁক ছেড়ে এগিয়ে এল গোনজালা। বললে—'হে! হে! হে! তিনোনাটকে ভয় দেখাচ্ছিলুম।'

'ইয়ার্কি হচ্ছে? এটা ইয়ার্কি মারার জায়গা?'

'একটু-আধটু রগড় না করলে যে আমরা পারি না।'

'আমরা! মানে?'

বিটকেল হলুদ দাঁত বের করে আর-এক দফা হেসে নিল গোনজালা,—'আপনাকে মস্ত খবরটা দিইনি চমকে দেব বলে।'

'কী খবর?' গোনজালা তখন আরও এগিয়ে এসেছে। একটা উগ্র গন্ধ ভেসে আসছে নাকে।

'বললে কি বিশ্বাস করবেন?' দুলে-দুলে আরও সামনে এসে দাঁড়াল গোনজালা। এতক্ষণে লক্ষ করলাম সারা মুখে তেল মেখেছে। মুখ চকচক করছে সকালের রোদে—উগ্র গন্ধটাও আরও ঝাপটা মারছে আমার নাসিকারন্ধ্রে।

'করব,' চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছেন প্রফেসর।

'কারা এখুনি চেঁচাল বলুন তো?'

'সে প্রশ্নটা আমিই করতে যাচ্ছিলাম।'

'প্রফেসর, আপনি জানতে চাইছিলেন, এ দ্বীপে মানুষ-টানুষ নেই কেন—মনে আছে?'

'আছে।'

'মানুষের মতোই একরকম প্রাণী এ দ্বীপটা দখল করে আছে বলে।'

'মানুষের মতো প্রাণী?'

'ডি-এন-এ মিলিয়ে দেখা গেছে, এরাই মানুষের সব চাইতে কাছের না-মানুষ আত্মীয়।'

'শিম্পাঞ্জীদের কথা বলা হচ্ছে?'

'ইয়েস স্যার। অনেক...অনেক বছর আগে আফ্রিকার তানজানিয়া থেকে একদল শিম্পাঞ্জী এনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এই জঙ্গলে। তারাই এখন এ দ্বীপের অধীশ্বর। মানুষকে তারা অনেক-অনেক বছর আগেই খেদিয়ে দিয়েছে পাহাড় আর জঙ্গল থেকে।'

'তোমার সঙ্গে এত ভাব কেন?

'কারণ আমি যে ওদের ভাষা শিখেছি—আমাকে দেখছে যে ওদের মতোই।'

হাঁ হয়ে শুনছিলাম গোনজালার কথা। গোড়া থেকেই লোকটাকে নরবানরের মতো দেখতে মনে হয়েছে। গরিলার মতো নয়, ওরাংওটাং-এর মতোও নয়—সার্কাসের

শিম্পাঞ্জীর মতো। 'প্রোজেক্ট এক্স' দিয়ে এদের দেখেছি। আমি জানি এদের স্বাভাবিক সঙ্গ-এর মতো দেখতে হলেও এরা যুদ্ধ করতে পোক্ত, খুনে স্বভাবটা এদের রক্তে। ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে 'হোমো স্যাপিয়েন্স' অর্থাৎ মানুষ জাতটার কাছাকাছি এসেও হড়কে পড়েছে।

শিম্পাঞ্জী। যমজ দ্বীপে তাহলে শিম্পাঞ্জীদের রাজত্ব চলছে?

চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন প্রফেসর,—'শিম্পাঞ্জীরা তাহলে ঠেঙিয়ে মানুষদের বিদেয় করেছে?'

'কোন কালে! কিন্তু আমাকে কোলে টেনে নিয়েছে। কারণটা আগেই বলেছি। দেখতে আমাকে অবিকল শিম্পাঞ্জীদের মতোই।'

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি। স্বভাবের মিলনেও রয়েছে,' প্রফেসরের কথায় এখন ছুরি চলছে,—'তা নকল শিম্পাঞ্জী মশায়, মুখে এই তেলটা কেন মেখে এলে?'

'আর বলেন কেন। অনেকদিন পরে আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা চেঁচিয়ে-মেচিয়ে মুখে ফলের রস মাখিয়ে দিল।'

'ফল-টলও খেয়ে এলে?'

'তা তো খেতেই হবে।'

'আহারেও যে শিম্পাঞ্জীদের মতো। যাক, এখন কী মতলব?'

'মতলব?' পাটকিলে চোখে বিস্ময় নিয়ে বললে গোনজালা,—'এত কাঠখড় পুড়িয়ে এলেন যা করতে, সেটা করে আসি চলুন।'

'ও হ্যাঁ, প্ল্যাটিনাম মেটালসের ডিপোজিট। আজ থাক।'

'কেন, প্রফেসর, কেন?'

হঠাৎই চিৎকার শোনা গেল পেছন থেকে। রিচার্ড এতক্ষণ সব দেখেছে শুনেছে—কিন্তু একটাও কথা বলেনি। এবার চেঁচিয়ে উঠল তারস্বরে—'না! না! না!'

'কেন রে? কেন না' বলেই হেলে-দুলে হেলিকপ্টারের দিকে হেঁটে গেল গোনজালা।

আমি আর প্রফেসর দুজনেই ওকে ধরতে গিয়ে ধরতে পারলাম না। সাঁত করে আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় আমাদের হাত গলে ছুটে গেল গোনজালা এবং অদ্ভুত লাফ মেরে উঠে গেল রিচার্ডের পাশে।

শুনতে পেলাম তার চিৎকার,—'কেন? যাবি না কেন? তোকেও যেতে হবে।'

'দূর হ! বাঁদর কোথাকার! ওঃ ওঃ ওঃ!'

রক্তজল করা চিৎকারটা ঠিকরে এল রিচার্ডের গলা থেকেই। দূর থেকেই দেখতে পেলাম তিড়বিড়িয়ে লাফ দিয়ে নেমে এল সে বালির ওপর। আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে গড়িয়ে গেল কিছুটা। তারপর স্থির। নিস্পন্দ।

আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। পালকের মতো হাল্কা লাগছিল নিজেকে। কেউ বিপদে পড়লে এমনিই হয় আমার। কাণ্ড-জ্ঞান হারিয়ে দৌড়ই তাকে বাঁচাতে।

প্রফেসর আমাকে ধরতে গেছিলেন। কিন্তু বুড়ো শরীর আমার সঙ্গে পারবেন কেন? পেছন থেকে কেবল চেঁচিয়ে গেলেন—

'সাবধান! সাবধান! সাবধান!'

কাকে সাবধান? কীসের সাবধান? জলজ্যান্ত একটা লোক ছটফটিয়ে ঠ্যাঙা মেরে গেল, তাই দেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়?

হেলিকপ্টার থেকে লাফ দিয়ে নেমে তৎক্ষণাৎ তফাতে সরে গেছে গোনজালো। চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্যে দেখলাম, হাতে রয়েছে একটা থলে।

নক্ষত্রবেগে ছুটে গিয়ে ঝুঁকে পড়েছিলাম রিচার্ডের ওপর।

বেচারি রিচার্ড! বেচারি রিচার্ড! একি মুখের চেহারা তোমার?

মনে-মনে ককিয়ে উঠে ঝাঁকুনি দিতে গিয়েছিলাম ওর দেহটা ধরে-জানি প্রাণ উড়ে গেছে একটু আগেই আমাদের চোখের সামনেই—তবুও...তবুও...

পেছন থেকে প্রফেসর জাপটে ধরলেন আমাকে। চেঁচিয়ে উঠলেন আকুল গলায়,—'বোকা! বোকা! বোকা! তফাৎ যাও! তফাৎ যাও!'

বিহ্বল চোখ আকিয়েছিলাম প্রফেসরের পানে। শুধিয়েছিলাম ব্যাকুল গলায়,—'প্রফেসর! প্রফেসর! কীভাবে মারা গেল রিচার্ড?'

'সেটা দেখতে দাও—হাঁদারাম গোঁয়ার—সরে দাঁড়াও!' বলে এক ঝটকায় পেছনে ঠেলে দিয়ে হেঁট হলেন প্রফেসর এবং রিচার্ডের দুটো ঠ্যাং ধরে হিড়হিড় করে টেনে আনলেন কিছুটা। ঠ্যাং ছেড়ে দিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন রুদ্ধশ্বাসে,—'দেখেছ?'

দেখলাম বটে। বালিতে মাখামাখি হয়ে গেলেও তাদের চেনা যাচ্ছে। কালো কুচকুচে তাদের দেহ। সারা গায়ে টকটকে লাল ফুটকি। ভেলভেটের গা বললেও চলে।

আটখানা পা কুঁকড়ে গুটিয়ে শক্ত হয়ে আছে।

সংখ্যায় তারা তিন। তিনজনে একই সাথে বিষ ঢেলে দিয়েছে বেচারি রিচার্ডের অঙ্গে। দেহের চাপে পিষ্ট হয়ে পটল তুলেছে তার পরেই। রিচার্ডের দেহের ওজন তো কম নয়। আর এরা আধইঞ্চির চেয়ে বড় নয়।

মাত্র আধইঞ্চি দেহের মাপ! কিন্তু কী বীভৎস আকৃতি!

না, এরা পোকা নয়। পোকাদের থাকে ছ'টা পা। এদের রয়েছে আটখানা পা। এরা যখন আট ইঞ্চি বড় শরীর নিয়ে জ্যান্ত পাখি ধরে খায় তখন তাদের ট্যারান্টুলা বলা হয়। কিন্তু মাত্র আধইঞ্চি মাপের মখমল কোমল বপু নিয়ে এরা কারা? কেন এত নৃশংস? হত্যালালসায় কেন এত উদগ্রীব?

হত্যা-সংকল্পই জাগ্রত হয়েছিল আমার দুই চোখে। জ্বলন্ত চোখে চেয়েছিলাম দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গোনজালোর দিকে।

চক্ষুস্থির হয়ে গেছিল তৎক্ষণাৎ।

বিরাট-বিরাট পাথরগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে কাতারে-কাতারে শিম্পাঞ্জী। দুলে-দুলে চলছে ঠিক গোনজালার মতোই। চেহারাও অবিকল গোনজালার মতো। দেখতে-দেখতে হেলিকপ্টার আর আমাদের দুজনের মাঝে দাঁড়িয়ে গেল শিম্পাঞ্জী-বাহিনী। মারমুখো আকৃতি আর নৃশংস পাটকিলে চাহনি দেখেই বুঝলাম, নড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়বে—ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলবে।

গোনজালা একা দাঁড়িয়ে একটু তফাতে।

অশান্ত সমুদ্রগর্জন ছাপিয়ে শোনা গেল তার উচ্চকণ্ঠ,—'প্রফেসর! ডিলোনাটি! এবার বুঝেছেন আমাদের শক্তিটা কোথায়?'

'ওই মাকড়শা?' আশ্চর্য শান্ত গলায় বললেন প্রফেসর।

'হ্যাঁ। যাদের মোট চল্লিশ হাজার রকমের প্রজাতিরা রাজত্ব করে বেড়াচ্ছে পৃথিবীময়।'

'রাজত্ব আর করছে কোথায়!' বেশ শান্তভাবেই ব্যঙ্গ করেন প্রফেসর, 'যাদের মেয়েরা ছেলেদের ধরে খেয়ে ফ্যালে, তারা কোনদিনই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পারবে না।'

দপ করে জ্বলে উঠল গোনজালার পাটকিলে চোখ। হলদে দাঁত কিড়মিড় করে বলল,—'আপনাকে তাহলে গ্রিক পুরাণের সেই গল্পটা বলতে হয়।'

'মিনার্ভা আর অর্চনার সেই গল্পটা?' প্রফেসরের গলায় তাচ্ছিল্যের সুর।

'অর্চনা' সমান ব্যঙ্গ ধ্বনিত হয় গোনজালায় গলায়।

'আরে, ওই হল গিয়ে। নাম তার Arachne—আমি নাম দিয়েছি অর্চনা, ক্ষতি কী? আমরা বাঙালিরা নাম-ধামগুলোকে একটু মিষ্টি করে নিই। তা গল্পটা শোনাও।'

'জানেন মনে হচ্ছে।'

'জানব না কেন। কে ভালো বুনতে পারে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়েছিল অর্চনা নামে মেয়েটা আর দেবী মিনার্ভার মধ্যে। জিতে গেল অর্চনা। রেগেমেগে মিনার্ভা তার বোনা কাপড় ছিঁড়ে ফেললে। ভীষণ দুঃখ পেয়ে গলায় দড়ি দিতে গেল অর্চনা। অমনি মন গলে গেল মিনার্ভার। দড়িটাকে বানিয়ে দিলেন মাকড়শার জাল—আর অর্চনাকে মাকড়শা।'

'ঠিক। ঠিক। ঠিক।'

'বেঠিক কথা কবে বলেছি! অর্চনা নামটা থেকেই মাকড়শাদের নাম হয়ে গেল Arachnid—তাই না?'

'ঠিক। ঠিক। ঠিক।'

'এবার বলো তো খোকরা—খোকরা বলছি বলে রাগ কোরো না, গোনজালা—তোমার এই শিম্পাঞ্জী স্যাঙাতদের লেলিয়ে দিও না—অর্চনাদের হাত থেকে তোমরা কীভাবে টিকে আছো?

হলদে দাঁত বার করে গোনজালা বললে,—'তেল নিয়ে।'

'অ্যাঁ! মাকড়শাদের তেল দিয়ে! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!'

'সে তেল নয়,...সে তেল নয়—সত্যিকারের তেল।'

বলেই গালে আঙুল রগড়ে বললে গোনজালা,—'গাছের তেল গায়ে মাখলে—বড্ড ঘেন্না করে মাকড়শারা।'

'বটে! এই জন্যেই এত বিটকেল গন্ধ তোমার গায়ে। তোমার স্যাঙাতদের গায়েও তো দেখছি তেল হড়হড় করছে।'

'তা তো করবেই! অর্চনারা পোষ মানে না—তেলের ভয়ে দূরে থাকে।'

'বেশ! বেশ! বোল ক্রমশ চড়া হচ্ছে গোনজালা। কথাবার্তা চটপট সেরে নাও। প্রহসনের কী দরকার ছিল।'—

'প্রহসন!'

'অর্চনাদের দ্বীপে কেন নিয়ে এলে আমাদের।'

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিল না গোনজালা। অন্যমনস্ক হয়ে চেয়ে রইল দূর সমুদ্রের দিকে।

তারপর বললে মুখ ফিরিয়ে,—'অ্যাটমবোমা ফাটিয়ে মানুষ জাতটা এই দ্বীপের মাকড়শাদের অবিশ্বাস্য ক্ষমতা দিয়ে গেছে।'

'অবিশ্বাস্য ক্ষমতা?'

'প্রফেসর, এই দ্বীপে মানুষ থাকতে পারেনি এই মাকড়শাদের ভয়ে। তারপর এল শিম্পাঞ্জীরা। এরা বনবাদাড় থেকে ঠিক গাছটি বেছে নিতে শিখল সহজাত অনুভূতি দিয়ে—সেই গাছের তেল মেখে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখে মানুষদের সাবাড় করেছে কীভাবে, তা একটু আগেই দেখলেন।' শেষ কথাটা রিচার্ডকে দেখিয়ে বললে গোনজালা।

'শিম্পাঞ্জীরা তো তখন ওখানে ছিল না,'—বললেন প্রফেসর।

'ছিলাম আমি, আর ছিল এই থলি।' হাতের থলিটা উঁচু করে দেখায় গোনজালা। ভেতরে কী যেন নড়ছে। গাছের ছাল দিয়ে তৈরি থলি ফুলে-ফুলে উঠছে—'এর মধ্যেই আছে আপনার অর্চনারা। মাত্র তিনটেকে ছেড়ে দিয়েছিলাম রিচার্ডভায়ার ওপর।' বলে মুখবন্ধ থলিটা ঢলঢলে শার্টের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখে গোনজালা।

'বুঝলাম', গম্ভীর মুখে বললেন প্রফেসর—'পারমাণবিক বিকিরণের ফলে এই কুড়ি বছরে প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছে অর্চনাদের মধ্যে। কী পরিবর্তন?'

'দেখবেন আসুন। ভয় নেই। আমরা ঘিরে নিয়ে যাব আপনাদের।'

আর তাই দেখলাম খুলে মাকড়শাদের ভয়াবহ কীর্তি। দ্বীপের এদিকটায় কুয়াশার চাদর, দেখিনি আকাশ থেকে। কারণ এদিকের জঙ্গলে রয়েছে সেই গাছের জঙ্গল যাদের তেল সহ্য করতে পারে না মাকড়শারা।

শিম্পাঞ্জিবাহিনী আমাকে আর প্রফেসরকে কাঁধে তুলে নিয়ে গেল এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। গোনজালা নির্ভয় করেছিল বলেই উঠেছিলাম তাগড়াই একজনের কাঁধের ওপর—নইলে আমার বয়ে গেছে। তাতে লাভ হল বিস্তর।

হাঁটার মেহনতই শুধু কমেনি—গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতাও হল সেই প্রথম। ভয়ংকর শক্তিশালী এই শিম্পাঞ্জীরা। হাঁটাপথে কিছুদূর গিয়েই আচমকা আঁহ-আঁহ-আঁহ করে চেঁচিয়ে উঠেই টপাটপ লাফ দিয়ে উঠে গেল গাছের ডালে—একহাতে জাপটে ধরে রইল আমাকে আর প্রফেসরকে।

খুবই খারাপ লাগছিল আমার এইভাবে বাচ্চা খোকার মতো শিম্পাঞ্জীর বগলদাবা হয়ে থাকতে—প্রফেসর কিন্তু বেড়ে মজায় আছেন দেখলাম। আমার ব্যাজার মুখ দেখে খিক-খিক করে হেসেও ফেললেন কয়েকবার।

হু-হু করে যেন উড়ে গেলাম শূন্য পথে। এক গাছ থেকে আর এক গাছে—তারপরেই পরের গাছে। প্রথম-প্রথম ভয় করছিল। আমার ঠিক পাশেই অবিকল শিম্পাঞ্জীদের মতো গাছ থেকে গাছে লাফিয়ে যেতে-যেতে গোনজালা বলে উঠল,—'ভয় নেই, ডিনোনাট। —আমরাই এ যুগের টার্জন!'

ননসেন্স! সুযোগ পাই, তারপর ছোটাব তোমার টার্জনগিরি—মনে-মনেই বলেছিলাম আমি।

ঝড়ের বেগে উড়ে যাওয়ার ফলে কীভাবে কোনদিক দিয়ে যমজ দ্বীপের ওদিকে গিয়ে পৌঁছোলাম, তা গুলিয়ে গেছিল।

আচমকা শিম্পাঞ্জী-বাহিনী থমকে গেল মজবুত মগডালগুলোয়।

গোনজালা বললে হেঁকে,—'ডিনোনাট! প্রফেসর! সামনে দেখুন!'

সূর্য তখন মাথার ওপর। ঝকঝকে রোদ ঠিকরে যাচ্ছে সামনের জঙ্গলের মাথায় পাতা কুয়াশার চাদর থেকে।

কুয়াশা! এত রোদে কুয়াশা!

চোখ কচলে ফের তাকিয়েছিলাম।

হাওয়ায় চিকমিক-চিকমিক করে উঠছে ঝকঝকে সাদা কুয়াশার আস্তরণ—সেই সমুদ্রতীর পর্যন্ত।

গতকাল গোধূলির ম্লান আলোয় হেলিকপ্টার থেকে এই কুয়াশার চাদরই দেখেছিলাম।

দেখেছিলাম পাহাড়দুটোর মাথার দিকে গাছপালার ওপর।

আপনা হতেই চোখ ঘুরে গেছিল পাহাড়ের চূড়ার দিকে।

হ্যাঁ, সেখানেও কুয়াশার চাদর ঝিকমিক করছে প্রখর রোদ্দুরে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ফের তাকিয়েছি সামনের দিকে—অমনি দেখলাম একটা আশ্চর্য দৃশ্য।

সমুদ্রের দিকে বেশ খানিকটা কুয়াশার চাদর ভেসে উঠল শূন্যে। হাওয়া তখন বইছে এদিক থেকে ওদিক—অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে।

কুয়াশার চাদরটা ভাসতে-ভাসতে নেমে গেল সমুদ্রের ওপর—তীর থেকে বেশ খানিকটা দূরে—যেখানে ঢেউ উথাল-পাথাল নয়।

গুটিয়ে যেন ছোট হয়ে রইল কুয়াশার চাদর।

তারপর—তারপর—অবিশ্বাস্য দৃশ্য!

হাওয়ার বিপরীত দিকে কুয়াশার চাদর একটু-একটু করে সরে আসছে বেলাভূমির দিকে।

অথচ জোর হাওয়ায় চাদরটার সরে যাওয়ার কথা আরও গভীর সমুদ্রে।

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল স্বয়ংচালিত কুয়াশার পশ্চাদ্গতি দেখে।

এমনসময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন প্রফেসর,—'আহাম্মক! দড়িটা দেখতে পাচ্ছ না!'

'দড়ি!'

'অর্চনার দড়ি! অর্চনার দড়ি। ঝকঝক করছে রোদ্দুরে!'

হ্যাঁ, এবার দেখতে পেয়েছি। অর্চনার দড়িই বটে। রোদ্দুর ঠিকরে যাচ্ছে তার চকচকে মসৃণ গা থেকে। গাছের ডগায় কুয়াশার চাদরে তার একপ্রান্ত লেগে রয়েছে আর-একপ্রান্ত সমুদ্রের মাঝে পিছু-হটা কুয়াশার চাদরের গায়ে।

পরমুহূর্তেই বিদ্যুৎ ঝলসানির মতোই আসল ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়ে গেল আমার এই বোকা মাথায়।

মাকড়শার জাল।

আকাশপথে কপ্টারে বসে যাকে 'কুয়াশার চাদর' ভেবেছিলাম এখনও চিন্তার সেই ছাপ মাথার মধ্যে নিয়ে যে জিনিসটাকে কুয়াশার চাদর মনে করে যাচ্ছি—আসলে তা বহুদূর বিস্তৃত কল্পনাতীত মাকড়শার জাল ছাড়া কিছুই নয়!

এই জালেরই খানিকটা ছিঁড়ে হাওয়াতে বোনা বেলুনের মতো উড়ে গেছে সমুদ্রের বুকে—কিন্তু জালেরই মোটা সুতো তাকে আবার টেনে আনছে জঙ্গলের দিকে।

অর্চনার দড়িই বটে। এত মজবুত। এত জেল্লাও আনে এদের বোনা কাপড়!

কিন্তু অত নড়ছে কেন জালটা? দূর থেকে দেখলেও বেশ বুঝছি, মুহুর্মুহু ছটফটিয়ে উঠছে গুটিয়ে আসা জালটা। কাদের যেন বন্দি করে আনছে জালের আঠায় লাগিয়ে—মরণান্তক যন্ত্রণায় ছটফট করছে তারাই।

মাছ!

জাল পেতে মাছ ধরেছে মাকড়শারা। যেভাবে পোকামাকড় ধরে ঘরের কোণে—সেইভাবে পাকা জেলের মতো হাওয়ায় জাল উড়িয়ে সমুদ্রে ফেলে মাছ ধরে আনছে নোনা জল থেকে!

গা শিরশির করে উঠল তাই দেখে।

'এরা মাছ খায়?' —প্রশ্নটা অজান্তেই বেরিয়ে গেছিল মুখ দিয়ে।

জবাবটা দিলেন গোলভোলা পাশ থেকে,—'ডিনোবাবু, এই গাছের তলায় দেখো।'

দেখলাম। শিউরে উঠলাম। একটা নরকঙ্কাল। একটা নয়—অগুন্তি। মানুষের হাড়ের পাহাড় রয়েছে যেন গাছের তলায় স্তূপাকারে—ডাইনে-বাঁয়ে যতদূর দুচোখ যায়—কেবল হাড় আর হাড়।

গোনজালা বললে,—'ডিনোনাট! প্রফেসর! এই জন্যেই আপনাদের নিয়ে এসেছি!'

শাখামৃগর মতো গাছের ডালে বসে বললেন প্রফেসর নাটবল্টু চক্র,—'কী জন্যে? এত মানুষের হাড় কেন?'

'ওগুলোর সব মানুষের হাড় নয়, প্রফেসর। ওদের মধ্যে আছে শিম্পাঞ্জীদেরও হাড়।'

'কেন? কেন?'

'মাকড়শাদের ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে। যারা মরেছে, তাদের দেহ এখানে ফেলে যাওয়া হয়। সবসময়ে তেল মেখে নিজেদের কতই বা টিকিয়ে রাখবে— কালো শয়তানগুলো মাটির ফুটো থেকে, গাছের কোটর থেকে বেরিয়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে! হাওয়া এদিকে থাকলে জাল ভাসিয়ে উড়ে আসছে। একটু-একটু করে শিম্পাঞ্জীদের সংখ্যা কমছে।'

'খুবই বিপদের কথা, গোনজালা,' গালে হাত দিয়ে বললেন প্রফেসর।

'খুবই প্রফেসর, খুবই। আটম বিকিরণ শুধু যে মাকড়শাদের উন্নতি ঘটিয়েছে, তা তো নয়—শিম্পাঞ্জীদের ডি.এন.এ.-তেও পরিবর্তন এনেছে—আরও আনছে—এখন এদের বাচ্চাকাচ্চারা মানুষের আরও কাছে চলে এসেছে—ক্রমবির্তনের লম্বা ফাঁকটা ডিঙে মেরে দিচ্ছে একলাফে।'

'অ্যাঁ!'

মুচকি হেসে বললে গোনজালা,—'আমাকে দেখে বুঝছেন না?'

'তুমি তো—তুমি তো মানুষ।'

চট করে ঘুরিয়ে কথা নিল গোনজালা,—'সে যাক, ডাইনোসররা পৃথিবীতে আসবার আগে থেকেই মাকড়শা ছিল—ডাইনোসররা পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পেরে বিদায় নিয়েছে পৃথিবী থেকে—কিন্তু টিকে রয়েছে মাকড়শারা। এরা হল 'যখন-যেমন-তখন-তেমন'-দের জাত। খাবারের অভাব কীভাবে মিটিয়ে চলেছে দেখুন। জল থেকে মাছ ধরছে। এরপর প্রচণ্ড ঝড়ে পুরো জাল ভর্তি মাকড়শা ছড়িয়ে যাবে আশপাশের দ্বীপে—সেখান থেকে মহাদেশে। তারপর?'

চোয়াল ঝুলে পড়ে প্রফেসের,—'সত্যিই তো!'

'খাবারের অভাবে মেয়েরা ছেলেদের ধরে-ধরে খেয়ে ফেলেছে—এই যা রক্ষে। কিন্তু কতদিন এরা আটকে থাকবে যমজ দ্বীপে?'

'তা...ইয়ে...আমাদের কী করার আছে?' আমতা-আমতা করে বললেন প্রফেসর।

গোনজালা বললে,—'চলুন, প্লাটিনামের ভাঁড়ারটা আগে দেখিয়ে আনি—তারপর বলব!'

আবার ধাবিত হলাম শূন্যপথে নরবানরদের কাঁধে চেপে। হু-হু করে পাহাড় বেয়ে নানা পথ দিয়ে, মাকড়শাদের জালপাতা ঘাঁটি ঘুরে, পৌঁছলাম একটা চূড়োয়।

জ্বালামুখে দাঁড়িয়ে হেঁট হয়ে দেখলাম, অনেক নিচে খুব আস্তে-আস্তে কাদা ফুটছে। ঘন কাদা অনেক পরে পরে ফুলে উঠছে—একটা বুদবুদ তৈরি করে ফাটিয়ে দিয়েই আবার তলিয়ে যাচ্ছে।

বিড় বিড় করে গোনজালো বললে,—'কে জানে এই কাদার কেমিক্যালের জোরেই মাকড়সাগুলো এত বেড়েছে কিনা।'

প্রফেসর নির্বাক। আমি হতবাক।

আবার শাখামৃগদের কাঁধে চেপে উড়ে এলাম গাছ থেকে গাছে—এক পাহাড় থেকে নেমে উঠে গেলাম আর এক পাহাড়ের জ্বালামুখের কিনারায়।

আর এইখানেই দেখলাম প্লাটিনাম মেটালের বিশাল ভাণ্ডার।

অবিশ্বাস্য! কিন্তু সত্যি! চাঁই-চাঁই সাদাটে ধাতু জ্বালামুখের ভেতরের গা বেয়ে নেমে গেছে অনেক নিচে পর্যন্ত। মাথার ওপর থেকে সূর্য একটু সরে যাওয়ার ফলে তলদেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না—

কিন্তু সেখানেও যে চাঁই-চাঁই সাদা ধাতু পড়ে রয়েছে—তাতে সন্দেহ নেই।

মরা আগুন-পাহাড়ে এত দামি ধাতু? যে ধাতু আলাদাভাবে এমন রাশিকৃত অবস্থায় আজপর্যন্ত বিশ্বের কোথাও পাওয়া যায়নি?

আমরা এখন সমুদ্রের ধারে। হেলিকপ্টারের পাশে।

রিচার্ডের ডেডবডি কিন্তু উধাও।

অনুমান করতে পারলাম সেটা এখন কোথায়।

মাকড়শাদের জঙ্গলের পাশে। শিম্পাঞ্জীরাই বয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়েছে। রাক্ষুসে খিদে মিটিয়ে চলেছে যেভাবেই হোক। কেষ্টর জীবদেরই পেট ভরিয়ে চলেছে।

মনটা দমে গেল।

প্রফেসর আর গোনজালো এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একটু দূরে গোল হয়ে আমাদের ঘিরে রেখেছে শিম্পাঞ্জীরা।

প্রফেসর বললেন,—'তোমাদের প্রত্যেকেই এখানে হাজির?'

গোনজালো বললে,—'আমাকে বাদ দিয়ে বলুন। হ্যাঁ, ওরা সবাই হাজির।'

'আচ্ছা, তোমাকে বাদ দিলাম। সংখ্যায় ওরা কজন?'

'একান্নজন।'

'তার মানে এই দ্বীপে একেবারে নতুন প্রজাতির অত্যন্ত উন্নত ধরনের একান্নটা শিম্পাঞ্জী রয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'এরা দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে চাইছে?'

'ঠিক ধরেছেন।'

'প্লাটিনাম মেটালগুলো ঘুষ দিতে চাইছে?'

'মনের কথা বলেছেন।'

'তারপর?'

'গাছের তেল নিয়ে যাব সঙ্গে। নমুনা হিসেবে। আপনারা ল্যাবরেটরিতে হুবহু সেই রকম কীটনাশক বানিয়ে দেবেন। এরোপ্লেনে করে এনে গোটা দ্বীপে ছড়িয়ে দেবেন।'

'অর্চনারা তাতে মরে যাবে?'

'সঙ্গে-সঙ্গে।'

'প্রমাণ?'

ইশারা করল গোনজালা। একটা শিম্পাঞ্জী একটা ডাব নিয়ে দৌড়ে এল। কাটা মুখটা গাছের লতা দিয়ে মুখেই বাঁধা রয়েছে।

লতা খুলে মুখটা ফেলে দিল গোনজালা। উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। নাকের মধ্যে দিয়ে ঝাঁঝাল গন্ধটা টাগরা পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিল।

শার্টের মধ্যে থেকে সেই থলিটা বের করে গোনজালা। যার মধ্যে থেকে মাত্র তিনটে মাকড়শা বেরিয়ে এসে পরলোকে পাঠিয়েছে রিগাডকে।

খুব সন্তর্পণে থলির মুখ আলগা করে ডাবের কাটা মুখে টিপে ধরে গোনজালা।

পরক্ষণেই থলির মুখ টিপে ধরে ডাক দিলে আমাকে আর প্রফেসরকে,—'অর্চনা মরছে!'

মরছেই বটে। নিদারুণ যন্ত্রণায় একটা মাকড়শা আটি পা নাড়তে-নাড়তে মারা যাচ্ছে ডাব ভর্তি তেলের মধ্যে। তার কালো মখমলের মতো লাল দেহে টকটকে ফুটকিগুলো যেন আরও লাল হয়ে উঠছে মৃত্যু-যন্ত্রণায়।

বড় আনন্দ পেলাম অর্চনার মৃত্যু দেখে।

একান্নটা শিম্পাঞ্জীকে জাহাজে তুলে আমরা এখন ফিরে চলেছি স্বদেশে। একান্নজনই কাঁড়ি-কাঁড়ি প্লাটিনাম চাঁই বয়ে এনে ভরে দিয়েছে জাহাজের খোল। আরও আছে আগুন পাহাড়ের গর্ভে।

গোনজালা মনের আনন্দে কলা খাচ্ছে।

এখনও বুঝলাম না, আসলে সে কী!

মানুষ না শিম্পাঞ্জী?

হাতের দস্তানা খুলে আঙুলগুলো দেখতে হবে!

আশ্চর্য জামা-প্যান্টের গল্প

সে এক আশ্চর্য দেশ।...

সেখানে সব কিছুই আশ্চর্য। সে দেশের বৈজ্ঞানিকরা আমাদের বৈজ্ঞানিকদের চেয়ে অনেক বেশি গবেষণা করছে, আবিষ্কার করছে অনেক বেশি।

সে দেশ দেখলে মনে হবে যেন রূপকথার রাজ্যে গিয়ে পড়েছি। মেঘ-ছাওয়া কী সুন্দর বাড়ি, যে রকম ডিজাইনের বাড়ি আমরা কল্পনাও করতে পারি না। সেখানকার আকাশ দিয়ে উড়ে চলে এয়ার-সাইকেল আর এয়ার-ট্যাক্সি। সে দেশের রাস্তায় লোককে হাঁটতে হয় না। রাস্তার ওপর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলেই হল। রোলিং রোডই তাকে বয়ে নিয়ে যায় এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায়।

ভোটনমোটন এই দেশেরই একটা ছিমছাম শহরে থাকত। ভোটনমোটন লোক খুব ভালো। কিন্তু বড্ড কুঁড়ে আর ঘুমকাতুরে।

ভোরবেলা কোনওদিনই তার ঘুম ভাঙত না বলে প্রায়ই অফিস যেতে দেরি হতো। ম্যানেজারের গালমন্দ খেয়ে-খেয়েও অভ্যাস বদলাল না ভোটনমোটনের। শেষে লিপিগিলিখিলির মাথায় একটা মতলব এল।

লিপিগিলিখিলি ভোটনমোটনের বোন। একদিন বাজার থেকে ঘুমতাড়ুয়া যন্ত্র কিনে আনল সে। সেদিন রাত্রে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোল ভোটনমোটন।

পরের দিন সকাল ছটা বাজতেই বিষম কাণ্ড আরম্ভ হয়ে গেল শোওয়ার ঘরে। যেন একইসঙ্গে ডাকাত পড়ল, বোমা ফাটল আর ভূমিকম্প শুরু হল ঘরের মধ্যে।

ঠিক ছটা বাজতেই খাটের মাথার কাছে লাগানো ঘড়িটা থেকে একটানা ঘণ্টা বাজতে লাগল ঢং ঢং করে। একটা লাউডস্পিকার থেকে এমন বিকট আওয়াজ বেরুতে লাগল যেন বাড়ির কারখানায় আগুন লেগেছে। আর, একসঙ্গে কাড়ানাকাড়া, ঢাকঢোল, শিঙে বাজতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু বলিহারি যাই ভোটনমোটনের ঘুমকে। এরকম বিদিগিচ্ছিরি আওয়াজের মধ্যেও তার নাক ডাকতে লাগল ঘোঁ-ফং-ফং, ঘোঁ-ফং-ফং।

কিছুক্ষণ পরে লাউডস্পিকারের পাশে লাগানো মিটারের কাঁটা ঘুরতে লাগল। ঘরের তাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখতে-দেখতে উনুনের মতো গরম হয়ে উঠল ঘরটা।

ঘুমের ঘোরে লেপটা শুধু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার নাক ডাকাতে লাগল ভোটনমোটন।

কিন্তু যন্ত্রও দমবার পাত্র নয়। হঠাৎ খাটের পাশ থেকে সড়াত করে বেরিয়ে এল দুটো লোহার হাত। কব্জি আর কনুইয়ের কাছে মোটা-মোটা ইস্পাতের কব্জা। এই হাতদুটোই দুপাশ থেকে সাঁড়াশির মতো আঙুল দিয়ে ভোটনমোটনকে চেপে ধরে তুলে-তুলে আছাড় মারতে লাগল বিছানার ওপর।

এরপর আর কোনও ভদ্রলোক ঘুমুতে পারে না। 'বাপরে' বলে চোখ খুলল ভোটনমোটন। সঙ্গে-সঙ্গে লোহার হাত অদৃশ্য হয়ে গেল খাটের তলায়। ঘর ঠান্ডা হয়ে এল। লাউডস্পিকার চুপ মেরে গেল। ঘড়ি গুম হল।

উঠে বসল ভোটনমোটন। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠে লাফিয়ে নামল নিচে,—আঁ! সাতটা বাজে! আজও দেরি হয়ে গেল! নিশ্চয় যন্ত্রটা বাজে। লিলিগিলিখিলিকে ঠকিয়েছে!

হন্তদন্ত হয়ে বাথরুমে গিয়ে দাঁড়াল ভোটনমোটন। সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়াল থেকে বেরিয়ে এল অনেকগুলো কলের হাত। একটা হাতে টুথব্রাশ এগিয়ে ধরতেই আর-একটা টুথপেস্ট লাগিয়ে দিলে ব্রাশের ওপর। তৎক্ষণাৎ কলের হাতটাই ব্রাশ দিয়ে ভোটনমোটনের দাঁত মাজতে লাগল। একটা হাত মুখ ধুইয়ে দিতে লাগল। দুটো হাত এগিয়ে এসে শোওয়ার জামাকাপড় পাল্টে অফিস যাওয়ার পোশাক পরিয়ে দিল। আর-একটা হাত চুল আঁচড়ে দিল। দুটো হাত জুতো পরিয়ে দিতেই একটা হাত বুরুশ ঘষে জুতো পালিশ করে দিলে। পাঁচ মিনিটও গেল না—ফিটফাট হয়ে বেরিয়ে পড়ল ভোটনমোটন। হাতগুলো কিলবিল করতে-করতে মিলিয়ে গেল দেওয়ালের মধ্যে।

বাইরে আসতেই লিলিগিলিখিলি দৌড়ে এল একটা রেকাবি নিয়ে। রেকাবিতে শুধু একটা বড়ি আর এক গেলাস কফি। এই হল ভোটনমোটনের জলখাবার। বড়িটা দেখতে এটুকু হলে কী হবে, একবার গেলে ঘণ্টাখানেক পর্যন্ত পেট দমসম হয়ে থাকবে তার। কিন্তু তাও খাবার সময় ছিল না ভোটনমোটনের।

পাঁই-পাঁই করে দৌড়োতে দৌড়োতে বললে,—সময় নেই, সময় নেই—ভীষণ দেরি হয়ে গেছে।

বলতে-বলতে সাঁত করে বেরিয়ে এল ছাদে। এদেশে সব ঘরের সামনেই থাকে ছোট্ট ছাদ। ছাদে থাকে এয়ার-সাইকেল। ভোটিনমোটিনেরও এয়ার সাইকেল দাঁড়িয়েছিল ছাদের কোণে। এ সাইকেলের চাকা থাকে না। সাইকেলের মতো দেখতে নয় মোটেই। গোলাকার পিরীচের মতো আকার। ওপরে কাচের মতো স্বচ্ছ অথচ ইস্পাতের মতো শক্ত ঢাকনা। মাত্র দুজন লোক বসতে পারে ভেতরে। ভোটিনমোটিন ধপাস করে বসেই ঢাকনা বন্ধ করে সুইচ টিপে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে নিঃশব্দে কোনওরকম ধোঁয়া না ছেড়ে আকাশপথে ছুটে চলল এয়ার-সাইকেল।

ভোটিনমোটিন ছুটুক আকাশপথে। আমরা তার আগেই অফিসে গিয়ে দেখি কী কাণ্ড চলছে সেখানে।

ম্যানেজার হড়ুমগুড়ুমের কিন্তু ভোটিনমোটিনকে নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো সময়ও ছিল না। মস্ত অফিসঘরে দাঁড়িয়েছিল সে আর কোম্পানির মালিক হনুমন্তসন্ত। পেল্লায় ঘর। চারপাশে কাচ লাগানো—গম্বুজের মতো ঘর দেখলে মনে হয় যেন একটা মানমন্দিরে এসে পড়েছি।

হনুমন্তসন্ত আকারে অবিকল বামনের মতো বেঁটে। আহ্লাদে আটখানা ম্যানেজার হড়ুমগুড়ুমের দিকে তাকিয়ে ছিল সে। একটা জামা আর প্যান্ট একহাতে ঝুলিয়ে হাসি-হাসি মুখে বলছিল ম্যানেজার,—বিশবছর একটানা গবেষণা করার পর আবিষ্কার করেছি, স্যার। এ জামা আর প্যান্টকে ধ্বংস করার ক্ষমতা পৃথিবীতে কারোর নেই।

সাবাস! গদগদ গলায় বলল হনুমন্তসন্ত,—এই জামাপ্যান্ট বিক্রি করে আবার কোটি-কোটি টাকা রোজগার করবে আমার কোম্পানি। এ জামাপ্যান্ট পরলে কামানের গোলা লাগলেও গায়ে আঁচড় লাগবে না। জামাপ্যান্টও কোনও কালে ছিঁড়বে না। আঃ, টাকা, টাকা, এবার শুধু টাকা!

হড়ুমগুড়ুম বললে,—তার আগে পরখ করা দরকার সত্যি-সত্যিই এ পোশাক পরে কেউ অক্ষত থাকে কিনা। আমরা পেছন থেকে গুলি দাগব, আগুন ছুড়ব, ধাক্কা মারব...গায়ে আঁচড় না লাগলেই বুঝব—কেল্লাফতে!

শুনে মহা চিন্তায় পড়ল হনুমন্তসন্ত। ঘরের মধ্যে বাঁই-বাঁই করে চরকিপাক দিতে-দিতে ভাবতে লাগল কাকে দিয়ে পরখ করানো যায়। লোকটার ভীমের মতো সাহস থাকা চাই। কিন্তু এ কোম্পানিতে সেরকম সাহসী লোক একটিও নেই।

এবার দেখা যাক, ভোটিনমোটিন কদ্দূর পৌঁছল।

বিরাট অফিসবাড়ির ছাদে এসে নামল তার এয়ার-সাইকেল। হামাগুড়ি দিয়ে নিচে নামল ভোটিনমোটিন। সামনেই দেওয়ালের গায়ে [illegible] ঘড়ি আর বিদ্যুৎ-চোখ। দেরি করে এসে এ ঘড়ি আর চোখের সামনে দিয়ে গেলেই আর নিস্তার নেই। সঙ্গে-সঙ্গে খবর চলে যাবে ম্যানেজারের টেবিলে। তাই হামাগুড়ি দিয়ে ভয়ে-ভয়ে

বিদ্যুৎ চোখ পেরিয়ে এল ভোটিনমোটিন। কিন্তু দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলে তো সবাই দেখে ফেলবে! কী করা যায়!

এমন সময় এয়ারকন্ডিশন মেশিন রাখার মতো মস্ত ফুটো দেখে লাফিয়ে উঠল ভোটিনমোটিন। এই ফুটোয় ঢুকে দেওয়ালের সুড়ঙ্গ দিয়েই তো ঘরে পৌঁছে যাওয়া যায়!

যেমন ভাবা তেমনি কাজ। লোহার জালতি তুলে ধরে সুট করে ভেতরে ঢুকে পড়ল ভোটিমোটন।

ঠিক সেই সময়ে অফিস ঘরে হনুমন্তসন্ত পায়চারি করতে-করতে ঘেমে নেয়ে উঠল। গোল আংটির মতো অদ্ভুত টেবিলটার ওপরে বসানো সবুজ বোতামটা কটাং করে টিপে দিয়ে বললে,—ভাবতে-ভাবতে মাথা গরম হয়ে গেল আমার। এয়ারকন্ডিশনিং চালু করা যাক।

সেই না সুইচ টেপা, অমনি ছাদের মধ্যে—ওরে বাবারে বলে ভৌতিক কণ্ঠে কে চেঁচিয়ে উঠল। হুস করে প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে কড়িকাঠের লোহার জালতি কড়াং করে ছিটকে পড়ল—ভেতর থেকে বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে বেরিয়ে এল ভোটিনমোটন। পড়বি তো পড় একেবারে হনুমন্তসন্তের ওপরেই। দুজনেই হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ল মেঝের ওপর।

পড়েই হি হি করে কাষ্ঠ হাসি হেসে বলল ভোটিনমোটিন,—সুপ্রভাত, স্যার!

রাগে বোমার মতো ফেটে পড়ে বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল হনুমন্তসন্ত—'তবে রে পাজি ছুঁচো।

জামা-প্যান্ট ছিঁড়ে ভোটিনমোটিনের অবস্থা তখন খুবই কাহিল। সেই অবস্থাতেই কোনওমতে ককিয়ে উঠে বললে কাঁচুমাচু মুখে,—স্যার, সব কথা যদি শোনেন তো—

হঠাৎ স্ফূর্তির চোটে লাফিয়ে ওঠে হনুমন্তসন্ত। নিমেষে কান এঁটো করা হাসি হেসে বললে...ঠিক আছে, মাপ করা গেল। তোমার মতো কাজের লোককে বরখাস্ত আমি করব না। বলেই দৌড়ে গিয়ে হুতুমগুড়ুমের আবিষ্কৃত আশ্চর্য জামাপ্যান্ট নিয়ে ফিরে এল।

ভড়কে গিয়ে বললে ভোটিনমোটিন,—স্যার, আমি কাজের লোক?

নিশ্চয় কাজের লোক! হাসি মুখে বলল হনুমন্তসন্ত,—সেই জন্যেই তো এমন লোককে আমি ছেঁড়া জামা-প্যান্ট পরিয়ে রাখতে চাই না। এই নাও, নতুন জামা আর প্যান্ট। তোমার নিখুঁত কাজের পুরস্কার।

দেখেশুনে মাথা ঘুরতে লাগল ভোটিনমোটিনের। ভুল অফিসে ঢুকে পড়েনি তো? বাঘের মতো হাঁদরেল হনুমন্তসন্ত কিনা তাকে পুরস্কার দিচ্ছে! হনুমন্তসন্ত কিন্তু নাছোড়বান্দা। ঠেলেঠুলে তাকে পাশের ছোট্ট ঘরটিতে ঢুকিয়ে দিলে পোশাক পালটানোর জন্যে।

ভোটিনমোটিন চোখের আড়াল হতেই মহানন্দে একপাক নেচে নিলে মালিক আর ম্যানেজার। লোক পাওয়া গেছে। এবার শুধু পরখ করা বাকি। হুড়ুমগুড়ুম বললে,—দেরি নয়, এখান থেকেই শুরু হোক পরীক্ষা।

নতুন জামা-প্যান্ট পরে হাসি মুখে বেরিয়ে এল কেতাবি ভোটিনমোটিন। বললে,—যাই বলুন, মানিয়েছে ভালো, তাই না?

কোমরে হাত দিয়ে তারিফ করে উঠল হনুমন্তসন্ত,—চমৎকার। চমৎকার।

মুখের কথা শেষ হতে-না-হতেই পেছন থেকে একটা চেয়ার তুলে নিলে হুড়ুমগুড়ুম...দারুণ জোরে ছুড়ে দিলে ভোটিনমোটিনের কোমর লক্ষ্য করে।

দড়াম করে একটা আওয়াজ হল। চেয়ারটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে।

আওয়াজ শুনে পেছনে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল ভোটিনমোটিন—সেকি স্যার, বসতে গিয়ে অমন করে ভাঙলেন চেয়ারটা?

উত্তরে মুখ টিপে হেসে বলল ম্যানেজার,—তাই বটে। তাই বটে।

হনুমন্তসন্ত বললে,—ওহে ভোটিনমোটিন, আজ আর তোমার অফিসে কাজ করে দরকার নেই। এই নাও একটা চেক। ব্যাংকে গিয়ে ভাঙিয়ে নিয়ে এসো তো।

খুশিতে ডগমগ করে বেরিয়ে পড়ল ভোটিনমোটিন। ভাবল—শেষপর্যন্ত কোম্পানি তাকে চিনেছে। সে কাজের লোক বলেই না আজ এত আদর!

কয়েক মিনিটের মধ্যেই রোলিং রোডে নেমে এল ভোটিনমোটিন। গোটা রাস্তাটাই অনেকগুলো রোলারের ওপর এগিয়ে চলেছে—তাই এ রাস্তার নাম রোলিং রোড। ফুটপাথ থেকে টুপ করে চলন্ত রাস্তার ওপর নেমে দাঁড়াতেই এগিয়ে চলল ভোটিনমোটিন—সুখের চিন্তায় তখন মশগুল। সামনে থেকে একটি মেয়ে একটা কুকুর ছানা নিয়ে নেমে গেল চলন্ত রাস্তা থেকে।

এমনসময়ে পেছনে উড়ে এল একটা এয়ার-সাইকেল।

ভেতরে বসে হুড়ুমগুড়ুম আর হনুমন্তসন্ত। হনুমন্তসন্ত বলল,—ঠিক আছে। এবার দশলক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ ছোড়া যাক।

সুইচ টিপতেই লাল বিদ্যুতের মতো রশ্মিরেখা এয়ার-সাইকেলের সামনের চোঙা দিয়ে গিয়ে লাগল ভোটিনমোটিনের পিঠে। দশলক্ষ ভোল্ট বড্ড সোজা জিনিস নয়। লাগার সঙ্গে-সঙ্গে যে কোনও মানুষের পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা।

কিন্তু ভোটিনমোটিনের পিঠটা শুধু একবার সুড়সুড় করে উঠল। কাতুকুতু লাগতেই ফিকফিক করে হেসে উঠল ভোটিনমোটিন।

হঠাৎ পেছন ফিরে তাকাতেই চোখে পড়ল মাথার ওপরে এয়ার-সাইকেলের মধ্যে বসে রয়েছে ম্যানেজার আর মালিক। তাকে নিয়ে যে কী জটিল পরীক্ষা চলছে, তার কিছুই টের না পেয়ে ভোটিনমোটিন ভাবল বুঝি মালিকরা তার ওপর এতই খুশি যে তাকে চোখের আড়াল করতে চাইছে না।

দেখেই আঁতকে উঠল হনুমন্তসন্ত,—সর্বনাশ! আমাদের দেখে ফেলেছে হতভাগা।

একগাল হেসে হড়মগুড়ুম বললে,—দেখেছে ঠিকই, তবে এই মাত্র দশলক্ষ ভোল্টও যে ওকে ছুঁতে পারল না—তা টের পায়নি।

এদিকে নিজের হঠাৎ সৌভাগ্যের কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে গেছিল ভোটনমোটন। সঙ্গে সঙ্গে একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেল।

রাস্তা ছেড়ে এয়ার-সাইকেল নামাবার চত্বরে নেমে পড়েছিল ভোটনমোটন। খেয়াল ছিল না কোনদিকে যাচ্ছে। আচমকা গিয়ে পড়ল একটা তীরবেগে ছুটে চলা এয়ার-সাইকেলের সামনে। চালক সবে মাটি ছেড়ে ওপরে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময়ে তালকানার মতো ভোটনমোটন সামনে এসে পড়ায় আর ব্রেক কষবারও সময় পাওয়া গেল না। কামানের গোলার মতো গিয়ে ঢুঁ মারল ভোটনমোটনের কোমরে।

সে কী সাংঘাতিক ধাক্কা! আশ্চর্য জামা-প্যান্ট পরা না থাকলে ওই এক ধাক্কাতেই টুকরো হয়ে যেত ভোটনমোটন।

কিন্তু কী আশ্চর্য যাদু-পোশাকটা! অমন মারাত্মক সংঘর্ষের কিছুই টের পেল না ভোটনমোটন। একটা প্রচণ্ড আওয়াজ শুনে সম্বিত ফিরে পেল সে। পাশ ফিরে দেখে শূন্যে তিন পাক খেয়ে একটা বেগুনি রঙের এয়ার-সাইকেল আছড়ে পড়েছে মাটির ওপর। এক ধাক্কাতেই আকাশযানের ছিরি যা হয়েছে, কহতব্য নয়। বাম্পার তুবড়ে বেঁকে গেছে—মাথায় চোট লেগে চালকের মুখও রক্তে মাখামাখি।

অবাক হয়ে ভোটনমোটন বলল,—কী ব্যাপার? খামোকা আছড়ে পড়লেন কেন?

কাচের ঢাকনা খুলে মাথা চেপে ধরে বেরিয়ে আসে চালক। ব্যাপার দেখে মাথা ঘুরছিল তার। কাঁপতে-কাঁপতে শুধু বলল,—ধাক্কা মারলাম আমি। কিন্তু আপনার কিছু হল না, আমার গাড়ি গেল জখম হয়ে।

ভ্যাবাচাকা খেয়ে ভোটনমোটন বললে,—তাই নাকি? আজকাল ভিটামিন বড়ি খাচ্ছি বটে, কিন্তু তাতে কি এত শক্তি হয়?

এদিকে অ্যাকসিডেন্ট দেখে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছিল হনুমন্তসন্ত আর হড়মগুড়ুমের। এয়ার-সাইকেল নামিয়ে বেরিয়ে পড়েছে দৌড়তে-দৌড়তে, আনন্দে আটখানা হয়ে হনুমন্তসন্ত বললে,—আর পরীক্ষার দরকার নেই। এ জামাপ্যান্ট কোনওকালেই খারাপ হবে না।

ঊর্ধ্বশ্বাসে মালিক আর ম্যানেজারকে দৌড়ে আসতে দেখে চক্ষুস্থির হয়ে গেল ভোটনমোটনের। তারস্বরে চেঁচাতে-চেঁচাতে হনুমন্তসন্ত বললে—ভিটামিন বড়ি নয়, ভিটামিন বড়ি নয়, একটা নতুন ধরনের বিশেষ পোশাক পরে আছ তুমি।

অ্যাঁ!

আনন্দে নাচতে-নাচতে হনুমন্তসন্ত বললে,—আজ রাতেই কোম্পানির সবাইকে খানাপিনা দেওয়া হবে আমার বাড়িতে। তখনি ঘোষণা করা হবে—শিগগিরই এই বিশেষ জামা-প্যান্ট বাজারে ছাড়ব আমি। এ পোশাক কোনওকালে ছিঁড়বে না, নষ্ট হবে না, খসবে না। ভেটিনমেটিন, আজ থেকে তোমার পাঁচটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিলুম। বলেই সোল্লাসে ভেটিনমেটিনের পিঠে জোরসে চাপড় মেরেই 'উঃ' করে লাফিয়ে উঠল।

হড়ুমগুড়ুম বললে,—সাবধান, সাবধান, আরও জোরে মারলে হাতটাই যে ভেঙে যেত!

এদিকে এসব কাণ্ড দেখে তোবড়ানো এয়ার-সাইকেল চালিয়ে হাওয়া হয়ে গেল হতভম্ব চালক।

রেগে টং হয়ে ভেটিনমেটিন বললে,—তার মানে? পোশাক পরিয়ে গিনিপিগের মতো আমাকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন?

মিটিমিটি হেসে হনুমন্তসন্ত বললে,—একরকম তাই বটে।

চট করে একটা মতলব মাথায় এল ভেটিনমেটিনের। বললে,—যেহেতু আমার জীবন বিপন্ন করে আপনারা এক্সপেরিমেন্ট করেছেন, তাই বছরে দশহাজার টাকা বোনাস চাই। তার কমে হবে না!

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে উঠল হনুমন্তসন্ত,—কী?

বেশ, না দেবেন, তাতে কিছু এসে যায় না। আপনার দেওয়া পোশাক পরে চললাম আমি, বলে অম্লানবদনে পা বাড়াল ভেটিনমেটিন।

রাগে কাঁপতে-কাঁপতে পেছন থেকে তেড়ে এল হনুমন্তসন্ত,—দেখো ছোকরা, বাড়াবাড়ি করলে আয়সা থাপ্পড় লাগাব—!

তাড়াতাড়ি বেল্ট খামচে ধরে হনুমন্তসন্তকে থামাল হড়ুমগুড়ুম। বলল,—খেপেছেন? যতক্ষণ ওই জামা-প্যান্ট পরে থাকবে, ততক্ষণ ওর গায়ে হাত দেওয়ার ক্ষমতা আপনার নেই।

চুপসে গেল হনুমন্তসন্ত,—তাইতো, বটে! ভুলেই গেছিলুম!

হড়ুমগুড়ুম বলল,—তাছাড়া ও আজকে আমাদের যা উপকার করল, তার জন্যে মোটা পুরস্কার দেওয়া উচিত।

কাঁচুমাচু মুখে বলল হনুমন্তসন্ত,—বেশ, তাই হবে। ভেটিনমেটিন, আজ রাতেই খানাপিনার আসরে তোমার বোনাসের কথাও ঘোষণা করব।

শুনে পটাপট-পটাপট হাততালি দিল হড়ুমগুড়ুম।

হনুমন্তসন্ত বলল,—এবার জামা-প্যান্টটা ফিরিয়ে দাও তো বাপু!

ভেটিনমেটিন বলল,—উঁহু! জামা-প্যান্ট পরেই আজ খানাপিনা খেতে যাব। তাতে খুব ভালো প্রচার হবে। কী বলেন?

অগত্যা রাজি হতে হল হনুমন্তসন্তকে।

লাফাতে-লাফাতে ভেটিনমেটিনকে বাড়ি ফিরতে দেখে লিলিপিলিখিলি অবাক হয়ে জিগ্যেস করল,—এ কী ব্যাপার দাদা? মাথা খারাপ হল নাকি?

হয়েছে তোর মাথা আর মুণ্ডু। আজ রাতে ভোজ খানাপিনা—সেখানেই শুনবি কী হয়েছে—বলে, আর-একটা কথাও বলল না ভেটিনমেটিন।

হাততালি দিয়ে লিলিপিলিখিলি বললে,—তাহলে তো তাড়াতাড়ি সেজে নিতে হয়।

সাজবি, সাজবি, তার আগে ইলেকট্রিক ধোপা মেশিনে আমার এই জামা-প্যান্টটা ধুয়ে দে তো।

সেকি! এতো দেখছি একদম নতুন। ধোওয়ার দরকার কী?

নতুন তো বটেই। কিন্তু হাওয়ায় ধুলো লেগেছে—সাফ করে দে। লোকেশুদ্ধ খেতে যেতে হবে তো?

এদিকে খোটিপটি বামন হনুমন্তসন্ত ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছে, এমন সময়ে ঝনঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল।

বিরক্ত মুখে রিসিভার তুলে নিল হনুমন্তসন্ত।

হ্যালো?

স্যার আমি ভেটিনমেটিন। আজ রাতে জামাপ্যান্টটা পরে যাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।

কী!' হুঙ্কার দিয়ে উঠল হনুমন্তসন্ত। 'ইয়ার্কি হচ্ছে? আরও টাকা চাই? না আর এক পয়সাও দেব না—আজকে রাত্রে তোমাকে আসতেই হবে।

—কিন্তু, কিন্তু, কিন্তু—'

দমাস করে রিসিভার রেখে দিল হনুমন্তসন্ত।

ভেটিনমেটিনের অবস্থা তখন সত্যিই খুব কাহিল। একহাতে তার টেলিফোনের রিসিভার, অপর হাতে শতছিন্ন কোঁচকানো-দোমড়ানো একটা জামা আর প্যান্ট। কাঁদো-কাঁদো মুখে ভেটিনমেটিন বললে,—যেতে আমি পারি, কিন্তু এ জামা-প্যান্ট পরে গেলে আমার চাকরি যাবে।

খাপ্পা হয়ে লিলিপিলিখিলি বললে,—তোমারই তো দোষ। এমন জামাপ্যান্ট কিনলে যা জলে ধোয়া যায় না। মেশিনে দিতে না দিতে এই হাল।

রাত্রে খানাপিনা হলে তিলধারণের স্থান নেই। হনুমন্তসন্তর জরুরি ঘোষণা শুনে ছুটে এসেছে প্রত্যেকেই।

মঞ্চে বসে হনুমন্তসন্ত আর হড়ুমগুড়ুম খুশি মনে পা নাচাচ্ছে। একজন অফিসার জিগ্যেস করল,—স্যার, আর কত দেরি?

হড়ুমগুড়ুম বলল,—এই এল বলে ভেটিনমেটিন। তার পরনেই দেখতে পাবে এ শতাব্দীর সেরা পোশাক—যার ক্ষয় নেই, ক্ষতি নেই...শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে

যাবে অথচ এ পোশাক নষ্ট হবে না। সেনারা এই পোশাক পরে যুদ্ধ করতে গেলে কামানের গোলা তাদের গায়ে লাগবে না।'

ফিস-ফস করে জিগ্যেস করল হনুমন্তসন্থ,—কিন্তু কোথায় ভেটিনমেটিন? সব ব্যাপারে দেরি করাই ভেটিনমেটিনের স্বভাব,—থাবার মুখে বলল হনুমন্তম্ভুম।

বলতে-না-বলতেই ঘরে ঢুকল একটা বিচিত্র মূর্তি। ভেটিনমেটিন। কিন্তু একি চেহারা। ভয়ে মুখ এতটুকু হয়ে গেছে। পরনে ঢ্যাঁড়ামতো জামা আর প্যান্ট।

হনুমন্তসন্থ প্রথমটা দেখে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে ফেলেছিল,—এসেছে। এসেছে। অক্ষয় জামা-প্যান্ট এসেছে! অ্যাঁ, একি দেখছি।

হে হে করে হেসে বলল ভেটিনমেটিন,—আজ্ঞে কাদা লেগেছিল বলে ধুয়েছি।

হলসুদ্ধ লোক গড়িয়ে পড়ল হাসতে-হাসতে। হা, হা, হা, ধুলেই যে জামাপ্যান্টের এই হাল তা নাকি আবার অক্ষয়! হো, হো, হো। পেট চেপে ধরে বেদম হয়ে পড়ল সবাই। হাসির দমকে হল ফাটবার জোগাড়।

হাসির মধ্যেই চোরের মতো মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছিল ভেটিনমেটিন।

ফ্যাকাশে মুখে বলল ম্যানেজার,—সর্বনাশ। জল লেগে এই অবস্থা। তাহলে আরও গবেষণার দরকার।

দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মুঠো পাকিয়ে ভেটিনমেটিনকেই খিঁচিয়ে উঠল হনুমন্তসন্থ,—বনাবান! ভাগ্যিস ধুয়েছিলে, নইলে আমার এক কাঁড়ি টাকা সেফ জলে যেত।

একগাল হেসে ভেটিনমেটিন বলল,—তাহলে আমার চাকরি আছে তো?

প্রশ্নে বোমার মতো ফেটে পড়ল হনুমন্তসন্থ,—তা আছে। কিন্তু থাপ্পা দিয়ে বেশি বোনাস আদায় করার শাস্তি না নিয়ে তুই যাবি কোথায়? হতচ্ছাড়া পাজি বেল্লিক কোথাকার। আমার গালে চুন-কালি লাগালি।

বলেই, দমদম করে খাবার-দাবারের প্লেট গেলাস কাপ ছুঁড়তে-ছুঁড়তে ভেটিনমেটিনকে তাড়া করল হনুমন্তসন্থ। মারের চোটে মাথা ফাটিয়ে সারা গায়ে কালসিটের দাগ নিয়ে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে বাড়ি ফিরে আসে ভেটিনমেটিন।

সেইদিন থেকে আর কোনওদিন ঘুম ভাঙতে বেলা হয়নি ভেটিনমেটিনের।

বোতাম

গদাধর নস্কর কলমটা দোয়াতে না ডুবিয়ে নস্যির ডিবেতে ডুবিয়ে দিয়ে 'এই যাঃ' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

একমাত্র কাজের লোক আঙুরবালা পেছন থেকে বলল,—কী হল মেসোমশাই?

—নস্যির ডিবেটা সামনে রেখেছিস কেন? গেল তো নিস্যিটা নষ্ট হয়ে।

মুচকি হেসে আঙুরবালা হাতের ন্যাতা বালতির জলে ডুবিয়ে উঠে এল,—দিন, ধুয়ে দিই।

গজগজ করতে থাকেন গদাধর নস্কর,—নস্যি নিই বলে ডিবেটাকে সামনে রাখতে হবে? সরিয়ে রাখতে পারে না কেউ? বলতে-বলতে হাত বাড়িয়ে ট্যাবলেটটা নিয়ে, মুখে ফেলে টুক করে গিলে ফেললেন। হার্টের ট্যাবলেট। আধঘণ্টা পরে ভাত খাবেন। তারপর ঘুমোবেন।

ডিবেটার ঢাকনি নিয়ে পেঁচিয়ে লাগাতে গিয়ে দেখলেন পাশেই হার্টের ট্যাবলেটটা পড়ে রয়েছে। সাদা ট্যাবলেট।

তবে তিনি কী খেলেন? সেটাও তো সাদা ছিল। সাইজও একই।

আঙুর! আঙুর!

কলতলা থেকে কলমটা ধুয়ে এনে সামনে বাড়িয়ে ধরল আঙুরবালা,—এই নিন।

—কী খেলাম এখন বল তো?

—কিছুই তো খাননি—এইবার তো খাবেন।

—ট্যাবলেটটা...ট্যাবলেটটা...হার্টের ট্যাবলেট মনে করে সাদামতো কী একটা খেয়ে ফেললাম—হার্টের ট্যাবলেট এই তো...টিকটিকির ডিম খেলাম না তো?

—সাদামতো দেখতে ছিল?

—হ্যাঁ...হ্যাঁ...

—গোলমতো? এই বড়িটার মতো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, হ্যাঁ—তুমি দেখেছ?

—আমি দেখেই তো তুলে রাখলাম টেবিলে।

—টেবিলে তুলে রাখলে। আশ্চর্য তোমার কাণ্ড। কোথায় ছিল?

—এই তো মেঝেতে...আপনার শার্টের বোতাম নিশ্চয়ই। অনেকগুলো শার্টেরই তো বোতাম ছিঁড়ে গেছে—কাল দেবেন, সব সেলাই করে দেব।

—খুড়োর শার্ট! বোতাম খেয়ে ফেললাম, এখন কী হবে?

—কিছু হবে না মেসোমশাই। কাঁকর খেলেও বেরিয়ে যাচ্ছে, আর এ তো বোতাম। নিন, ট্যাবলেটটা খেয়ে নিন—ভাত গরম করে এনে দিচ্ছি।

মনটা কিন্তু খারাপ হয়ে গেল গদাধর লস্করের। বোতাম জিনিসটা তো আজকাল আর ঝিনুক থেকে তৈরি হয় না। নাইলন থেকে হয়। তার মধ্যে নিশ্চয় অন্যান্য কেমিক্যালও মেশানো থাকে। বিদঘুটে বস্তুগুলো শরীরের মধ্যে গিয়ে কী উৎপাত করবে ভাবতে-ভাবতে কাঁড়ি ডাল, ভাত, মাছ খেয়ে নিলেন। ঘুমের বড়িটা এবার দেখেশুনেই খেলেন—আর যেন ভুল না হয়।

মনটা কিন্তু খুঁত-খুঁত করতে লাগল। বোতাম বাবাজীবন ঘুমের মধ্যে না জানি কী উৎপাত আরম্ভ করে!

মশারির মধ্যে ঢুকে আলো নিভিয়ে দিয়ে পাখা চালিয়ে দিতেই ঘুম এসে গেল গদাধর লস্করের। ঘুম থেকে উঠে দেখলেন...

কিন্তু সে তো পরের কাহিনি...

বোতামটা যার,—সে কিন্তু হতবাক হয়ে খুঁজে মরছে পৃথিবীময়। এমন অপয়া গ্রহ সে জীবনে দেখেনি, দূর থেকে দেখতে সবুজ আর সুন্দর হলে কী হবে, কাছে এসেই তো চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেছে। এত জল, এত জঙ্গল আর এত লোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ—বোতাম হারিয়ে আবার মহাশূন্যের গ্রহযানে ফিরে গিয়ে গালে হাত দিয়ে অনেকক্ষণ ভেবেছিল সে।

তারপর—ঠিক করল, দু-পেয়ে আর দু-শুঁড়ওলা লম্বাটে কাঠির মতো এই প্রাণীগুলোকে কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করা দরকার। নিজের গ্রহে ফিরে গিয়ে রিপোর্টটা দিতে হবে তো! সেখানকার খবরের কাগজগুলো অনেক খরচ করে তাকে পাঠিয়েছে। সুতরাং কিছু খবর না নিয়ে সরে পড়াটা ঠিক হবে না।

তাই গ্রহযান থেকে ভূতলে অবতীর্ণ হয়েছিল সে। আটতলা বাড়ির ছাদে ঝিরঝিরি বড়িটা দেখে জানালার কাছে উঁকি মেরে দেখছিল একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব খচখচ

করে লিখেই যাচ্ছে। কিলবিলে শুঁড়ে ধরা একটা কাঠি থেকে কালো রঙ বেরোচ্ছে। নিউজিয়ামে এ জিনিস সে দেখেছে। কলম। কালি। লেখা। কত হাজার বছর আগে এ জিনিস ছিল তাদের গ্রহে। আর এখন? ভাবতে না ভাবতেই মনের কথা লেখা হয়ে যায়।

মুগ্ধ হয়ে তাই সে তাকিয়ে ছিল জানলার ফাঁক দিয়ে অনেকক্ষণ, একটা রাস্তার কুকুর যে তাকে অনেকক্ষণ থেকে ওয়াচ করছিল, সে খেয়াল ছিল না।

ভারি ভদ্র কুকুর। যখন তখন ঘেউ-ঘেউ করে চেঁচায় না। আহ্লাদবালা রোজ রাতে তাকে খেতে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। খাওয়ার জন্যেই ঘুরঘুর করে বাড়ির চারধারে। আজকে সে দেখেছে জানালার ধারে ওৎ পেতে থাকা এমন একজনকে যার মতন চেহারা আগে কখনও দেখেনি।

সুতরাং তার সারমেয় সত্তা চনমনে হয়ে উঠেছে। তারপর যখন দেখলে কিম্ভুতে জিনিসটা একটা সাদা মতন ছোট জিনিস নিয়ে ফোকাস করছে অন্নদাতাকে, আর স্থির থাকতে পারেনি...

ঘ্যাক করে লাফিয়ে পড়েছিল, পৃথিবীর কুত্তা। আঁতকে উঠতেই অন্য গ্রহের আগন্তুকের বোতামের মতো বস্তুটা ঠিকরে এসেছিল জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে।

কিন্তু সে তা দেখেনি। চক্ষের পলকে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অনুসরণ করে প্রায় আলোর গতিবেগে ফিরে গেছিল মহাশূন্যে ভাসমান ব্যোমযানে।

সুস্থির হওয়ার পর খুঁজতে বেরিয়েছিল ছোট্ট সাদা বস্তুটাকে। যেখানে ঠিকরে গেছিল হাত থেকে, সেখানে যেতে সাহস হয়নি চারপেয়ে ওই বিতিকিচ্ছিটার জন্যে। দূর থেকেই দূরবিন চক্ষু দিয়ে দেখেছিল তন্ন-তন্ন করে। নাঃ, কোথাও নেই।

দুশ্চিন্তা চরমে উঠেছিল তখুনি। গেল কোথায়? ওই চারপেয়ে অতিশয় কদাকার প্রাণীটা মুখে নিয়ে পালায়নি তো?

তার খোঁজেই প্রায় আলোর গতিবেগে গোটা পৃথিবীটাকে কতবার সে চক্কর মেরে এসেছে। কিন্তু হারামজাদার লেজের ডগা পর্যন্ত দেখতে পায়নি।

পাবে কী করে? যাকে খোঁজা হচ্ছে, সে তখন সিঁড়ির গোড়ায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

গদাধর লস্করের মন খারাপ থাকায় বিশেষ কিছু আজকে খাননি—উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বেশি থাকায় ঘুমটা এসেছে জব্বর...

গদাধর লস্করের মনে হল তিনি শূন্যে শুয়ে রয়েছেন।

ঘুমটা একটু পাতলা হয়ে এলে এরকম অবস্থা প্রায়ই তাঁর মনে হয়, হাত বাড়িয়ে পাশবালিশটা জড়িয়ে ধরলেই আবার গাঢ় ঘুম এসে যায়।

কিন্তু আজ ভ্রান্তি সেভাবে কাটল না। কেননা, হাত বাড়িয়েও তিনি পাশবালিশটা পেলেন না।

অগত্যা এ-পাশ ফিরে শুলেন এ পাশের পাশবালিশটা জাপটে ধরবেন বলে।

কিন্তু পাশবালিশ নেই এদিকেও! উপরন্তু তাঁর স্পষ্ট মনে হল যেন শূন্যে শুয়েই পাশ ফিরলেন। নাক মুখেও খড়-খড়ে কী যেন ঘষটে গেল।

কাজে-কাজেই চোখ খুলতে হয় গদাধরবাবুকে। এবং তা করার আগে বরাবরের মতো মাথার কাছে হাত বাড়িয়ে বেডল্যাম্প আর সিলিংফ্যানের ঝুলন্ত সুইচ দুটো খুঁজলেন। সুইচ পেলেন না। হাতে ঠেকল শুধু দুটো তার। তার টেনে-টেনে একটা সুইচ মুঠোয় এসে যেতেই টিপে দিলেন। আলো জ্বলল এবং চোখ খুললেন।

দেখলেন, তিনি শূন্যে শুয়ে আছেন! বিছানার পাঁচ ফুট ওপরে! মশারির চাল নাকে ঘষটে গেছে ওই কারণেই।

অন্য গ্রহের আগন্তুক ঠিক এই সময় এসেছিল। বোতাম হারানোর জায়গাটায় শেষবার চোখ বুলিয়ে যাওয়ার জন্যে।

হঠাৎ আলো ঠিকরে এল জানলা দিয়ে। চমকে উঠেছিল সে। আর একটু হলে পড়েও যেত। বোতামটা না থাকায় অনেকক্ষণ থেকেই কাহিল লাগছে নিজেকে। এরকম প্রচণ্ড মাধ্যাকর্ষণ অন্য কোনও গ্রহে বড় একটা দেখা যায় না। থাকলেও সে গ্রহে সে পা মাড়ায় না। কিন্তু সবুজ এই বাটাছেলে গ্রহ যেন সম্মোহিত করেছিল ওকে...

রিজার্ভ শক্তিতে আর বেশিক্ষণ চলবে না। একদম ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে যেতে হবে গ্রহযানে।

হঠাৎ আলো দেখে তাই বেচারি চমক উঠেছিল অমনভাবে। পড়তে-পড়তে সামলে নিল শুধু ঘরের ভেতরকার দৃশ্যটা দেখে।

শূন্যে ভাসছে সেই বিটকেল লোকটা। ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছে এদিকে-সেদিকে।

নিমেষে ব্যাপারটা বুঝে নিল ভিন গ্রহের আগন্তুক। হদিস পাওয়া গেছে বোতামের। আছে ওই জানোয়ারটার কাছে। কিন্তু কোথায়?

উনবহু বোতামের মহিমায় গদাধর নস্কর তখন মাধ্যাকর্ষণের মায়া কাটিয়ে মশারি-টশারি সমেত আরও খানিকটা উঠে গেছেন ওপর দিকে। সিলিংয়ের কাছে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বললেই চলে। গা-পাক দিচ্ছে। দু-চার বার গোঁ-গোঁ করেই ওয়াক-ওয়াক করলেন। তারপরেই বমি করে ভাসিয়ে দিলেন বিছানা।

শক্তিশালী বোতাম কি শক্তিহীন মানুষের পেটে থাকতে চায়? নিজেই লম্ফঝম্প জুড়েছিল এতক্ষণ পাকস্থলীর মধ্যে। পেটের অ্যাসিড আর অন্যান্য জারক রস গায়ে লাগতেই চালু হয়ে গেছিল বোতামের শক্তিক্রিয়া। বেরোবার পথ ওই একটাই— অন্ননালী. যতবার সে পথে বেরোতে গেছে, গদাধরের পুরো বেইটাকেই শূন্যে তুলে ফেলেছে। অস্বস্তিতে গদাধরের ঘুমও ভেঙেছে। তারপরেই এই কাণ্ড!

বোতাম ঠিকরে এল বিছানা থেকে জানলার কাছে। লম্বা ধাতুর হাতটা বাড়িয়ে টুক করে তুলে নিল ভিন গ্রহের আগন্তুক। মেশিনের যথাস্থানে লাগিয়ে দিতেই আবার

চার্জড হয়ে গেল পুরো বডিটা। আর একটা মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে চোঁ-চোঁ পালালো মহাশূন্যের ব্যোমযানে। নক্ষত্রবেগে ব্যোমযান উধাও হয়ে গেল নক্ষত্রলোকে।

বেচারা গদাধর। বোতাম মহোদয় উদর থেকে নিষ্ক্রান্ত হতেই দড়াম করে আছড়ে পড়লেন বিছানায়—কাদা-কাদা বমির মধ্যেই।

কেন যে এমন হল, তা তিনি আজও বুঝতে পারেননি। পারলে কি বোতামকে হাতছাড়া করতেন? মাধ্যাকর্ষণকে লবডঙ্কা দেখানোর শক্তিকবচ ওই বোতামের ক্ষমতা স্বচক্ষে দেখতে পেতেন শূন্যমার্গে বিচরণ করে। বোতামটা শুধু লাগিয়ে রাখতে হতো সার্টে।

তবে হ্যাঁ, একটা ভয়ানক বিপদ থেকে নিজেকেই বাঁচিয়ে নিয়েছেন স্রেফ বমি করে। বমি যদি না করতেন, বোতাম ঠিকরে যেত না আর বোতাম ফেরত না পেলে আগন্তুক দলে-দলে হানা দিয়ে তাঁকেই তুলে নিয়ে যেত নিজেদের গ্রহে।

কিন্তু সে গ্রহে তো মানুষ নেই—শুধু রোবট।

রোনা

রোনার কথা মনে পড়লেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। অথচ সে এই পৃথিবীর কেউ নয়। দেখতেও আহামরি নয়। ওরকম বদখত চেহারা জন্মেও কারও দেখিনি। তবুও তাকে ভুলতে পারি না। কোনওদিন পারব না।

রোনা সমুদ্র থেকে উঠে এসেছিল জেলের নৌকায়। আমি বাবার সঙ্গে গিয়েছিলাম পুরীতে। বর্ষাকাল, মাঝে-মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। আকাশে সব-সময় মেঘ জমে রয়েছে। দূরে-দূরে অগুনতি জেলে নৌকা ভাসছে।

ভোরের দিকে বাবা আমাকে নিয়ে ছাতা মাথায় দিয়ে হাওয়া খেতেন। ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ত, বড় ভালো লাগত। জেলেদের নৌকা তীরে এসে ভিড়ত, নৌকা ভর্তি মাছ সঙ্গে-সঙ্গে বিক্রি হয়ে যেত, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতাম। কী ভালোই যে লাগত বলে বোঝাতে পারব না।

রোনাকে দেখেছিলাম তখনই। একটা নৌকার বাইরের দিকে আটকে ছিল। ঠিক যেন একটা থ্যাবড়া পেপার-ওয়েট। কাগজচাপা। থলথলে জেলির মতো। আমিই প্রথমে দেখেছিলাম। একটা ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে নৌকার গা চেঁছে জিনিসটাকে বালির উপর ফেলে দিয়েছিলাম।

সঙ্গে-সঙ্গে তড়বড় করে নড়ে উঠেছিল থলথলে পেপার-ওয়েটটা। গায়ে অনেক ফুটো। জেলির গায়ে এরকম ফুটো কখনও দেখিনি। কাঁপতে-কাঁপতে জিনিসটা সরসর করে এগিয়ে এসেছিল আমার দিকে।

আমি ভয়ের চোটে পেছিয়ে এসেছিলাম কয়েক পা। তখন বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে গিয়েছিলাম। বাবা বকে উঠেছিলেন।

আমি বলেছিলাম,—ওটা কী বাবা? মাছ?

বাবা আমার মাথায় ফের ছাতা ধরে জিনিসটার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। দুচোখে ঘেন্না ফুটে উঠল। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন,—কে জানে! সমুদ্রে অমন কত জিনিস থাকে।

তারপরেই বেশ মনে হল কে যেন আমার মাথার মধ্যে বসে কান খাড়া করে শুনছে। কী শুনছে তা বলতে পারব না। আমি ছেলেমানুষ, ঠিক বোঝাতেও পারব না। কিন্তু স্পষ্ট মনে হল আমার মধ্যে কে যেন ঢুকে পড়েছে। আমি যা ভাবছি তা শুনছে। জানি কথাটার কোনও মানে নেই। বাবাকে পরে যখন বলেছিলাম উনিও মাথায় চাঁটি মেরে বলেছিলেন,—যা ভাগ। পট্টি মারবার আর জায়গা পাসনি।

কে যেন শুনছে মাথার মধ্যে এই অনুভূতিটা অবশ্য বেশিক্ষণ থাকেনি। উবু হয়ে বসে ঘাড় কাত করে রয়েছি দেখে বাবা আমার হাত ধরে টান দিলেন।—উঠে দাঁড়া।

উনি বোধহয় ভেবেছিলেন বিচ্ছিরি জিনিসটা আমার মুখে লাফিয়ে পড়তে পারে।

কিন্তু আমার সেরকম মোটেই মনে হচ্ছিল না। আচমকা পিনপিনে বেসুরো বাজনাটা কথা হয়ে ফুটে গেছে। তবে কে অমন করে বলল,—সুপ্রভাত! আমার নাম বোনা।

আমি তো থ! কে বলল? বাবার গলা তো এমন খোনা নয়! জেলেরাও খালি নৌকা ফেলে দূরে সরে গেছে। তবে কে অমন করে বলল,—সুপ্রভাত। আমার নাম বোনা।

ঘাড় বেঁকিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখি, বাবার চোখে ভয় আর বিস্ময় পাশাপাশি ফুটে উঠেছে। ধুপ করে বসে পড়লেন আমার পাশে।

কে...কে কথা বলল? —উত্তেজনায় গলা ভেঙে গেছে বাবার। অথচ আমার বেশ মজাই লাগছিল।

একটা মাত্র ঠ্যাঙে ভর দিয়ে একপাক ঘুরে গেল বিটকেল জীবটা। রামধনু রঙ ঝিলমিলিয়ে উঠল সারা গায়ে। বহুরূপী গিরগিটিও এমনটি পারবে কি না সন্দেহ।

বলল সরু তীক্ষ্ণ গলায় মাথার শুঁড় নেড়ে,—আমি।

বাবা বোকার মতো জিজ্ঞেস করে বসলেন,—তুমি বাংলা জানলে কী করে?

—এখুনি শিখলাম। তোমার ছেলের মাথার মধ্যে থেকে।

—অ্যাঁ!

—যে-কোনও ভাষাই আমরা শিখতে পারি।

—আমরা মানে? তুমি তো একা দেখছি।

—আরও আছে সমুদ্রের নিচে, কথা বলে শুঁড় নেড়ে। এখানে আমাদের মেশিন আছে।

কথাগুলো ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে আসছে। যে-কোনও বাঙালির চাইতে ভালো বাংলা বেরোচ্ছে।

—কীসের মেশিন?

—এক গ্রহ থেকে আর-এক গ্রহে যাওয়ার মেশিন।

—সেকি! তোমরা তাহলে পৃথিবীর মানুষ—হয়ে...জীবন্ত?

—মোটেই না। আমরা বেড়াতে ভালবাসি। শিখতে ভালবাসি। এক গ্রহ থেকে আর-এক গ্রহে, এক ছায়াপথ থেকে আর-এক ছায়াপথে কেবল বেড়াই, যা দেখি তাই শিখে নিই।

—সমুদ্রে কী করছিলে?

—ভুল করে সমুদ্রে নেমে পড়েছিলাম। ওপর থেকে দেখলাম পৃথিবীটার তিন ভাগ জল, এক ভাগ স্থল। তাই ভাবলাম যা কিছু শিখবার নিশ্চয় জলের মধ্যে আছে। হন্যে হয়ে অনেকদিন ঘোরার পর ফিরেই যাচ্ছিলাম মেশিনে। এমন সময়ে দেখলাম নৌকা নিয়ে জেলেরা মাছ ধরছে। পৃথিবীর বুদ্ধিমান জীব বলতে তাহলে তোমরাই?

—আজ্ঞে।

—কিন্তু তোমাদের দুটো হাত আর দুটো পা কেন?

তোমার মোটে একটা পা কেন? চোখ নেই কেন? কান কোথায়? নাকেরও তো চিহ্ন দেখছি না। —বাবা ফেটে উঠলেন।

হেসে উঠল অন্যগ্রহের জীবটা। থলথলে চ্যাপটা গায়ে মুখ নেই, তাই হাসির চেহারা দেখলাম না। শুধু আওয়াজ শুনলাম।

বললে,—দরকার হয় না। মাত্র দুটো চোখ, একটা নাক আর দুটো কান নিয়ে আমরা করব কী?

—তার মানে?

—তার মানে ওই ব্রেন দিয়ে বুঝতে একটু সময় লাগবে। আমরা অনেক গ্রহের অনেক জ্ঞান এইটুকু মগজের মধ্যে ঠেসে রাখতে পারি। কিন্তু তোমাদের খুলির মধ্যে মগজটাই কেবল বড়, শক্তি একদম নেই।

বাজে বোকো না। —বাবা রেগে গেছেন। রাগবেনই তো। তিনি ডাক্তার মানুষ, বিলেত ফেরত।

এবার একটা অমায়িক হাসি শোনা গেল,—রাগ করছ কেন? এসো ভাব করো। আমার নাম সোনা, আগেই বলেছি। তোমরা নাম বলোনি, কিন্তু আমি বলে দিচ্ছি—তুমি ডাক্তার তনু দত্ত, আর এই তোমার ছেলে তমাল দত্ত। দেখলে আমাদের ব্রেনের ক্ষমতা।

বাবা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে একেবারেই বসে পড়লেন বালির ওপর।

সোনাকে নিয়ে কীভাবে কলকাতা এলাম, সে কাহিনি অনেক লম্বা, এখানে বলতে চাই না।

আমাদের বাড়ি কলকাতার পূর্ব অঞ্চলে। কলকাতা সেখানেই শেষ, চব্বিশ পরগনার মাঠ আরম্ভ হয়েছে সেইখানে। একতলা বাড়ির সামনে উঠোন, চৌবাচ্চা, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, সাদা চুনকাম করা, মোট তিনখানা ঘর। একটাতে বাবার ডাক্তারখানা,

আর-একটি রুপার ঘর, পিছন দিকের একটি আমার। বাকি ঘরটা বাবার আর আমার সৎ মার।

আমার মা মারা গিয়েছেন আমার জ্ঞান হওয়ার আগেই। বাবার কাছে শুনেছি, তখন কথা পর্যন্ত বলতে শিখিনি। দাঁতও ওঠেনি, সবে হাঁটতে শিখেছিলাম। বাবা অকূলপাথারে পড়লেন আমাকে নিয়ে। আমি না জন্মালে নাকি আর বিয়েই করতেন না। করতে হল কেবল আমার জন্য।

একটু জ্ঞান হলে চিনলাম আমার সৎ মাকে। বাইরে প্রকাশ না করলেও সৎ মা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, এ সংসারে আমি একটা কাঁটা। আস্তে-আস্তে যখন তা বুঝলাম, সৎ মাকে এড়িয়ে চলতাম। মুখে কিছু প্রকাশ করতাম না।

বাবা বলতেন,—তুই বড্ড চালাক হয়েছিস না? ছুটি-ছাটা পেলেই তাই বাবা আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তেন, সৎ মা আসত না। আমি যেখানে, সেখানে সে নেই। শুধু বলত,—সবাই গেলে সংসার দেখবে কে?

বাবা সব বুঝতেন, কিছু বলতেন না। আমাকে মানুষ করার জন্যেই এই উপদ্রব তিনি সংসারে ডেকে এনেছেন। আমি মানুষ না হওয়া পর্যন্ত তাই তিনি মুখ খুলবেন না। ত্রিভুবনের সবাইকে কিন্তু সার সত্যটি বুঝিয়ে দিতেন, দুনিয়ায় আমাকে ছাড়া কাউকে তিনি ভালোবাসেন না।

সেই কারণেই আরও চক্ষুশূল হয়েছিলাম সৎ মার। আমি যা কিছু ভালোবাসতাম, সবই তার চোখে খারাপ লাগত।

রোনাকেও প্রথম থেকে সৎ মা বিষদৃষ্টিতে দেখতে লাগল।

অথচ রোনা ঘর থেকে বড় একটা বেরোত না। আমার ঘরে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম তাকে, আলমারির মধ্যে। যাতে আরশোলা, মাকড়সা টিকটিকির উৎপাতে বিব্রত হতে না হয়। সকালে স্কুলের বাস এলে যাওয়ার সময়ে ঘরে তালা লাগিয়ে যেতাম। বিকেলে ফিরে আড্ডা দিতাম ওর সঙ্গে। কত কথাই বলত রোনা। রুগিরা বিদেয় হলে বাবা ডাকতেন। রোনাকে হাতের চেটোয় বসিয়ে যেতাম ডাক্তারখানায়। এক পায়ে দাঁড়িয়ে দুলত রোনা। আর সেই অদ্ভুত শুঁড় বাড়িয়ে ওষুধভর্তি আলমারি, নয়তো তাক ভর্তি ডাক্তারি বই দেখিয়ে প্রশ্ন করত এন্তার। মাঝে-মাঝে অ্যানাটমি, ফিজিওলজির বই এনে সামনে খুলে ধরতে হত বাবাকে। শুঁড় বুলিয়ে নিয়ে মোটাসোটা বই-এর দুরূহ তত্ত্বগুলো কীভাবে যে চোখের নিমেষে শিখে নিত ভেবে পেতাম না।

রোনাই বলত ডাক্তারি বিদ্যেটা ওর খুব ভালো লাগে। সব জ্ঞানের চেয়ে এই জ্ঞানটা ওর কাছে বেশি সুখবোধক। বাবা হাসতেন। বলতেন,—শিখে তুমি করবে কী? রোনাও হাসত,—ব্রহ্মাণ্ড পর্যটনে বেরিয়ে কত বিদ্যেই তো শিখলাম। কাজে লাগেনি এখনও। তবু শিখে যাই—একদিন দরকার হবেই।

তোমরা সবাই কি জ্ঞান-পাগল? —শুধোতেন বাবা।

আমার চরিত্রেও,—বলত রোনা।

—কিন্তু তোমার চোখ, কান, নাক, মুখ কিছুই তো নেই, খাও কী?

—ইথার। ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যাবে, ইথার পাবে সেখানে। আর চোখ, কান, নাক? ওগুলো তো জ্ঞান সঞ্চয়ের বাধা, তাই নেই।

বাবা বাঁকা সুরে বলতেন,—আসুর ফল টক।

মোটেই নয়,—বাচ্চাবু রক্তে রঙিন হয়ে উঠে তখুনি জবাব দিত বোনা।— চোখ দিয়ে তোমরা অনেক জিনিসই তো দেখতে পাও না। কান দিয়ে কি সব শুনতে পাও? না নাক দিয়ে টের পাও? কিন্তু চোখ কান নাকে যা ধরা পড়ে না, আমরা কিন্তু তা টের পাই।

—কী করে?

—সে তুমি বুঝবে না। তোমাদের শরীর-বিদ্যার যা দৌড় বরতেও পারবে না। যেমন ধরো, তোমরা রোগ সারাতে না পারলে অপারেশন করো। কীভৎস ব্যাপার! বোঝ না, ছুরি চালানো মানেই আয়ুটাকেও কেটে কমিয়ে দেওয়া।

বাবা নিজে এফ.আর.সি.এস.। বিলেত-ফেরত শল্যচিকিৎসক। একফোঁটা বোনার চ্যাটাং-চ্যাটাং কথায় চটে গিয়ে বলতেন,—তবে কি বিষিয়ে যাওয়া অ্যাপেন্ডিসাইটিস রেখে দিয়ে রোগীকে মেরে ফেলব?

—তা কেন! অনায়াসেও তো অ্যাপেন্ডিসাইটিস সারানো যায়! যে জায়গাটা নষ্ট হয়ে গেছে, তাকে নতুন করে বাঁচিয়ে তুললেই তো রোগ সেরে যায়। ছুরি চালানোর দরকার কী!

—কীভাবে সেটা বললেই তো হয়।

—বলে বোঝাতে পারব না। সুযোগ দাও, হাতে-কলমে দেখিয়ে দেব।

কিন্তু বাবার কাণ্ডজ্ঞান আছে। অন্যগ্রহের আগন্তুক একরত্তি একটি জীবের হাতে সার্জারি ছেড়ে দিতে পারেন না। তাই বোনাকে পাত্তা দেননি।

কিন্তু একদিন দিতে হল। একরত্তি ওই জীবটার অসীম ক্ষমতা সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম আমরা সবাই। কিন্তু সেই দেখাই হল আমাদের শেষ দেখা।

আমার সৎ মা বেশ কিছুদিন ধরে পেটের ব্যথায় ভুগছিল। অসহ্য যন্ত্রণা তলপেটে। তারপর বাবার চিকিৎসায় যন্ত্রণা কমে এলেও পুরোপুরি গেল না। পেটের বাঁদিকে কী যেন শক্ত আঁটির মতো ফুলে থাকত। বাবা বলতেন কোলাইটিস। মনে-মনে চাপা উদ্বেগ তাই। জীবনটাকে সহজভাবে নিতে শিখল না। কষ্ট তো পাবেই। অন্য ডাক্তাররা রোগটা মানসিক বলে উড়িয়ে দিলেন। তারপরেই হল ন্যাবা। হাত, পা, চোখ হলদে হয়ে গেল। সে রোগ সারল তো এল অ্যানিমিয়া, রক্তশূন্যতা। সেই সঙ্গে ক্ষুধাহীনতা। দিন দিন শুকিয়ে যেতে লাগল সৎ মা। সেইসঙ্গে রোজ একশো-দুই-আড়াই জ্বর। ওষুধপত্র বৃথা গেল। কেউ বললে ভূতে পেয়েছে, কেউ বললে তুক করা হয়েছে।

ন-মাস একটানা ভোগবার পর একেবারে শয্যা আশ্রয় করল সৎ মা, রোজ এক চামচে ভাত পর্যন্ত খেতে পারত না। সারা পেট টাটিয়ে থাকত স্তূপ ফুলে। ফুটবলের মতো নাকি বেলনা।

বাবা উদ্বিগ্ন হলেন। আগেও বলেছিলেন এখনও বললেন,—হাসপাতালে চলো।

সুচিকিৎসা সেখানেই সম্ভব। মা ঝুঁঝিয়ে উঠে বলত,—কেন? একেবারে বিদেয় দেবার মতলব আঁটছ বুঝি?

বাবা চুপ করে গেলেন। কিন্তু এভাবে বেশিদিন চলল না। একদিন প্রচণ্ড যন্ত্রণায় মা অজ্ঞান হয়ে গেল। সেইসঙ্গে পেট ফুলে জয়ঢাক। পেটে টোকা মারলে আওয়াজ হচ্ছে। বায়ু জমেছে। বেরনোর পথ পাচ্ছে না।

পেটে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে বাবা বললেন,—মেকানিকাল অবস্ট্রাকশন হচ্ছে। হাসপাতালেই যেতে হবে। মাইনর অপারেশন। —কিরে তুই যাবি, না বাড়ি থাকবি?

আমি বললাম,—যাব।

যাওয়ার সময় রোনা বেঁকে বসল। সেও যাবে।

অজ্ঞান অবস্থায় মাকে অ্যাম্বুলেন্স করে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। মাত্র আধঘন্টার অপারেশন। বাবা নিজে ছুরি চালাননি। সতীর্থ ডাক্তারকে দিয়ে পেট কাটালেন। তখুনি জানা গেল সৎ মার ক্যানসার হয়েছে।

বাবা ফ্যাকাশে মুখে অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরিয়ে এলেন। পেটটা কাটা অবস্থাতেই রয়েছে। ডাক্তারকে আমার সামনে ফোন করলেন। বায়োপ্সি না করা পর্যন্ত ক্যানসার বলা চলে না। কিন্তু লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে নিরীহ টিউমার নয়, ক্যানসারের টিউমার। পাঁচ ইঞ্চি পর্যন্ত কোলন কেটে বাদ না দিলেই নয়।

এরপর পাঁচটা দিন যেন দুঃস্বপ্নের মধ্যে দিয়ে কাটল। বায়োপ্সি রিপোর্ট এল, ক্যানসারই বটে। বৃহদন্ত্র টিউমারে একদম বন্ধ হয়ে গেছে। কাটলে দিন পনেরো বাঁচবে। না কাটলে আর কিছুদিন।

অপারেশন থিয়েটারের পাশে ডাক্তারদের ঘরে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন বাবা। চোখ মুখে যেন কালি পড়ে গিয়েছে। বোবা মুখে পাশে দাঁড়িয়ে আমি। আমার কাঁধে একটা কাপড়ের ঝোলা, তার মধ্যে রোনা।

হঠাৎ পিনপিনে গলায় রোনা বলল,—ডাক্তার, ডাক্তার!

বাবা চমকে উঠলেন,—কী?

—আমি চেষ্টা করব?

তুমি! —এত দুঃখেও বাবার মুখে ম্লান হাসি ফুটল।

—ছুরি চালালেও তো এবার রুগি বাঁচছে না। তোমার কথা আর খাটছে না। একটা সুযোগ দাও না!

ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন বাবা। সমস্যাটা কঠিন নয়, সমাধানটাই কঠিন। সৎ-মা বাঁচবে না, কোনওমতেই বাঁচবে না। ছুরি চালালে দিন পনেরোর মধ্যে, না চালালে তার কিছুদিন পরে। তার চাইতে, তার চাইতে...

মনস্থির হয়ে গেল বাবার। বললেন,—ঠিক আছে। ঝুঁকি না নিলে বিজ্ঞান-এর উন্নতি হয় না। এ ঝুঁকিও আমি নিচ্ছি, বলো কী চাও?

—কিছু না।

—তার মানে?

—রুগির কাছে আমাকে যেতে দাও।

—তারপর?

—অ্যানেস্থেশিয়া দিয়ে রুগিকে অজ্ঞান করে দাও। আমাকে দুচোখে দেখতে পারে না। পেটের ব্যান্ডেজ খুলে দাও। তারপর দেখি এতদিনের শিক্ষা কাজে লাগে কিনা।

—দেখো।

অপারেশন থিয়েটারে জেনেরাল্দের ঢোকা নিষেধ। কিন্তু বাবা আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—কিরে, দেখবি?

আমিও তাই চাইছিলাম। রোনার কৃতিত্ব আমাকে দেখতেই হবে। বললাম,—হ্যাঁ।

তাই দেখতে পেয়েছিলাম অবিশ্বাস্য সেই দৃশ্য।

দেখেছিলাম স্টিলখাটে শোয়া আপাদমস্তক সাদা চাদরে ঢাকা একটা দেহ, আমার সৎ-মা। বুকের কাছটা আস্তে-আস্তে উঠছে আর নামছে। পেটের কাছে দুটো সাদা তোয়ালে। মাঝখান দিয়ে পেট দেখা যাচ্ছে, ব্যান্ডেজ বাঁধা। খাটের উপর দুটো বিরাট অপারেটিং লাইট। ঘরের এককোণে অ্যানেস্থেটিক মেশিন। মায়ের কাছে ইনস্ট্রুমেন্ট টেবিল। আমি ছাড়া ঘরে দাঁড়িয়ে আরও পাঁচজন। অ্যানেস্থেটিস্ট, হেড-সার্জেন, সেকেন্ড অ্যাসিস্টেন্ট দুজন ইনস্ট্রুমেন্ট নার্স, দরকার মতো এদিক-ওদিক যাওয়ার জন্য আর একজন নার্স। আমি দাঁড়িয়ে অ্যানেস্থেটিস্টের পাশে।

রোনা রয়েছে সাদা তোয়ালের ওপর রাখা প্লেটের ওপর। নার্স, অ্যানেস্থেটিস্ট এবং সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের চোখে ঘেন্না, তাচ্ছিল্য, বিস্ময়। হেড-সার্জেন আমার বাবা, দুচোখ স্থির। একবার শুধু আমার পানে চাইলেন। তারপর হেঁট হয়ে হাত দিলেন ব্যান্ডেজে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল কাটা পেটটা, রক্তমাখা বীভৎস অনেকগুলো ক্ষত। দূর থেকে এর বেশি দেখতে পেলাম না। কাছে যেতেও সাহস হল না। তাছাড়া আমার গা কী রকম করছিল হাঁ-করা বিরাট কাটা দেখে।

তাই চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তাকালাম রোনার দিকে।

দেখলাম রোনা কাঁপছে। ভয়ে কি না বলতে পারব না, সারা গা থিরথির করে অবর্ণনীয়ভাবে কেঁপে চলেছে। রামধনু রঙ ঘনঘন ঢেউয়ের আকারে সারা গায়ে বয়ে চলেছে, অজস্র ফুটোর মতো দাগগুলো যেন আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

তারপরেই দেখলাম, অজস্র শুঁয়ো বেরিয়ে আসছে ফুটোগুলো দিয়ে। যখন খুশি শরীর থেকে শুঁড় বার করে কথা বলতে ওকে দেখেছি, পা বার করে হাঁটতেও দেখেছি। কিন্তু অত শুঁয়ো বার করতে কখনও দেখিনি। চুলের মতো সরু অগুনতি রোঁয়া ফুটো থেকে সরসর করে বেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল দগদগে কাটাটার দিকে। আস্তে-আস্তে শুঁয়োগুলোর ডগা ঢুকিয়ে দিল কাটার ভিতরে...আরও ভিতরে...আরও...আরও। শুঁয়ো যত লম্বা হচ্ছে, অদ্ভুতভাবে রোনার শরীরটাও তত গুটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। যেন ওর গোটা শরীরটাই শুঁয়ো হয়ে গিয়ে ঢুকে যাচ্ছে কাটার মধ্যে। যাচ্ছে তো যাচ্ছেই শেষ যেন নেই। পেপারওয়েটের মতো আকারটা ছোট হতে-হতে পেঁয়াজের

মতো হয়ে গেল। তারপর একটা কাচের গুলির মতো এই এতটুকু। মনে হল গোটা শরীরটাই এবার সৎ মায়ের কাদম্বরের মধ্যে ঢুকে না যায়।

কিন্তু না, এই অবস্থায় এসে বন্ধ হয়ে গেল রোনার ধোঁয়া বার করা। নিশ্চুপভাবে পড়ে রইল কেবল কাচের গুলির মতো রঙিন দেহটা। আস্তে-আস্তে দেখলাম রঙ গাঢ় হচ্ছে, রামধনু রঙ মিলিয়ে যাচ্ছে। কালচে রঙের মধ্যে যে একে-একে ডুবে যাচ্ছে রামধনু রঙেরা।

আরও কিছুক্ষণ পর উদ্বিগ্নকণ্ঠে অ্যানেস্থেটিস্ট জানালে, আর দেরি করা উচিত নয়, রুগির জ্ঞান ফিরে আসবে এবার।

ফাঁপরে পড়লেন আমার বাবা। রোনার অদ্ভুত চিকিৎসার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায়নি। এখন তো সে বেঁচে আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না। রোগি যে মরেনি, তা বোঝা যাচ্ছে বুকের ওঠানামা দেখে।

কী করবেন বাবা! রোনাকে টেনে এনে ফেলে দেবেন? ফের ব্যান্ডেজ বেঁধে দেবেন, জ্ঞান ফিরে আসার আগেই?

বাবার চোখের দিকে তাকিয়েছিলাম বলেই চমকে উঠলাম সেকেন্ড অ্যাসিস্ট্যান্টের অস্ফুট চিৎকারে।

চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, দ্রুত ধোঁয়া বার করে নিয়ে ফের ফুলে উঠেছে রোনা। সরসর করে যেন অদৃশ্য বস্তুপুঞ্জ থেকে সুতো টেনে নিয়ে গুটোচ্ছে একটি মাত্র লাটাইয়ে। খুব দ্রুত ঘটল ধোঁয়া টেনে নেওয়ার ব্যাপারটা। দেখতে-দেখতে আগের আকার ফিরে পেল রোনা। শুধু যা সেই আশ্চর্য রামধনু রঙ আর ফিরে এল না। অস্বচ্ছ থলথলে দেহটা কালির মতো কালো হয়ে উঠল একটু-একটু করে। সব ধোঁয়া বার করে নেওয়ার পর শক্তভাবে গড়িয়ে থপ করে পড়ল মেঝের ওপর।

আমি যখন দৌড়ে গেলাম রোনার দিকে, আর পাঁচজন তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল সৎ মায়ের কাটা পেটের দিকে।

কিন্তু কাটার চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও দেখতে পেল না। বেমালুম জুড়ে গেছে কাটা চামড়া।

রোনা আর নেই। নষ্ট কোষকে সুস্থ করে গিয়েছে সে নিজের প্রাণ দিয়ে। সে বলেছিল, ছুরি চালালে আয়ুকে কমিয়ে দেওয়া হয়। সে দেখিয়ে গেল, বিনা ছুরিতে আয়ুকে বাড়ানো যায়। প্রাণ সঞ্চার করতে হয় দূষিত অঙ্গে।

সৎ মা আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না অনাগ্রহের নিটকেল রোনা তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে গেছে নিজের জীবন দিয়ে।

মুখে না বললেও নিশ্চয় মনে-মনে বিশ্বাস করে। কেননা সৎ মা এখন আমাকে অন্যচোখে দেখে।

আমার মরা মায়ের চোখে।